শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে গ্রামীণ জীবনের রূপায়ণ

নূর নাহার শারমিন সুলতানা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুলাই ২০২০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

নূর নাহার শারমিন সুলতানা কর্তৃক উপস্থাপিত ‘শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে গ্রামীণ জীবনের রূপায়ণ’ শীর্ষক পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম এবং এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি এবং কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

(ডক্টর সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রস্তাবনা	১-৩
প্রথম অধ্যায় **শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের শিল্পিসত্তার স্বরূপ**	৪-২৩
দ্বিতীয় অধ্যায় **বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম**	২৪-৫৩
তৃতীয় অধ্যায় **শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাসে প্রতিফলিত গ্রামীণ জীবন**	৫৪-১৫৯
চতুর্থ অধ্যায় **শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে প্রতিফলিত গ্রামীণ জীবন**	১৬০-২২২
উপসংহার	২২৩-২২৬
গ্রন্থপঞ্জি	২২৭-২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

মনস্বী কথাসাহিত্যিক শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের সাহিত্যকীর্তিকে গবেষণার বিষয় করার ক্ষেত্রে আমাকে প্রথম অনুপ্রাণিত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর গিয়াস শামীম। তাঁর অনুপ্রেরণায় আমি ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষে অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষের তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে প্রতিফলিত গ্রামীণ জীবন' শিরোনামে এম. ফিল. পর্যায়ে গবেষণা শুরু করি। ২০১২ সালে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শক্রমে এই গবেষণা-প্রকল্পটি পিএইচ. ডি. গবেষণায় রূপান্তরিত হয় এবং 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে গ্রামীণ জীবনের রূপায়ণ' শীর্ষক শিরোনামে নবরূপে নিবন্ধিত হয়। এই পর্যায়ে আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক হলেন অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ। তাঁর সস্নেহ অভিভাবকত্ব, আন্তরিক প্রণোদনা ও উৎসাহব্যঞ্জক দিকনির্দেশনায় অবশেষে আমি এ-গবেষণা-অভিসন্দর্ভ শেষ করতে সক্ষম হয়েছি। তাঁকে আমার অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। অধ্যাপক ডক্টর গিয়াস শামীমের প্রতি জানাই অসীম কৃতজ্ঞতা, যাঁর উপদেশ ও পরামর্শ আমার গবেষণার প্রতিটি মুহূর্ত নিরুদ্বিগ্ন করেছে। গবেষণার নানা বিষয়ে তিনি সময়োপযোগী পরামর্শ প্রদান করে আমাকে ঋদ্ধ করেছেন। তাঁর সমৃদ্ধ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের উদার অনুমতি দিয়ে তিনি আমাকে ধন্য ও কৃতার্থ করেছেন। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি একই বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরী, অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং অধ্যাপক ডক্টর বায়তুল্লাহ কাদেরীকে, যাঁদের পরামর্শ আমার গবেষণাকে ত্বরান্বিত করেছে। শ্রদ্ধা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের একাডেমিক কমিটির সদস্যদেরকে, যাঁরা পিএইচ. ডি. সেমিনারে অংশগ্রহণ করে নানা মন্তব্য ও পরামর্শ প্রদান করে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

গবেষণার প্রয়োজনে আমি ব্যবহার করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের সেমিনার, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার এবং বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগার। বরিশাল বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র গ্রন্থাগারসহ আরও অনেক গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক সংগ্রহ

Dhaka University Institutional Repository

করেছি। এসব গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা জনাব আনিসুর রহমান ও হাসান জামিল শিশিরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ গ্রন্থাগার ব্যবহারে তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতার জন্য। গ্রন্থাগারের অন্যান্য কর্মীকেও জানাই ধন্যবাদ। বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা কাজী জাহিদুল হক ও মো. হায়দার হোসেনকেও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি গ্রন্থাগার ব্যবহারসহ নানা প্রয়োজনে সহায়তার জন্য। বাংলা বিভাগের অকালপ্রয়াত বিভাগীয় সহকারী জনাব মো. সাইদুর রহমান নানা দাপ্তরিক প্রয়োজনে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তা কখনোই ভুলবার নয়। এ-প্রসঙ্গে আমি তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সন্তানদের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাকে নির্ভার করেছেন আমার পিতা এ টি এম শফিকুর রহমান এবং মাতা কামরুন নাহার বেগম। তাঁরাই ছিলেন আমার সর্বোচ্চ অনুপ্রেরণা। তাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। আমার স্বামী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর কাজী মোস্তাক গাউসুল হক ছিলেন বরাবরই আমার গবেষণাকর্মের অনুপ্রেরণাসঞ্চারী সহযোগী। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। আমার দুই সন্তান কাজী আন্দালিব মোস্তাক ও কাজী মাইসারা মাহনূরকেও পরম মমতায় স্মরণ করছি তাদের মায়ের গবেষণা-অভিযাত্রায় নিজেদের মতো করে অবদান রাখার জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭) বাংলা সাহিত্যের একজন কীর্তিমান কথাসাহিত্যিক। ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় তাঁর অর্জন ও অবদান স্মরণীয়। প্রধানত বাংলাদেশের দক্ষিণ ভূ-ভাগের সমুদ্রসন্নিহিত অঞ্চলের মাটি ও মানুষের গল্প বলেছেন তিনি; পরম মমতায় লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার ইতিবৃত্ত। বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে তিনিই সেই অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব, যিনি গত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে দক্ষিণ বাংলার সমুদ্রতীরবর্তী গ্রামীণ জীবন এবং তৎসংলগ্ন প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষকে তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে নিবিড় মমতায় অঙ্কন করেছেন। দক্ষিণ বাংলার মাটি, মানুষ, প্রকৃতি ও নিসর্গের অসামান্য রূপকার তিনি। তাঁর কথাসাহিত্যের এই বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য নিরূপণের প্রয়াস থেকেই 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে গ্রামীণ জীবনের রূপায়ণ' শীর্ষক এই পিএইচ. ডি. গবেষণা।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ করেছেন তেরোটি উপন্যাস ও আটটি গল্পগ্রন্থ। মৃত্যুর পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে আরও দুটি উপন্যাস। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা দুটি। এছাড়াও অপ্রকাশিত আরও বেশ কিছু পাণ্ডুলিপির কথা জানা যায়। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বৃহদাংশ কেটেছে বাংলাদেশের বাইরে, ইতালির রাজধানী রোমে। প্রবাসজীবনে দীর্ঘ আটত্রিশ বছর একাদিক্রমে সাহিত্যসাধনায় ব্যাপৃত থাকলেও তাঁর কথাসাহিত্যের বড় অংশই গ্রাম ও গ্রামীণ জীবননির্ভর। বিশেষত বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র-উপকূলবর্তী জীবন ও জনপদই ছিল তাঁর সাহিত্যরচনার প্রধান অবলম্বন। এর বাইরে কদাচ বিচরণ করেছেন তিনি। বাংলার সবুজ শ্যামলিমা আর মন উদাস করা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন লেখককে টেনেছে, তেমনি প্রকৃতির বিরূপতা আর সমাজপতিদের লোভের শিকার সাধারণ মানুষের দুর্দশাও তাঁর নজর এড়ায়নি। বিরূপ প্রকৃতি আর সমাজপতির বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়া প্রান্তিক মানুষ তাঁর গল্প ও উপন্যাসের মূল উপজীব্য। মানুষ আর মানবতাই তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রধান প্রেরণা।

এ গবেষণা-অভিসন্দর্ভে অধ্যায় সংখ্যা চার। প্রথম অধ্যায় 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের শিল্পিসত্তার স্বরূপ'। এ অধ্যায়ে কথাসাহিত্যিক শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের জীবন ও শিল্পিসত্তার বিকাশের পারম্পর্য

আলোচিত হয়েছে। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের নানা পর্যায়ের ওপর আলোকপাতের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যচেতনার স্ফূরণ ও বিকাশের স্বরূপ সন্ধানেরও প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম'। এ-অধ্যায়ে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ধারায় তাঁর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শিত হয়েছে। এদেশের লোকজ জনজীবনকে সাহিত্যের আয়নায় প্রতিফলিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অনন্যতা এবং স্বদেশ-সমকালকে ধারণ করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানও বিশ্লেষিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাসে প্রতিফলিত গ্রামীণ জীবনের স্বরূপ' এবং চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে প্রতিফলিত গ্রামীণ জীবনের স্বরূপ'। এ-দুটো অধ্যায়ে তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে প্রতিফলিত গ্রামীণ জীবনের নানা অনুষঙ্গ ও প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। একই সঙ্গে বাংলার সমুদ্র-উপকূলবর্তী জনপদের প্রান্তিক মানুষদের জীবনের দ্বন্দ্বময় বাস্তবতা এবং প্রকৃতি ও মানুষের যে আবহমান সম্পর্ক, তাও মূল্যায়িত হয়েছে।

এ গবেষণায় শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ নিরূপণের পাশাপাশি বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর অবস্থান চিহ্নিতকরণের প্রয়াস রয়েছে। পল্লিজীবননির্ভর ছোটগল্প ও উপন্যাসেই তাঁর সর্বোচ্চ সাহিত্যসিদ্ধি – একথা মেনে নিয়েই বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তর পরিসরে লেখকের প্রভাব ও অবদানকে চিহ্নিত করারও প্রয়াস। তাঁর কথাসাহিত্যের প্রধান ধারা ও প্রবণতা বিশ্লেষণের পাশাপাশি গল্প ও উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাসে তিনি কীভাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রকৃতিনির্ভরতা, তাদের পেশা ও জীবিকা, দারিদ্র্য, নারীর সামাজিক অবস্থান, সামন্তপ্রভুদের দৌরাত্ম্য, লোকাচার ও লোকবিশ্বাস, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনপ্রবাহের বিবর্তন ইত্যাদিকে রূপায়িত করেছেন সেসব আলোচিত হয়েছে প্রেক্ষাপট-বিশ্লেষণসহ। ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবে গ্রামীণ অনুষঙ্গ ব্যবহারে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের শক্তি ও সীমাবদ্ধতাও আলোচিত হয়েছে এ-গবেষণা-অভিসন্দর্ভে।

নগরকেন্দ্রিক কয়েকটি গল্প ও উপন্যাস রচনা করলেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের শিল্পসাধনার কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশের গ্রাম ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। দক্ষিণবাংলার মৃত্তিকাসন্নিহিত মানুষের জীবনসংগ্রামকে শিল্পিত বাস্তবতায় উপস্থাপনই ছিল তাঁর সারা জীবনের অন্বিষ্ট। 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে গ্রামীণ জীবনের রূপায়ণ' শীর্ষক এই পিএইচ. ডি. গবেষণা বস্তুত নিবেদিতপ্রাণ এক শিল্পসাধকের সাহিত্যকীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রয়াস।

প্রথম অধ্যায়

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের শিল্পিসত্তার স্বরূপ

বাংলা কথাসাহিত্যে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭) একজন প্রাতিস্বিক ব্যক্তিত্ব। এদেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর সংযোগ নিবিড়। গ্রামীণ জনজীবন, বিশেষত দক্ষিণ বাংলার সমুদ্র-উপকূলবর্তী মানুষের সংগ্রামশীল জীবনচিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর কথাসাহিত্যে। গ্রামীণ জনজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-দাহ, হতাশা-বেদনা, নৈরাশ্য-যন্ত্রণার রূপায়ণে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ধারায় তিনি সংযোজন করেছেন এক স্বকীয় মাত্র। গ্রামীণ ভূ-স্বামী, সাধারণ মধ্যবিত্ত, শ্রমজীবী নিম্নবিত্ত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার চিত্রাঙ্কনে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে লেখকের জীবনবোধ ও শিল্পদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমকালীন জনজীবনমূলের সঙ্গে সংলগ্ন থেকেই তিনি অর্জন করেছেন এ স্বাতন্ত্র্য।

একজন কথাসাহিত্যিক জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গের রূপায়ণ ঘটান তাঁর সাহিত্যে। 'দেশ ও কালের সকল উপাদানকে স্বীকরণ করেই শিল্পীর নিভৃত অন্তর্লোক থেকে উৎসারিত হয় সৃষ্টির অমৃত উৎসার। তথাপি স্রষ্টার কল্পনা, আদর্শ, উপলব্ধি ও সৃষ্টি মুহূর্তের একান্ত অন্তরতম যন্ত্রণাকে স্বীকরণ করে নিয়েও একথা অস্বীকার করা চলে না যে তাঁর চেতনায় বা অবচেতনায় দেশ ও কালের স্পর্শ থাকা অবশ্যম্ভাবী।'[১] একজন সাহিত্যিক একটি নির্দিষ্ট কালপর্ব ও আর্থ-সামাজিক-ভৌগোলিক পরিসরে বিকশিত হন। তাঁর জীবনভাবনা এবং চিন্তা-চেতনাকে বিশ্লেষণ করতে গেলে দেশ-কালের প্রভাবকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হয়। কারণ তিনি নিজস্ব ভাবনা ও মনস্বিতার আলোয় ধারণ করার চেষ্টা করেন সমাজ ও সমকালকে। সমগ্রতা-সন্ধানী দৃষ্টিতে উন্মোচন করার চেষ্টা করেন জীবনসত্য। সাহিত্যিকের শিল্পসিদ্ধি বিশ্লেষণ করতে গেলে তাই তাঁর সমকালীন আবহকেও বিবেচনায় নিতে হবে; কারণ এর মধ্যেই তাঁর উত্থান ও বিকাশ। তাই শিল্পীর

[১] ড. ভাস্বতী চক্রবর্তী (লাহিড়ী), 'বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক– ঐতিহাসিক পটভূমি' *সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোটগল্প (১৯৪০-১৯৫০)*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯১, পৃ. ১৭

সাহিত্যকীর্তি বোধের আয়ত্তে আনতে তাঁর শিল্পিসত্তার স্বরূপ অনুসন্ধান প্রয়োজন। বিশেষত '... কোনো ঔপন্যাসিকের শিল্পকর্ম বিবেচনার পূর্বে, ঐ প্রতিভার প্রাণচঞ্চল নির্যাসশক্তি আবিষ্কার ও তার নিরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন। সেই সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য ও সঙ্কেত আলোকে কোনো প্রতিভার আত্মস্থ অভিজ্ঞতাকেন্দ্র এবং বিকশিত আবেগময় বিস্তৃতির সীমানা ও তার আভ্যন্তর বৈচিত্র্যসমূহ অবলোকন করা সম্ভব। অন্যথা সৃষ্টিকর্ম বিবেচনা বিভ্রান্তিকর হওয়ার আশঙ্কা থাকে।'[১] তাই শিল্পিসত্তার স্বরূপ সন্ধানে শিল্পীর মানসগঠন, জীবন-জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনাগত ঐতিহ্য, তাঁর পরিবেশ-পটভূমির পরিধি ও বিস্তৃতির বৈচিত্র্য অনুধাবন গুরুত্বপূর্ণ। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের শিল্পিসত্তার স্বরূপও এসব অনুষঙ্গের আলোকে বিবেচনাযোগ্য।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের জন্ম ১৯২৬ সালের ১৫ জানুয়ারি বরিশাল জেলার ঝালকাঠি মহকুমার (বর্তমানে ঝালকাঠি জেলা) নলছিটি উপজেলার কামদেবপুর গ্রামে। পিতা আকরাম আলী, মতান্তরে আকরাম মুন্সী ছিলেন বরিশাল কোর্টের একজন কর্মচারী, আর মা মেহেরুননেসা (ডাক নাম ফুলমেহের) ছিলেন একজন গৃহিণী। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের প্রকৃত নাম আবুল কালাম শামসুদ্‌দীন। পরবর্তীকালে সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের নামের সঙ্গে নিজের নাম মিলে যাওয়ার বিভ্রান্তি এড়াতে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম নামটি বেছে নেন তিনি। এ প্রসঙ্গে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত *আশিয়ানা* গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশে তিনি বলেছেন –

> আজাদ সম্পাদকের নাম ও আমার নাম হুবহু এক হওয়াতে যে সব অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অবসানের জন্য এখন হইতে আমার নাম 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম' বলিয়া লিখিত হইবে। অনেকে নামের শেষে 'বরিশাল' লিখিতে বলিয়াছিলেন, তাহা শোভন মনে হইল না।'[২]

লেখকের পিতৃপুরুষেরা ছিলেন কামদেবপুর গ্রামে বেশ প্রভাবশালী। কৃষক পরিবারের প্রতাপশালী দুই ভাই জহির এবং জব্বর। জহিরের পুত্র জিকিরউল্যা এবং জব্বরের পুত্র রাজাউল্যা। জিকিরউল্যার দুই পুত্র : আকরাম ও একরাম। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের পিতামহ জিকিরউল্যা এবং পিতা আকরাম আলী নিম্নপদস্থ কর্মচারী হলেও কাজের সূত্রে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকসহ বরিশাল শহরের গণ্যমান্য

[১] সৈয়দ আকরম হোসেন, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২৫ শে বৈশাখ ১৩৮৮, পৃ.১
[২] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, 'নিবেদন' *আশিয়ানা*, জাহাঙ্গীর পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ১৯৫৫

ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় ও হৃদ্যতা ছিল। রাজনীতি সচেতন আকরাম আলী স্বদেশী আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। শেরে বাংলার রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরে তিনি নিজ এলাকার ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে ঋণ সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেন এবং জনহিতকর নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে খ্যাতিলাভ করেন।[১]

আকরাম আলীর পাঁচ সন্তানের মধ্যে শামসুদ্দীন আবুল কালাম ছিলেন একমাত্র পুত্র। তাঁর ডাকনাম ছিল কাঞ্চন। তাঁর চার বোন জাহানারা বেগম, রওশন আরা বেগম, মমতাজ বেগম এবং সাঈদা আখতার খুকু। আত্মজৈবনিক উপন্যাস *ঈষদাভাস*-এ মা মেহেরুননেসার প্রতি লেখকের বিশেষ অনুরাগের কথা জানা যায় – 'কী কারণে জানি না, বড় ভগ্নি জাহানারার যত টান বাবার দিকে, আমার আবার অশেষ সখ্য মায়ের সঙ্গে – গোটা মাতামহকুলের সঙ্গে, গ্রামের সঙ্গেও।' লেখকের মা সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে গ্রামে বসবাস করার ব্যাপারেই উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু সন্তানদের পড়ালেখার কথা চিন্তা করে পিতা আকরাম আলী চাইতেন বরিশাল শহরে বাস করতে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য আকরাম আলী বরিশাল শহরে একটি বাড়ি তৈরি করে সপরিবারে সেই বাড়িতেই বসবাস করতেন। তবে গ্রামের সঙ্গে গোটা পরিবারটির যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ ও অটুট। পিতার সঙ্গে প্রায়ই লঞ্চে চেপে গ্রামের বাড়িতে যেতেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম। গ্রামে একটানা বসবাস না করলেও স্বভাব-কৌতূহলী ও নিসর্গপ্রিয় শামসুদ্দীন আবুল কালাম ছোটবেলা থেকেই পল্লিপ্রকৃতিকে উপভোগ করতেন প্রাণভরে। গ্রামের বিস্তীর্ণ তৃণপ্রান্তর আর শস্যক্ষেত, মৎস্যসম্পদে পরিপূর্ণ জলাশয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত উদার-উন্মুক্ত পরিবেশের পাশাপাশি গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রাও গভীর মনোযোগে পর্যবেক্ষণ করতেন তিনি। বরিশাল অঞ্চলের এই গ্রামীণ জীবনচিত্র কৈশোরেই তাঁর মনে শৈল্পিক অনুভূতি জাগায়, প্রণোদনা জোগায় সৃজনশীল সাহিত্যসাধনার। *ঈষদাভাস*-এ পিতার সঙ্গে গ্রামের বাড়ি থেকে বরিশাল শহরে যাবার অনবদ্য বর্ণনা পাওয়া যায়– 'এই গ্রাম সেই গ্রাম হয়ে কত বাড়ি বাড়িয়াল, হাট-মাঠ-ঘাট ছুঁয়ে বা এড়িয়ে, খণ্ডে খণ্ডে কিংবা আইলে – এলাকার নির্দিষ্ট জমি-জমা, বসতি-বসত, ঘর গৃহস্থালি, যেকোনো কালিদাসও কখনো দেখেছে কিনা সন্দেহ, একই সঙ্গে জলে-স্থলে এমন নিবিড় সখ্য, পরস্পর দূরে দূরে কোল, এমন ঘন-আত্মীয়তা-শত্রুতা আমার পিতা

[১] সাঈদা আক্তার খুকু, 'আমার ভাই কাঞ্চন', *শামসুদ্দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ*, সম্পাদক, সেলিনা বাহার জামান, প্রথম প্রকাশ, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১ ডিসেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ১৩০-১৩১

চোখে ধরিয়ে না দিলে কখনো বুঝে ওঠার সাধ্যও হতো না!'[১] জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে যেখানেই অবস্থান করুন না কেন, পিতামাতা এবং নিজ জন্মস্থানের প্রতি লেখকের ভালোবাসা ছিল সীমাহীন। তাঁর ভাষায়, '... যে মা আমার জন্ম দিয়েছিলেন, যে পিতা আমার জন্মে সুখী বোধ করেছিলেন, যে ঠাঁই আর কঠিন-কোমল বায়বীয় পরিবেশ আমাকে গ্রহণ করেছিল, নিঃশ্বাস ও ক্রন্দনেরও সুযোগ দিয়েছিল, তার প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতাবোধ আমার সমস্ত জীবনের অপরিশোধ্য ঋণ। এই ঋণ ক্রমাগত আমার সমস্ত জীবনকেই পরিচালিত করছে।'[২]

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের শিক্ষাজীবনের শুরু বরিশাল জেলা স্কুলে। প্রথমদিকে বরিশাল শহরের প্রতি 'ভয়-সমীহ' থাকলেও শহরটিকে ভালো লেগে যেতে দেরি হয়নি লেখকের। বিশ শতকের চতুর্থ দশকে ব্রিটিশ শাসনাধীন বরিশাল তখনও পুরোপুরি শহর হয়ে ওঠেনি। টিনের চালের বাড়ি, খড়ের চালের রান্নাঘর আর হিজলে-তেঁতুলে ঢাকা মফস্বল শহরটিতে তখনও পাড়াগাঁয়ের গন্ধ মিশে ছিল। শহরটির বর্ণনা লেখকের ভাষায় – 'বাড়ির সামনের পথ অথবা পায়ে হেঁটে হেঁটে যতদূরই যাই, কেবল চোখে পড়ত চতুর্দিক থেকে লোক আসছে সেই শহরে – নৌকায়, পায়ে হেঁটে, মাথায় না হয় কাঁধে নানা রকম সম্ভার নিয়ে – হাট, গঞ্জ, বাজার, শহর একই সঙ্গে সব মেশামেশি; যে যেখানে পারছে বসে পড়ছে নিজ নিজ বেসাত নামিয়ে, না হয় খালে খালে নৌকার উপরেও রঙ-বেরঙের ফলমূল, চাল-ডাল, সবজির বেসাতি; কোনো কোনো খালপাড়ে, বাড়ির দোতলা-তিনতলা থেকেও ঝুড়ি ঝুলিয়ে দরদামে ব্যস্ত কোন গৃহিণীরা; ঘাটে ঘাটে প্রায় উলঙ্গ শরীরে দলেমলে স্নানের ঘটাও যেন কোনো মহা আনন্দ কি পুণ্যেরই কাজ।'[৩] মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়াশোনা শেষ করে তিনি ভর্তি হন ওই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ব্রজমোহন কলেজে। এ কলেজে অধ্যয়নকালেই তাঁর বিখ্যাত 'শাহেরবানু' গল্পটি রচনা করেন। গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পর অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন পটুয়াখালীর তৎকালীন মুন্সেফ সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। 'কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র দৈনিক *স্বাধীনতার* সম্পাদক সোমনাথ লাহিড়ী দীর্ঘ সমালোচনা লিখলেন। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির

[১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, *ঈষদাভাস*, সংগ্রহ ও সম্পাদনা: সৌমিত্র দেব, প্রথম প্রকাশ, জয়তী, ঢাকা ২০১৬, পৃ. ২০
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

সেই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে কে এই কলমের যুবক?'[১] ১৯৪৬ সালে বিএ পরীক্ষা সমাপ্ত হলে তিনি সাহিত্যকর্মে আরো গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। বরিশাল থেকে প্রকাশিত 'সাত সতেরো' নামে একটি কবিতা সংকলনের প্রকাশকের দায়িত্বও পালন করেন তিনি। এই সংকলনে জীবনানন্দ দাশ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামেরও একাধিক কবিতা প্রকাশিত হয়। তরুণ লেখক, কবি ও সাহিত্যসেবক হিসেবে সাহিত্যানুরাগী মানুষের প্রিয়পাত্রে পরিণত হন তিনি। সমমনা ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে সাহিত্যের আসর জমাতেন তিনি; বরিশাল শহরে তাঁদের বাড়িটিই হয়ে ওঠে সৃজনশীল এসব সাহিত্যকর্মীর মিলনকেন্দ্র।[২]

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের জন্ম ও বেড়ে ওঠা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জীবন ও পট পরিসরে। এ সময় নতুন এক বিশ্বব্যবস্থার উন্মেষলগ্নে যুগসঞ্চিত প্রাচীন ধ্যানধারণাগুলো একের পর এক প্রশ্নের সম্মুখীন। ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র সাবেকি ও আধুনিক – পরস্পরবিরোধী এই দুই চিন্তাধারার সংঘাত চলছিল। ভারতবর্ষীয় রাজনীতির ইতিহাসে এটি ছিল নানা ঘটন-অঘটন আর উত্থান-পতনে পূর্ণ একটি সময়। শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তরুণ বয়সে প্রত্যক্ষ করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) ভয়াবহতা, তেতাল্লিশের মন্বন্তর (১৯৪৩), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬), দেশভাগ (১৯৪৭) প্রভৃতি। এসব ঘটনা তাঁর মানসগঠনে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তেমনি তাঁর জীবনবোধ ও শিল্পরুচিকে করেছে প্রভাবিত।

বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় প্রভাব ফেলে বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫)। 'বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা হিন্দু সমাজে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক এ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও পূর্ববাংলার ব্যাপক মুসলমান সমাজ তা মেনে নেয়।'[৩] তবে কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণি বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় নানাভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ক্রমাগত সহিংস হয়ে ওঠা আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে। এই ঘটনার ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে ইংরেজদের প্রতি অনাস্থা তৈরি হয়। ইতোমধ্যে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সংঘটিত

[১] নির্মল সেন, 'শামসুদ্‌দীনদা', *শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২
[৩] আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)*, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৩, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ. ৯৫

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাংলার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বলয়কে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুবাদে মুসলিম জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও আত্মসচেতনতার বিস্তার এতদঞ্চলে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ শতকের শুরুতে মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির জাল ছিন্ন করে আধুনিকতা ও প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে বরণ করে নেয়ার একটা সচেতন প্রয়াস শুরু হয়। ১৯২৬ সালে আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখের নেতৃত্বে কয়েকজন তরুণ মুসলিম চিন্তকের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। পরবর্তী বছর মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা' (১৯২৭) প্রকাশিত হয়, যার মুখবাণী ছিল – "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" মুসলিম সাহিত্যসমাজ তথা শিখাগোষ্ঠীর ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে বাঙালি শিক্ষিত মুসলিম তরুণ সমাজের একাংশের ওপর। তাদের চেতনাস্তরে ধীরে ধীরে উপ্ত হতে থাকে আধুনিক চিন্তাধারা। মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের সমান্তরালে এই ভূখণ্ডে তীব্রতর হয়ে ওঠে স্বাধীনতার সংগ্রাম। ভারতবর্ষে এই সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী; পাশাপাশি দ্বি-জাতিতত্ত্বের ধ্বজা তুলে মুসলিম লীগের মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলছিলেন ঠিক তখনই ১৯৩৯ সালে সংঘটিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী পর্যায়ে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু ও মুসলিম নেতৃত্বের মধ্যে তৈরি হয় দূরত্ব। একদিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক পৃথক রাষ্ট্র গঠনের জোরালো দাবির প্রেক্ষিতে যুদ্ধবিধ্বস্ত ব্রিটিশ শক্তি এদেশে উপনিবেশ টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিতকরণের মাধ্যমে তারা ভারত ত্যাগ করে। ফলে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়ে জন্ম নিল ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের। পূর্ববঙ্গ পূর্ব বাংলা নামে পাকিস্তান আর পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অধীন হয়।

দেশভাগ ও তার অব্যবহিত পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণ ও নির্যাতন-নিপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রতিবাদের ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়ায় সংগঠিত হয় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচন এবং ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। স্পষ্টত

ব্রিটিশ রাজত্বকাল, পাকিস্তানি শাসনামল এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিচিত্র সমস্যা ও সংকটের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই বেড়ে উঠেছেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। সমাজ-রাজনীতির বৈচিত্র্যময় উত্থান-পতনের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় যোগ। তাঁর সাহিত্য ও রাজনীতিমনস্কতা এ কারণেই বরাবর হাত ধরাধরি করে চলেছে। সাম্প্রদায়িকতা ও কূপমণ্ডূকতামুক্ত একটি উদার পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছেন তিনি। শৈশব থেকেই ঘৃণা করতে শিখেছেন অন্যায়কে। রাজনীতি ও সাহিত্য উভয়ই যে অন্যায়-প্রতিরোধী অস্ত্র হতে পারে তা তিনি বিশ্বাস করতেন এবং সে বিশ্বাস থেকেই কৈশোরক পর্যায়ে একদিকে যেমন রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন তেমনি কলমও হাতে তুলে নিয়েছেন নিতান্তই কিশোর বয়সে। তাঁর এই কলম হাতে তুলে নেয়া কোনো কিশোর মনের রোমান্টিক ভাবালুতা ছিল না, ছিল সমাজবদলের দৃঢ় অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন।

ছাত্রজীবন থেকেই শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'আনন্দমেলা'র পরিচালক বিমল চন্দ্র ঘোষ পরিচালিত 'মণিমেলা' সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি কিশোর বয়স থেকেই। 'মণিমেলা'-র কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হবার মাধ্যমেই তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা ও সম্পৃক্তি শুরু বলে মনে করেন নির্মল সেন।[১] চল্লিশের দশকে জড়িত হন আর এস পি অর্থাৎ বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলে। বরিশালের সদর রোডের আর্টভিলার দোতলায় ছিল বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের জেলা দফতর। ১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দি সৈন্যদের মুক্তির দাবিতে বরিশালে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃত্বে মিছিল হয়। সেই সময় এই মিছিলে অন্যদের সঙ্গে শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালের আগস্টে কলকাতা, বিহার ও নোয়াখালীতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আজন্ম অসাম্প্রদায়িক শামসুদ্‌দীন আবুল কালামকে ভীষণভাবে বিচলিত করে। মানবতার এই অপমানের বিরুদ্ধে 'সাত সতেরো' পত্রিকায় 'রাখি' নামে একটি কবিতায় তিনি লিখলেন –

পৌষ রজনীর চারিদিক ভরা আত্মারা বিদেহ
খল খল হাসে সর্বনাশা হাসি, দুই হাতে দেয় করতালি,
লাম্পট্যের অভিসারে বাঁধা পেলে হিংস্র চোখে করে গালাগালি।
রজনীর অন্ধকারে অপবিত্র হোলো কতো কুমারীর দেহ
তবু তার লালায়িত লোভ দেখে প্রতিবাদ করিল না কেহ।

[১] নির্মল সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

এরি মাঝে বিচরিত যৌবন যাহার
তার বুকে নেই বুক, মনে নেই মন এতোটুকু
বিধানের ব্রত নিয়ে তারা দেখি দাঁড়াতে বিমুখ।

১৯৪৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পড়তে গেলেন এবং নিখিল বঙ্গ ছাত্র কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হলেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। এ-পর্বে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় হোসনে আরা ওরফে বিজুর। অতঃপর পরিচয় থেকে প্রণয়। ১৯৪৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি অর্জন করে ঢাকায় ফিরে বাবা-মার অমতে হোসনে আরার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন তিনি। একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রচার ও তথ্য দপ্তরে সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন। কিছুদিন পর ঢাকায় পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার ও তথ্য দপ্তরের আঞ্চলিক অফিসে যোগ দিয়ে 'মাহে নও' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত হন। যদিও পাকিস্তানী ভাবধারার প্রচারই এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তারপরও শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম চেষ্টা করেছিলেন সরকারের প্রচারের চেয়ে শিল্প-সাহিত্যের বিষয়কে প্রাধান্য দিতে। ফলে 'পত্রিকাটিতে প্রচারের ভাগের চেয়ে সাহিত্যের ভাগটাই বেশী ছিল।[১] এছাড়া পাকিস্তানের প্রথম মাসিক 'সিনেমা' পত্রিকার উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন তিনি। 'আল বেরুনী' ছদ্মনামে এই পত্রিকায় ধারাবাহিক নাটকও লিখতেন তিনি।

চাকুরিসূত্রে প্রাপ্ত আজিমপুরের সরকারি বাসায় স্ত্রীকে নিয়ে সংসার জীবনও শুরু করেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। তবে পেশাগত জীবনে সুনামের সাথে দায়িত্বপালনে সমর্থ হলেও অচিরেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে নানা সমস্যা দেখা দেয়। হোসনে আরাকে ভালোবেসে বিয়ে করলেও সংসার জীবনে সুখী হননি তিনি। স্ত্রীর বিশ্বাসভঙ্গের কারণে চরম মানসিক যন্ত্রণায় নিপতিত হন। ফলে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বাঁধন অনেকটাই আলগা হয়ে যায়। কার্যোপলক্ষ্যে তিনি করাচি শহরে অবস্থান করার সময় মারা যান তাঁর মা। ঢাকায় ফিরে মায়ের মৃত্যুসংবাদে মুষড়ে পড়েন তিনি। ইতোমধ্যে তাঁর একমাত্র কন্যা ক্যামেলিয়ার জন্ম হয়েছে, তবে স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে সুখী সংসার জীবন কাটানো ততদিনে দুরাশায় পরিণত হয়েছে।[২] এ-সময়

[১] সৈয়দ আলী আহসান, 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম', *শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
[২] সাঈদা আক্তার খুকু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের মনোজগতের টানাপড়েন লেখক রাবেয়া খাতুনের স্মৃতিচারণে ধরা পড়েছে এভাবে –

> ঠোঁটে সব সময় সামান্য হাসি থাকতো। কিন্তু চোখে বিষণ্নতা। তখন তিনি ২৪-এ আজিমপুর কলোনীর বাসিন্দা। ঘরে রয়েছে সুন্দরী স্ত্রী এবং মিষ্টি শিশুকন্যা। রবীন্দ্রনাথ থেকে যার নাম রেখেছেন ক্যামেলিয়া। আত্মজার গল্প তাঁর প্রিয় বিষয়। অনেক কথা বলতেন, হাসতেন। সেই পরিতৃপ্ত পিতার হাসি কবে কমতে কমতে নিভে যাওয়ার মত হয়েছিল, কেউ খোঁজ রাখেনি।[১]

১৯৫৬-৫৭ সালে ইউনেস্কোর ফেলোশিপ নিয়ে ছয় মাসের বেশি সময় পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণ করেন লেখক। ১৯৫৯ সালে ফটোগ্রাফি, সেট ডিজাইনিং, পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র সম্পাদনা শিক্ষার জন্য ইতালির রাজধানী রোমে যান তিনি। রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৬১ সালে। এছাড়াও সিনেমাটোগ্রাফির ওপর ডিপ্লোমাও অর্জন করে। বিশ্বখ্যাত ইতালীয় চলচ্চিত্র পরিচালক ভিত্তোরিও ডি সিকার সহযোগী হিসেবে চলচ্চিত্রে কাজের অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেন তিনি। কাজ করেছেন জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির গণসংযোগ বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে।

তাঁর বিদেশযাত্রার অব্যবহিতকাল পরই তাঁর স্ত্রী হোসনে আরা বিজু নতুন করে সংসার পাতেন। মাতৃভূমির সঙ্গে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের বন্ধন স্থায়ীভাবে ছিন্ন হবার ক্ষেত্রে এই ঘটনা হয়তো অনুঘটকের কাজ করে। ১৯৫৯ থেকে ১৯৯৭ – দীর্ঘ প্রায় চার দশক ইতালিতে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। ব্যক্তিগত জীবনের হতাশা ও অপ্রাপ্তির বেদনা, 'স্ত্রীর বিশ্বাসহীনতা, ভালবাসার অভিনয় তাকে জীবনের সরল পথ হতে কঠিন বাস্তবতায় নিয়ে যায়।'[২]। সম্ভবত তাঁকে সবচেয়ে বেশি আঘাত দিয়েছিল তাঁর নিজের কন্যা পিতার নাম ত্যাগ করে অন্য ব্যক্তির (হোসনে আরার দ্বিতীয় স্বামী) নাম নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করে। কেবল পরিবারই নয়, দেশ ও দেশের মাটি-মানুষের সঙ্গে বিচ্ছেদও লেখককে পীড়িত করে, প্রতি মুহূর্তে অন্তঃকরণে রক্তক্ষরণ ঘটে তাঁর, তবু এরই মধ্যে নিরন্তর চালিয়ে যান কলম; রচনা করতে থাকেন একের পর এক উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি। তিনি জীবনের বড় অংশই

[১] রাবেয়া খাতুন, 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম স্মরণে', *শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
[২] সাঈদা আক্তার খুকু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

কাটিয়েছেন বিদেশের মাটিতে, অথচ তাঁর গল্প-উপন্যাসে কী প্রবল প্রভাব বিস্তার করে আছে বাংলাদেশ ও তার গ্রামজীবন! এর মাঝে শহরের, এমনকি বিদেশের প্রেক্ষাপটেও রচনা করেছেন উপন্যাস ও গল্প। তবু শামসুদ্দীন আবুল কালামের সাহিত্যের প্রায় শতভাগ জুড়েই আছে তাঁর গ্রাম, বিশেষ করে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র-তীরবর্তী জনপদের জীবনচিত্র। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র মতোই, শারীরিকভাবে প্রবাসে অবস্থান করলেও শামসুদ্দীন আবুল কালামের মনোজগতে বাংলাদেশ ও এর গ্রামাঞ্চল ছাড়া যেন আর কিছু ছিল না। ১৯৮৪ সালে রোম থেকে ভাগ্নে হারুন অর রশীদের স্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে দেশের জন্য এই মনোবেদনা অননুকরণীয় ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক –

> যারা ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে বলে টিটকিরি দিয়ে সুখ পেতে চায় পাক, কিন্তু এই মুহূর্তে এখানকার এই সুন্দর সময়টিতে আমার এই খোলামেলা ছাদে, ফুল-ফল-সবজি এমনকি যুঁই-সন্ধ্যামালতীর পরিবেশে ডানার মত কি থাকতে পারে তা আমারও বর্ণনার সাধ্য নেই। এ সুখ, এ আনন্দ একান্ত আমার। আমার বাস্তবিকই মনে হয় এর স্বাদ খুব কম লোকেরই জানা আছে। তার উপর ধরো সন্ধ্যায় এতবড় আকাশের আধখানা চাঁদ একদৃষ্টে আমার শাক-সবজি দিয়ে আমার প্রায় দেহাতী আহার দেখে, তখন লজ্জা পাওয়া দূরে থাক, হয় সেই ছেলেবেলার সন্ধ্যাগুলোর মত, হাতের কাছে যা নেই, সামনে রয়েছে। যদি ধনেপাতা দিয়ে আলুভর্তা আর কিছু ডাল করারও সুযোগ হয় তাহলে আর স্বর্গ নরকেরও কোনো পরোয়া থাকে না। এ অনুভূতি দেশের মানুষ বোঝে না, এদেশের মানুষের পক্ষেও উপলব্ধি দুঃসাধ্য।[১]

দূর প্রবাসে বসবাস করলেও তাঁর মনটি সবসময়ই পড়েছিল বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে। এ কারণেই নদীতে নৌকা ভাসিয়ে ইতালীয় মাঝিরা যে গান গায় তার সঙ্গে বাংলাদেশের ভাটিয়ালির সুরের মিল খুঁজে পান তিনি। বাংলার শ্যামল প্রান্তর, বিশেষ করে নিজ এলাকা বরিশালের পল্লি-প্রকৃতির প্রতি তীব্র ভালোবাসার কথা সুযোগ পেলেই প্রকাশ করেন নানাভাবে। ষাটের দশকে কথাসাহিত্যিক সৈয়দ আলী আহসানের সঙ্গে কথোপকথনের এক পর্যায়ে মন্তব্য করেছেন:

> বিদেশে থাকি কিন্তু আমার মনের মধ্যে আমার দেশ একটি স্থায়ী আসন গড়েছে। বরিশালের মানুষ আমি, বরিশালের নদীর কথা, খাল-বিলের কথা এবং জঙ্গলের কথা আমার খুব মনে পড়ে। এগুলো আমার মনে আছে বলেই আমি বেঁচে আছি।[২]

---

[১] *শামসুদ্দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

[২] সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

দেশের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল নিখাদ। তা না হলে এতবছর প্রবাস জীবনে থেকেও তিনি সাহিত্য রচনার জন্য দেশ, দেশের মাটি, মানুষ, প্রকৃতিকে বেছে নিতেন না। তাঁর প্রায় প্রতিটি রচনারই উপজীব্য বাংলার মাটি ও মানুষ, বিশেষত প্রান্তিক মানুষ। তিনি ছাড়া আর যাঁরা এই শ্রেণির মানুষদের লেখার উপজীব্য করেছেন তাঁদেরকেও অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানিয়েছেন তিনি। যেমন, আলাউদ্দিন আল আজাদের 'জানোয়ার' গল্পটি সম্পর্কে তিনি বলেন–'মাটি জড়িয়ে যারা আছে, সেই মুসলিম কৃষকের ছবি বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। আপনার প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য।'[১] দেশের মাটি থেকে বহু দূরে অবস্থান করেও এদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। মাইকেল মধুসূদনের মতো প্রবাসে বসে যেন দেশকে আরো গভীরভাবে ভালোবেসেছেন তিনি। রোমের নিঃসঙ্গ জীবন যে লেখক কোনোদিন উপভোগ করেছিলেন, তা তাঁর লেখা চিঠিপত্র পড়ে মনে হয় না। বস্তুত নানা সময়ই দেশে ফিরে আসার কথা ভেবেছেন তিনি, কিন্তু সেটি আর হয়ে ওঠেনি। এমনকি রোমে প্রবাস জীবনের আটাশতম বছরে, ১৯৮৭ সালে ভাগ্নে হারুন অর রশীদের-এর কাছে লেখা একটি চিঠিতে চূড়ান্তভাবে দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিলেন লেখক –

> আমি এবার মন স্থির করেই আসতে চাইছি। এখানে কাজ করতে না পারলে থেকে কোন লাভ নেই। লেখাপড়াটাকেও একমাত্র বড় কাজ মনে করলেও তার আয়ে জীবন চলে না। দেশে অন্তত প্রুফ পড়েও নিজের ডালভাতের ব্যবস্থা করা যাবে।[২]

ঢাকায় একটি বাড়ি নিয়ে অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে দেয়ারও ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন তিনি। বাড়ি নির্মাণে কত ব্যয় হতে পারে সেটিও ভাগ্নের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। দেশে ফিরে আর কিছু নয়, 'কেবলমাত্র একটা নিরিবিলি লেখাপড়ার ঘর ছাড়া আর বেশি কিছু' আশা করেননি লেখক। ঐ একই চিঠিতে জীবন নিয়ে তাঁর হতাশা নিচের খেদোক্তিতে ধরা পড়েছে –

> ঢাকায় এসে হাউস বিল্ডিং-এর লোন নিয়ে একটা দোতলা বাড়ি করতে পারলে একাংশ ভাড়া দিয়েও হয়তো বাকি দিনগুলো তোদের সঙ্গ-সাহচর্যে কাটিয়ে দেয়ার মত একটা উদ্যোগ নিতাম। অন্য কোথাও আমার পক্ষে কিছু সম্ভব

[১] আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'কালাম ভাই, সালাম', *শামসুদ্দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ*, পৃ.৪৫
[২] *শামসুদ্দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

হয়নি, হবে না, আর কারও উপর ভরসা করারও আর কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নেই। মাঝে মাঝে তোদের কাছে যূথীর রান্না কিছু ট্যাংরা পুঁটি খেলে আমার আর কোনই খেদ থাকবে না।[১]

জীবন ও জগৎকে তিনি অবলোকন করেছেন গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁর পৃথিবী ভালো ও মন্দ, শুভ ও অশুভ, কল্যাণ ও অকল্যাণের দুই ধারায় স্পষ্টভাবে বিভক্ত। শুভ ও কল্যাণের জয়ধ্বজা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার প্রয়াসে তিনি অক্লান্ত, নিবেদিতপ্রাণ। রোমান্টিক লেখক হিসেবে তিনি নতুনকে আলিঙ্গন করতে চান, কিন্তু পুরানোকে পরিত্যাগ করে নয়। তাঁর অধিকাংশ গল্প ও উপন্যাসেই অশুভকে হটিয়ে সত্যকে জয়যুক্ত করার একটি ব্যাকুল বাসনা পরিদৃষ্ট হয়। তিনি অতীতের অভিসারী নন, তবে অতীতের যা কিছু মানবতা আর ন্যায়ের বিরোধী তার বিরুদ্ধে তাঁর কলম সদাসক্রিয়। বাস্তবতাকে তিনি স্বীকার করেন, এর সবটুকু ক্লেদ আর সীমাবদ্ধতাসহ; কিন্তু তারপরও এই বাস্তবতাকে শুভ-পরিণামের জয়টিকা পরানোর ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টাও নিরন্তর। এজন্য তাঁকে কল্পনাবিলাসী বলা চলে, কিন্তু সবসময়ই যে কল্পনার সাগরে অবগাহন করে তিনি বাস্তবতাকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন তাও নয়। তাঁর অনেক গল্প ও উপন্যাসই তাই সমাপ্ত হয়েছে বাসনার অপূর্ণতার আর্তি নিয়ে, আকাঙ্ক্ষার সোনালি বন্দরে জাহাজ ভিড়াতে না পারার যন্ত্রণা নিয়ে। নিজের ব্যক্তিজীবন থেকে শিক্ষা নিয়েই তিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই সত্যের কাঠিন্য উপলব্ধি করার পরও সেই সত্যকেই ভালোবাসার চেষ্টা করেছেন। রোমান্টিকতার কুললক্ষণ মেনে নিয়েই প্রকৃতিপ্রেমে আচ্ছন্ন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। জীবনের সোনালি সময়ের প্রায় পুরোটাই দেশ থেকে বহুদূরে ইউরোপে পড়ে থেকেছেন, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেননি ফেলে আসা দেশ, দেশের মাটি ও মানুষকে।

তবে দেশে ফেরার যতই তাড়না থাকুক, শেষ পর্যন্ত সেটি আর হয়ে ওঠেনি। হয়তো দেশে এসে কোনো জীবিকার ব্যবস্থা করা যাবে কিনা এ অনিশ্চয়তাই তাঁকে আর দেশে আসতে দেয়নি। দেশের আলো-হাওয়া আর স্বজনের ভালোবাসাবঞ্চিত শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম দেশ আর আত্মীয়-পরিজনের সামান্য ভালোবাসার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। কথাসাহিত্যিক আলাউদ্দিন আল আজাদ ১৯৭৮ সালে রোমে বেড়াতে গিয়ে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কিছু সময় অতিবাহিত করেছিলেন। বিদায়ের মুহূর্তে লেখককে দেশে ফেরার অনুরোধ জানালে তিনি বেদনাক্লিষ্ট কণ্ঠে বলেছিলেন, প্রবাসে জীবন অতিবাহিত

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

করাই তাঁর নিয়তি। তবে একই সঙ্গে আরও একটি কথা বলেছিলেন যেটিকে দীর্ঘকাল স্বদেশের সান্নিধ্যবঞ্চিত এক বিবাগী মানুষের আর্তনাদ বলাই সঙ্গত – 'তবে আমার কফিনটা যদি যায়, তা ভালো হবে। নিজের মাটিতে কে না ঘুমাতে চায়।'

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের অবদান ছিল স্মরণীয়। ইউরোপে প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন তিনি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নির্যাতিত বাঙালির সঠিক অবস্থা বিশ্বদরবারে তুলে ধরে এদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠন করেন। কেন পাকিস্তানের নাগপাশ থেকে বাংলাদেশীদের মুক্তিলাভ করা প্রয়োজন সে ব্যাপারে যুক্তিতর্ক ইতালীয় ও জার্মান ভাষায় লিখে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করেন তিনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে শিল্পসাহিত্য জগতের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মতামত সংগ্রহ করে তিনি ব্যাপকভাবে প্রচারও করেন। বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর লন্ডনস্থ অফিসের সঙ্গে পুরোটা সময়ই তিনি যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অব্যবহিতকাল পরই মুক্ত স্বদেশকে নিজের চোখে দেখার জন্য দেশের মাটিতে পা রাখেন তিনি। সাক্ষাৎ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে। ইউরোপে ফিরে গিয়ে 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ : বাঙালি সত্তার সন্ধানে' নামে একটি নিবন্ধ রচনা করেন, যেটি ঢাকার দৈনিক 'সংবাদ'–এ প্রকাশিত হয়।[১] স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের পটভূমিতে একটি চলচ্চিত্র তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তিনি, এজন্য স্ক্রিপ্ট ও সিনারিও লেখার কাজও শেষ করেছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হোক, এ পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি।[২]

জীবিকার প্রয়োজনে জীবনের নানা পর্বে নানা কাজ করলেও আজীবন সাহিত্য-সাধনাতেই নিমগ্ন ছিলেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। সমাজ সচেতন কথাশিল্পী হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন তিনি। তাঁর মানসগঠন তৈরির সময়টি ছিল ইতিহাসের এক বিপর্যয়ের কাল। সমাজ পরিবর্তনের এ ক্রান্তিকালের লেখক শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের শিল্পিসত্তার স্বরূপ প্রসঙ্গে সৈয়দ আবুল মকসুদের অভিমত প্রণিধানযোগ্য–

[১] আবদুল মতিন, 'শামসুদদীন আবুল কালাম স্মরণে', *শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

ছাত্র জীবনেই তিনি লেখালেখি ও প্রগতিশীল রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। সেটি ছিল উত্তাল চল্লিশের দশক। বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ পর্যায়ে। সে আন্দোলনে ছিল তাঁর অংশগ্রহণ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও তাঁর ভূমিকা রয়েছে। চল্লিশে তিনি ছিলেন নিখিল বঙ্গ ছাত্র ফেডারেশনের একজন নেতা এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল আরএসপি'র সক্রিয় কর্মী। ওই দশকটিতেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণকালের বীভৎস দুর্ভিক্ষে বিপর্যস্ত হয় বাংলার জনপদ। বিশ্বযুদ্ধে লেলিহান শিখার তাপ পৌঁছে যায় বাংলাদেশের মানুষের শরীরে। অপমৃত্যু, সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ-নিপীড়ন সীমা অতিক্রম করে, গ্রামের মানুষ গরীব থেকে গরীবতর হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল কবি-সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৯৪৭-এর পর রাজনীতি থেকে অনেকটা সরে গেলেও সাধারণ মানুষের সমস্যার প্রতি তাঁর অঙ্গীকার অটুটই থাকে। সে চিহ্ন তাঁর রচনাবলীতে উপস্থিত।[১]

তরুণ বয়সে বামপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। যুক্তিবাদী মন ছিল তাঁর। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার আর অযৌক্তিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। তরুণ বয়সে রাজনীতিসম্পৃক্ততার কারণে তাঁর সাহিত্যেও শুরু থেকেই এই সচেতনতার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। বামপন্থায় বিশ্বাসের কারণেই হয়তো তাঁর গল্প-উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র শোষক ও শোষিত, এই দুই মোটাদাগে বিভক্ত। শোষকেরা সংখ্যায় অতি অল্প। বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার দুর্বলতা আর অর্থ ও প্রতিপত্তির জোরে বিপুল সংখ্যক শোষিতের ওপর ছড়ি ঘোরায় এরা, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কায়েম করে রাখে নিজেদের দর্প ও দাপট। হাতে গোনা এসব শোষককে নিঃশর্ত সমর্থন দিয়ে যায় তাদের কিছু বশংবদ। লাঠিয়াল, নায়েব, জোতদার ইত্যাদি পরিচয়ে এরা শোষকের রাজত্ব নিরঙ্কুশ রাখতে সহায়তা করে। শোষিতরা সংখ্যায় বিপুল, কিন্তু হীনবল। শোষকের চাহিদা মেটাতেই তাদের প্রাণান্ত, চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোনোরকমে কায়ক্লেশে তারা টিকিয়ে রাখে নিজেদের অস্তিত্ব। তাদের মধ্যেও ক্রিয়াশীল আছে শ্রেণিচেতনা, আছে নিজেদের অবস্থা ফেরানোর দুর্মর বাসনা। কিন্তু সংকল্প আর আত্মবিশ্বাসের অভাবে দিনদিন কেবল নাজুক থেকে আরো নাজুক হতে থাকে তাদের অবস্থা। মানবতার মুক্তি আর শ্রেণিসংগ্রামে আস্থাশীল শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম স্বপ্ন দেখেন, একদিন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া এসব মানুষ ঘুরে দাঁড়াবে, সেদিন তাদের বুকের মধ্যে আটকে থাকা সকল ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটবে, আর সেই ক্ষোভের

[১] সৈয়দ আবুল মকসুদ, 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম', *শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

সাগরে ডুবে মরবে শোষকের দল। জীবনের প্রতি শিল্পীর দায়বদ্ধতা থেকেই জীবন ও সাহিত্যের প্রতি প্রতিশ্রুতি আর আত্মনিবেদনের স্বাক্ষর রেখেছেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম। গল্পকার হিসেবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুখ-দুঃখের পাঁচালি রচনায় যেমন, তেমনি প্রকৃতি ও মানুষের যুগলবন্দির চিত্র অঙ্কনেও শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। *পথ জানা নাই*, *অনেক দিনের আশা*, *ঢেউ*, *দুই হৃদয়ের তীর*, *পুঁই ডালিমের কাব্য* ইত্যাদি প্রতিনিধিত্বশীল গল্পগ্রন্থে লেখকের জীবনভাবনা নানা রূপে বিধৃত হয়েছে। একনিষ্ঠ আন্তরিকতায় বিরূপ প্রকৃতি এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষের গল্প বলেছেন তিনি। সাধারণ মানুষের ছোট ছোট স্বপ্ন, জীবনের করুণ বাস্তবতা কিছুই তাঁর চোখ এড়ায়নি। বিশ শতকের প্রথম ভাগের ঔপনিবেশিক বাস্তবতা তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পের পটভূমি। নগরায়ণ, বেকারত্ব, ক্ষুধা ও সামন্ত শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে এক অস্থির সময়ের যাত্রী তাঁর ছোটগল্পের চরিত্রগুলো। দ্রুত পরিবর্তনশীল এ সময় ও সমাজকে গল্পের ক্যানভাসে বন্দি করার ক্ষেত্রে লেখকের সফলতা ও ব্যর্থতা উভয়ই আছে। আবার একইসঙ্গে বিশ শতকী গ্রামীণ বাস্তবতার প্রামাণ্য প্রতিরূপ অঙ্কনে লেখকের দক্ষতাও প্রশংসার দাবিদার।

তাঁর গ্রামজীবননির্ভর প্রথম উপন্যাস *আলমনগরের উপকথা-য়* স্বদেশ ও সমকালের জীবনঘনিষ্ঠ প্রতিফলন ঘটাতে না পারলেও ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসমাজের প্রেক্ষাপটে নতুন সমাজের জয়গাথা রচনার মাধ্যমে যশস্বী ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলা পথেই যেন হাঁটার ইঙ্গিত দেন তিনি। মাত্র একবছরের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় *কাশবনের কন্যা* – যেটি তাঁর সবচেয়ে আলোচিত উপন্যাস। বইটি নিয়ে লেখকের নিজেরও অনেক গর্ব ছিল। সে সম্বন্ধে লেখকের নিজের ভাষ্য, 'এ বইতে যে জীবনের কথা বলা হয়েছে সেই জীবনকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আমি সে জীবনের মধ্যেই ছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমার বইটি সবার ভালো লাগবে।'[১] এ উপন্যাসে নতুন পথের অনুসন্ধানী হলেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম। অবশিষ্ট জীবনকাল শ্যামল বাংলার মাটি ও মানুষের আন্তরিক গাথা রচনায় ব্রতী হলেন তিনি। বিশেষ করে নদী ও নদীতীরবর্তী মানুষের মধ্যে দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে গড়ে ওঠা গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ককে বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্ত্যজ মানুষের জীবনগাথা রচনার যে প্রয়াস তিনি নিলেন, তা থেকে বাকি জীবন আর বিচ্যুত হননি।

[১] সৈয়দ আলী আহসান, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬

'অসংখ্য নদীনালা খালবিল অধ্যুষিত গ্রামবাংলা যেন সগৌরবে জেগে উঠেছে এই উপন্যাসে।'[১] *কাশবনের কন্যা* যেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের সাহিত্যসাধনার মূল সুরটিকে সঠিক তারে বেঁধে দিয়েছে। এরপর মাঝেমধ্যেই ভিন্নপথের পথিক হয়েছেন, এমনকি রোমের পটভূমিতেও রচনা করেছেন উপন্যাস; কিন্তু 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম ছিলেন 'দেশজ সংস্কৃতি ও জীবন'-এর প্রতি দায়বদ্ধ। তাঁর সাহিত্যে এই বোধ ও অনুরাগের ছাপ স্পষ্ট।'[২] কথাসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর খ্যাতিও এর ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্র। প্রবল আন্তরিকতা নিয়ে পল্লি জনগোষ্ঠীর জীবনের ভেতর-বাইরের চিত্র এঁকেছেন তিনি এ উপন্যাসে, যা সুখ-দুঃখ, সংস্কার-কুসংস্কার ও ঐতিহ্যনির্ভর গ্রামীণ জীবনের নানা বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছে।

জায়জঙ্গল ও *সমুদ্রবাসর* – এ দুটো উপন্যাসে বাংলাদেশের সমুদ্র-তীবরবর্তী অঞ্চলের জীবনযাত্রা চিত্রিত করেছেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। সুন্দরবন সন্নিহিত অঞ্চলে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য ও বিরূপ পরিস্থিতির সঙ্গে নিরন্তর মিতালি এখানকার মানুষের। এদের জীবনে যখন-তখন নেমে আসে নানা দুর্যোগ দুর্বিপাক। হিংস্র বাঘ বা বিষাক্ত সাপের কবলে পড়ে যে কোনো সময় চলে যেতে পারে জীবন। তবুও নানা অনিশ্চয়তাকে সঙ্গী করেও প্রজন্মের পর প্রজন্ম এখানে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে তারা। সুন্দরবন আর বঙ্গোপসাগর – দুটোই তাদের অন্নদাতা, পরম আশ্রয়। *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসে দেখা যায়, প্রকৃতির অনিশ্চয়তার সাথে ক্ষমতালোভী শোষকের অত্যাচারও যখন যুক্ত হয়, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ তখন সমুদ্রের মতোই ফুঁসে ওঠে। বিরূপ প্রকৃতি তাদের মধ্যে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর যে প্রেরণার জন্ম দিয়েছে তারই ফলে শোষকের নির্যাতনের মুখে রুখে দাঁড়ায় সাধারণ মানুষ। প্রায় একই চেতনা থেকে রচিত *জায়জঙ্গল* উপন্যাসেও সমুদ্র-তীরবর্তী বিরূপ প্রকৃতি আর বিবেকহীন শোষকের বিরুদ্ধে নির্যাতিত, বঞ্চিত মানুষের জয়গান রচনা করেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। প্রান্তিক মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যূথবদ্ধ সংগ্রামের এক আন্তরিক গাথা এই উপন্যাস।

---

[১] আজহার ইসলাম, 'বাংলাদেশের অপাংক্তেয় জীবনের নীরব রূপকার শামসুদদীন আবুল কালাম', *শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

[২] আবুল আহসান চৌধুরী, 'কাশবনের কন্যা: চকিত অবলোকন', *উষালোকে*, সম্পাদক: মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ, নব পর্যায় তৃতীয় সংখ্যা, ২০০৪, পৃ, ৯

১৯৮৬ সালে প্রকাশিত *যার সাথে যার* উপন্যাসে গ্রামীণ পটভূমিতে শুভ-অশুভ আর সত্য-অসত্যের চিরন্তন দ্বন্দ্বেরই চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক। জোতদার জলিল মিঞার সঙ্গে নিমু হাওলাদারের নেতৃত্বে অধিকার রক্ষায় কৃতসংকল্প গ্রামের সাধারণ মানুষের জাগরণের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে এ উপন্যাসে, যার নানা অংশে গ্রামীণ জীবনচিত্রের বিশ্বস্ত রূপায়ণ ঘটিয়েছেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম। দেশপ্রেমী আর দেশবিমুখ – এই দুই মানসিকতার মানুষের টানাপড়েনের চিত্র সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা হয়েছে *নবান্ন* (১৯৮৭) উপন্যাসে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের সার্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক মুক্তির কেবলমাত্র প্রথম ধাপটাই যে অর্জিত হয়েছে, সে সত্যটিকে পাঠকের মনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন লেখক এ উপন্যাসে। শামসুদ্দীন আবুল কালামের মৃত্যুর পর প্রকাশিত উপন্যাস *কাঞ্চনগ্রাম* (১৯৯৮) নিয়ে তাঁর স্বপ্ন ছিল অনেক। বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিতে আবহমান বাংলার সমাজজীবনের চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন তিনি এ উপন্যাসে। বিশালায়তন এ উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মনোজাগতিক চিন্তা ও টানাপড়েন, দেশের সঙ্গে মানুষের অন্তরের যে যোগ, সেটিকেই স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম। বলা যায়, আবহমানকাল ধরে স্বাধীনতার জন্য সাধারণ মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা ও প্রস্তুতি, সেটিকেই ভাষারূপ দিতে চেয়েছেন লেখক, মানুষের মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে লক্ষ প্রাণের আত্মদানের মধ্য দিয়ে সফল করার যে চেষ্টা ও সংগ্রাম – সেটিকেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম। এ কারণে উপন্যাসটি তাঁর মহত্তম সৃষ্টিগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে।

নিজের রচনাকর্ম বিপুল পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেয়ার একটি আকুতি তাঁর ভেতর সবসময়ই ক্রিয়াশীল ছিল। এজন্য ঘনিষ্ঠজনদের পাণ্ডুলিপি পড়িয়ে সে সম্বন্ধে মতামত চাইতেন। নিজের *নবান্ন* উপন্যাসটি অনুবাদ করেছিলেন ইংরেজি ও ইতালিয়ান ভাষায়। নিজের উপন্যাসগুলোর মধ্যে *কাঞ্চনগ্রাম* ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। এটিকেই তিনি নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে বিশ্বাস করতেন। ব্যাপক পরিশ্রম আর গবেষণার মাধ্যমে লিখিত *কাঞ্চনগ্রাম* উপন্যাসের পরিবর্তে 'প্রায় হেলাফেলায় লেখা' *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসটি কেন এত জনপ্রিয় হলো এ নিয়ে এক ধরনের বিস্ময় ও খেদও ছিল তাঁর মনে, যা বন্ধুবর আবদুল মতিনকে লেখা চিঠিতে জানা যায়।[১]

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

রোম নগরীর উত্তরাঞ্চলে ছিমছাম এক শহরতলীর একটি অ্যাপার্টমেন্টে জীবনের দীর্ঘসময় অতিবাহিত করেছিলেন তিনি। আত্মীয়-বন্ধুহীন নিঃসঙ্গ এই প্রবাসে বই-পত্র ও লেখালেখিই ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আবদুল মতিনের লেখা থেকে তাঁর এই সময়কার জীবনযাপনের চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় –

> বিভিন্ন ভাষার বইপত্র এবং তাঁর রচিত পাণ্ডুলিপি-ভর্তি অ্যাপার্টমেন্টটি প্রকৃত "স্বর্ণখনি" বলে উল্লেখ করলে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর বিরাট টেবিলের ওপর ছিল বইপত্র, খবরের কাগজ, বিভিন্ন সাময়িকীর 'ক্লিপিং', বহু চিঠিপত্র এবং অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি। ছাপার জন্য তৈরী পাণ্ডুলিপিগুলি ছিল দেওয়ালের গায়ে লাগানো বইয়ের তাকের উপর। শামসুদ্দীন সাহেব বললেন, তিনি প্রতিদিন তাঁর লেখার টেবিলে ৮/১০ ঘণ্টা খবরের কাগজ পড়ে, সাহিত্য-চর্চা করে এবং চিঠিপত্র লিখে কাটান। বিকেলে কাছাকাছি একটা পার্কে বেড়াতে যান, ফিরে আসার সময় খাবার জিনিসপত্র নিয়ে আসেন এবং রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় গিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত নানা ধরনের বইপত্র পড়েন।[১]

দর্শনীয় নানা স্থানে ভ্রমণের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল, প্রচুর ভ্রমণ করেছেনও। এর মধ্যে গ্রিসের ইথাকা দ্বীপ তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করত। পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্যগত কারণে ভ্রমণ অনেকটাই কমিয়ে দেন এবং প্রায় পুরোটা সময়ই রোমের অ্যাপার্টমেন্টে পড়াশোনা ও লেখালেখিতে ব্যয় করেন। ১৯৯০ সালে অসুস্থ হয়ে পড়লে রোমের সান কামিল্লো হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁর হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসে সফল অস্ত্রোপচারের পর উত্তর ইতালির গার্দা লেকের ভিলা গার্দা ক্লিনিকে বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে রোমে ফিরে যান। এরই মধ্যে তাঁর বাম চোখে সমস্যা দেখা দেয়, যা তাঁর পড়ালেখায় দারুণ ব্যাঘাত ঘটায়। এছাড়াও বিভিন্ন ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় নানারকম শারীরিক সমস্যায়ও আক্রান্ত হয়ে পড়েন। নিজের শরীর-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ক্রমশ হতাশা বাড়তে থাকে তাঁর। ১৯৯৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর আবদুল মতিনকে লেখা একটি চিঠিতে এই হতাশার প্রতিফলন ঘটেছে – 'আজকাল আমার প্রায় নানা ভয় হয়। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারি না; ডাক্তারদের সমীক্ষা এবং সকল মতামতের সঙ্গে আমার আগ্রহ, ইচ্ছা এবং অভিজ্ঞতারও মিল পাই না।'[২] ১৯৯৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর আবদুল মতিনকে লেখা সর্বশেষ চিঠিতে রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া এবং এজন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার

[১] আবদুল মতিন, *শামসুদ্দীন আবুল কালাম ও তাঁর পত্রাবলী*, র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশান্স, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৯৮, পৃ. ৫১
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯

কথাও জানা যায়। ১৯৯৭-এর ৪ঠা মার্চ একটি চিঠির মাধ্যমে আবদুল মতিনকে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের মৃত্যুর কথা জানায় রোমে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস। পরবর্তীকালে জানা যায়, ১৯৯৭-এর ১০ জানুয়ারি লেখকের মৃত্যু হয় এবং ইতালীয় আইন অনুযায়ী নিকটাত্মীয়দের জন্য এক সপ্তাহ অপেক্ষা করার পর 'সিমিটেরো কমিউনালে দেল ভেরানো' নামে পরিচিত রোমের প্রধান সমাধিক্ষেত্রে তাঁর মৃতদেহ দাফন করা হয়। পুলিশ কর্তৃপক্ষের চিঠি থেকে জানা যায়, তাঁর মৃত্যুর কারণ হচ্ছে হৃৎপিণ্ডে অপর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ এবং কিডনির অক্ষমতা। এভাবেই মাতৃভূমি থেকে দীর্ঘ আটত্রিশ বছরের স্বেচ্ছা-নির্বাসন শেষে প্রবাসেই জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হয় দক্ষিণবঙ্গের মাটি ও মানুষের কথাকার শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের। জীবনের অনেক অপূর্ণ ইচ্ছার মতো বাংলাদেশের মাটিতে শেষশয্যা গ্রহণের আকুতিও তাঁর অপূর্ণই থেকে যায়।

১৯৪৭-এর দেশভাগ পরবর্তী উত্তাল সময়ে ঢাকাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের আত্মপরিচয়বাহী সাহিত্য রচনার ভুবন নির্মাণের প্রচেষ্টায় যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁদেরই একজন। তখনও প্রবাসে নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নেননি তিনি, ছিলেন দেশ ও দেশের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে। ফলে খুব কাছ থেকে অবলোকন করতে পেরেছিলেন পরিবর্তনশীল দেশ ও কালকে। বহমান সময়ের রাজনৈতিক-সামাজিক নানাবিধ ঘটনা তাঁর এ সময়ের সাহিত্যের বিষয় হয়েছে। এ সময়ের সঙ্গে যদি তাঁর প্রবাসে অবস্থানকালীন সাহিত্য, বিশেষ করে আশির দশকের সাহিত্যের তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, তখনও নিজের সাহিত্যসাধনার মূল কক্ষপথ – গ্রামবাংলার জনজীবনকেই আশ্রয় করে আছেন ঠিকই; কিন্তু ততদিনে কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটে গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই পুনরাবৃত্তি আর রোমান্টিক কল্পনার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা সাহিত্যের শিল্পগুণ ক্ষুণ্ন করেছে। সমালোচকের ভাষায়, 'তাঁর শেষ পর্যায়ের গল্প-উপন্যাস পাঠকের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। তাঁর উপন্যাস 'জায়জঙ্গল', 'নবান্ন', 'সমুদ্রবাসর', 'যার সাথে যার' ও 'মনের মতো ঠাঁই' এবং গল্পগ্রন্থ 'পুঁই ডালিমের কাব্য' ও 'মজা গাঙের গান' আশির দশকে প্রকাশিত। এই সময় বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে নতুন প্রজন্মের লেখকগণ তাঁদের গল্প-উপন্যাস নিয়ে উপস্থিত হন। নতুন লেখকদের অবস্থান কোথায় এবং নতুন লেখকের পাঠকের রুচি কি রকম সে সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণা ছিলো না পঞ্চাশের দশকের এই

কথাশিল্পীর।'[১] এই সমালোচনার সঙ্গে সর্বাংশে একমত না হয়েও একথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, পঞ্চাশ-ষাটের দশকের পর এদেশের আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে যেসব পরিবর্তন ঘটে গেছে সে সম্বন্ধে সর্বাংশে জ্ঞাত ছিলেন না শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, থাকা সম্ভবও ছিল না। এ কারণেই, তাঁর দুই দশক আগের আর পরের উপন্যাস বা গল্পে বাংলাদেশের গ্রাম ও গ্রামজীবনের পটভূমি প্রায় একইরকম রয়ে গেছে, সময়ের প্রবাহে বাস্তবে যে গুণ ও মাত্রাগত পরিবর্তন ঘটেছে সেটি তিনি পুরোপুরি ধারণ করতে পারেননি। এটি তাঁর অক্ষমতা নয়, দীর্ঘদিন স্বদেশ-স্বজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকারই অনিবার্য পরিণতি।

মানবতাবাদী শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর লেখনিতে সবসময় মানবতার জয়বার্তা ঘোষণা করেছেন। সমাজের পিছিয়ে পড়া, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য ছিল তাঁর অপার সহানুভূতি। তাঁদের জীবনের নানা বঞ্চনা, অবহেলা আর অপ্রাপ্তির বেদনাকে গল্পে আর উপন্যাসে তিনি ব্যক্ত করেছেন নানাভাবে। এ চেষ্টার মধ্যে সারল্যভরা অতিশয়োক্তি ছিল, ছিল পুনরুক্তির একঘেয়েমি; কিন্তু আন্তরিকতায় খাদ ছিল না একবিন্দুও। লেখকের শেষের দিকে লেখা চিঠিগুলোতে পাঠকের কাছে নিজের লেখা পৌঁছে দেবার আকুলতা চোখে পড়ে।[২] অনুবাদের মাধ্যমে ভিনদেশি পাঠকের কাছে পৌঁছানোর আগ্রহও ছিল তাঁর। কিন্তু নানা কারণে সেসব চেষ্টা ফলপ্রসূ না হওয়ায় তাঁর মনে গভীর আক্ষেপ ছিল। সে আক্ষেপ নিয়েই নিঃসঙ্গ প্রবাসে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। তাঁর শিল্পিসত্তার মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি ভালোবাসা। সে ভালোবাসার শিল্পোত্তীর্ণ প্রকাশই শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের জীবনের মহত্তম অর্জন।

[১] সৈয়দ আবুল মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
[২] আবদুল মতিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম

সাহিত্য মূলত জীবনানুভবেরই শিল্পরূপ। সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতা ও জীবনভাবনার প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে। সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রূপকল্প হচ্ছে কথাসাহিত্য। এটি কাহিনিমূলক এক বিশেষ সাহিত্যিক রূপকল্প যাতে মানবজীবন ও সমাজবাস্তবতার সামগ্রিক দিক বিচিত্রভঙ্গিতে বিধৃত হয়। এর দুটি রূপ– উপন্যাস ও ছোটগল্প।

সাহিত্যাঙ্গনে কথাসাহিত্যের সূত্রপাত অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে 'যখন মধ্যযুগীয় গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজচেতনা থেকে ক্রমশ গণতন্ত্রভিত্তিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম।'[১] মধ্যযুগে ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রভাবে ইউরোপের দেশে দেশে জ্ঞানচর্চার এক অভূতপূর্ব জোয়ারের সৃষ্টি হয়। শিক্ষা ও শিল্পবিস্তারের প্রতিক্রিয়ায় সমাজে দেখা দেয় বিপুল প্রাণচাঞ্চল্য। বৃহৎবঙ্গেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভুবনে নতুন নতুন উদ্ভাবনের সূচনা ঘটে। 'এই সঙ্গে মানবতাবিরোধী প্রাচীন সংস্কার ও ধারণার বর্জন, যুক্তিবাদবরণ ও প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যের নবমূল্যায়নের প্রচেষ্টা যুক্ত হয়।'[২] এমনই এক প্রেক্ষাপটে ক্রমবিকাশমান বুর্জোয়া মধ্যবিত্তশ্রেণির জীবনপ্রবাহের সঙ্গে সমন্বিত হয়েই বাংলা কথাসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ। ফলে তাঁদের শ্রেণিচরিত্র, জাত্যভিমান, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাধারাই মূলত সে সময়ের উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়। এ এমন এক সময় যখন বাঙালির শতাব্দীলালিত বিশ্বাস আর সংস্কারের দেয়ালে আঘাত হানতে থাকে নতুন চেতনা আর বিশ্বাস।

পুরানোকে ভেঙেচুরে নতুন সৃষ্টির আনন্দে উদ্‌বেলিত শিক্ষিত বাঙালি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপীয় কথাসাহিত্যের আদলে বাংলা কথাসাহিত্যের সূচনা ঘটায়। সূচনাপর্বের মুখ্যভাগে দেশজ ও বিদেশি

[১] গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা ১৩৮০, পৃ.৯
[২] দেবীপদ ভট্টাচার্য, *উপন্যাসের কথা*, সুপ্রকাশ প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ১৩৬৮, পৃ.১৫৫

উপাদানের সংমিশ্রণে রোমান্টিক লোককাহিনি, পৌরাণিক উপাখ্যান ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে তাঁদের সাহিত্যের মূল উপজীব্য করলেন। সমকালীন জীবনচিত্র তখন নিতান্তই গৌণ। মিসেস হ্যানা ক্যাথারিন মুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' ছাড়া সে সময় আর কোনো সামাজিক উপন্যাস রচিত হয়নি। এ গ্রন্থে উপন্যাসের সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান না থাকায় এটিকে সার্থক উপন্যাস বলা হয়নি। ১৮২৩ থেকে ১৮৬২ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারটি সাহিত্যকর্ম প্রকাশিত হয় যেগুলোর মধ্যে উপন্যাসের স্বভাবধর্ম লক্ষণীয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) 'নববাবু বিলাস' (১৮২৩), হ্যানা ক্যাথারিন মুলেন্স (১৮২৬-১৮৬৩)-এর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২), প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৭) এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২)। এ চারটি উপাখ্যানের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'কে অনেকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দিতে চান, তবে 'উপন্যাসোচিত বাস্তবতা নির্মাণে' *আলালের ঘরের দুলাল*-এর সার্থকতা এবং 'উপন্যাসের সকল প্রতিশ্রুতি' পালনের কথা স্বীকার করলেও অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধ প্রয়োগের কারণে শিল্পকর্ম হিসেবে এটি কলোত্তীর্ণ হতে পারেনি বলে মতপ্রকাশ করেছেন সমালোচকেরা।[১] ফলে অপেক্ষা করতে হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) 'দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) উপন্যাসের জন্য যেটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাসের স্বীকৃতি অর্জন করে।

উপন্যাসের মতোই এদেশে ছোটগল্পের উন্মেষের পেছনেও ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবদান ছিল প্রশংসনীয়। দীর্ঘ প্রায় দুশো বছরের ইংরেজ শাসনে এদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর মতোই মানুষের মনন ও চিন্তনের জগতেও বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। এদেশের জীবনচর্চা ও জ্ঞানচর্চায় ইউরোপীয় প্রভাব নব্যশিক্ষিত ভারতীয়দের মনে বড় ধরনের আলোড়ন তৈরি করে। ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যের প্রভাবে রসজ্ঞ মানুষের মনে সাহিত্যচর্চার নতুন প্রেরণা সৃষ্টি হয়। ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদের প্রসার ঘটে এবং এতে বাংলা সাহিত্যেও নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটে। ফলে সমকালীন ইউরোপীয় সাহিত্যের, বিশেষত ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গের প্রচলন ঘটে বাংলায়। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় প্রভাব এবং নতুন চিন্তা-চেতনার মিথস্ক্রিয়ায় উনিশ শতকের প্রায় শেষ

[১] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, '*বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৮০, পৃ. ৬৬-৭১

পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যে উন্মেষ ঘটে ছোটগল্প-ধারার। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের উদ্‌গাতা প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প 'ভিখারিনী' (১৮৭৭)। এর পর 'রাজপথের কথা', 'ঘাটের কথা' নামে আরো দুটি গল্পও প্রকাশিত হয়। তবে উনিশ শতকের শেষ দশকে প্রকাশিত 'দেনাপাওনা' (১৮৯১) গল্পটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পের খ্যাতি অর্জন করে। উনিশ শতকেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখ কথাসাহিত্যিকের পরিচর্যায় উপন্যাস ও ছোটগল্প শিল্পসার্থক রূপ অর্জন করলেও বিশ শতকে এসে তা বিচিত্র ধারায় বিকশিত ও পল্লবিত হয়। উনিশ শতকের উপন্যাস যেখানে ছিল প্রধানত ইতিহাস ও রোমান্সকেন্দ্রিক সেখানে বিশ শতকের উপন্যাস হয়ে ওঠে সামজ-রাজনীতির অসামান্য শিল্পরূপ। বিশ শতকের শুরুতে রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' উপন্যাসের মাধ্যমে বঙ্কিম-অনুসৃত ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের ধারা থেকে সরে আসেন এবং প্রাধান্য দেন ব্যক্তিচরিত্রের মন ও মনস্তত্ত্বকে। শরৎচন্দ্র নগরকেন্দ্রিক জীবনের পরিবর্তে প্রধানত বেছে নেন গ্রামীণ জীবনকে। তিরিশোত্তর ঔপন্যাসিকরা এ-ধারাকে আরো সম্প্রসারিত করেন। জগদীশ গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের মাধ্যমে উপন্যাসের সীমা অনেকখানি বিস্তৃত ও প্রসারিত হয়। অতঃপর চল্লিশের দশকে সুবোধ ঘোষ, বনফুল, সতীনাথ ভাদুড়ী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সমরেশ বসু প্রমুখ ঔপন্যাসিকের পরিচর্যায় উপন্যাস-শিল্প হয়ে ওঠে জীবন ও শিল্পের নান্দনিক বাহন।

১৯৪৭ সালে ভারতবিভক্তির পর কোলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি পূর্ববঙ্গেও সাহিত্যচর্চার একটি স্বতন্ত্র ধারা পরিদৃষ্ট হয়। এ-ধারা আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক মনে হলেও মূলত এর সূচনা ঘটে এক শতাব্দীকাল পূর্বে, বিশেষত সিপাহি বিদ্রোহের অব্যবহিত পরবর্তী পর্যায়ে। ১৭৫৭ সালে সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর বাঙালি হিন্দু যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যের চর্চা করেছে, ইংরেজ প্রশাসনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; সেখানে মুসলমান সমাজ এসবের প্রতি তীব্র বিমুখতা প্রদর্শন করে। কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানরা আত্মসম্বিৎ ফিরে পেতে থাকে এবং নিজেদের ভুলকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। অতঃপর তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পসাহিত্য চর্চায় কিছুটা উদ্যোগী হলেও এ-ধারা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ এবং এর গতিও ছিল অত্যন্ত মন্থর। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে এসে বাংলার সামগ্রিক

জাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে অনগ্রসর মুসলিম সমাজেও সাহিত্যের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণের সৃষ্টি হয়। সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতার কারণে শিক্ষাদীক্ষা ও আর্থ-সামাজিক সকল সূচকে অনেক এগিয়ে থাকা হিন্দু জনগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার আকাঙ্ক্ষা থেকে সাহিত্যের মাধ্যমে স্বধর্মীদের জাগ্রত করার প্রয়াস নেন শিক্ষিত মুসলিমদের একটি অংশ। এঁদের অধিকাংশই ইসলামি চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। মুক্তবুদ্ধি ও উদারনৈতিক চেতনাকে সঙ্গী করে সাহিত্যরচনার প্রয়াস পেয়েছেন এমন সাহিত্যিকদের সংখ্যা এ-পর্যায়ে ছিল অত্যল্প। কিন্তু 'বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে মুসলিম রচিত কথাসাহিত্যে দুটো পৃথক ধারার সন্দীপন লক্ষণীয়। স্বদেশ ও স্বজাতির কৃষ্টি সচেতন কতিপয় লেখকের মুসলিম উদ্দীপনা বা জাগরণীমূলক কথাসাহিত্য। দ্বিতীয় পক্ষে মুক্তবুদ্ধি তথা নিরপেক্ষ শিল্পদৃষ্টির প্রয়াসসঞ্জাত কথাসাহিত্য।'[১]

বিভাগোত্তর বাংলাদেশে কথাসাহিত্যের স্বতন্ত্র ভুবন নির্মাণে যাঁরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছেন আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১), অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১) শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), আবু রুশদ (১৯১৯-২০১০), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১), সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯২৩-১৯৮৬), রশীদ করিম (১৯২৫-২০১১), শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭), আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩), শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-১৯৭১), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯), জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২) প্রমুখ। বিভাগ-পরবর্তীকালে এঁরাই কথাশিল্পী হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৪৭ সালের ভারতভাগ এদেশের সাহিত্যাঙ্গনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করে। এসময় থেকেই বাংলা সাহিত্যের ধারাটি 'পশ্চিমবঙ্গ' ও 'পূর্ব পাকিস্তান' – এই দুটি উপধারায় বিভক্ত হয়ে পথ চলতে থাকে। পশ্চিম বাংলা তথা রাঢ় ভূখণ্ডের আবহমান সমাজবিন্যাস ও জীবন সংগঠনের সঙ্গে পূর্ববাংলার নদ-নদী অধ্যুষিত নিয়ত ভাঙ্গন ও নির্মাণশীল সমাজকাঠামোর ভূপ্রাকৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য আদিকাল থেকেই বিদ্যমান।[২] দেশভাগের মাধ্যমে দুই বাংলার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ধারা এই পার্থক্যকে আরো সুস্পষ্ট করে তোলে। এটি পূর্ব বাংলার সাহিত্যিকদের সামনে একদিকে যেমন নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়, অন্যদিকে নিজেদের স্বতন্ত্র

[১] অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, প্রথম প্রকাশ, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী ১৯৯৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
[২] রফিকউল্লাহ খান, *শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, জুন ২০০১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

সাহিত্যভুবন নির্মাণের চ্যালেঞ্জেরও সম্মুখীন করে। মুসলমানপ্রধান পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিকরাও এই সমস্যা ও সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথাসাহিত্যের আয়নায় সমাজ-বাস্তবতার প্রতিবিম্ব অঙ্কনে প্রয়াসী হন। 'রাষ্ট্র ও সমাজবিন্যাসের নতুন রূপ এবং অস্তিত্বের নবতর জিজ্ঞাসায় উপন্যাসের বিষয়-উৎসও হয়ে উঠলো স্বতন্ত্র।'[১] ফলে তাঁরা তাঁদের কথাসাহিত্যে বহমান সমাজজীবনের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতমুখর বিপর্যস্ত সমাজের সামগ্রিক চিত্র রূপায়ণেও সচেষ্ট ছিলেন।

এ-পর্বের সাহিত্যিকদের মধ্যে অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১) বিশেষ খ্যাতিমান। *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসের মাধ্যমে তিতাস নদীর তীরবর্তী জেলে সম্প্রদায়ের বাস্তব জীবনালেখ্যই তুলে ধরেছেন লেখক। হিন্দু জেলে সম্প্রদায়ের জীবনকাহিনির পাশাপাশি মুসলিম কৃষক-সমাজের কাহিনিও এতে স্থান পেয়েছে। সাহিত্যিকসুলভ সংযমবোধের পরিচয় দিয়ে যন্ত্রসভ্যতার দাপটে নিষ্পেষিত প্রান্তিক জীবনের করুণ আলেখ্য রচনা করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনের পটভূমিকায় পরিবর্তনশীল সমাজবাস্তবতাকে নিরাভরণরূপে ধারণ করার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক। অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল বোধে তাড়িত হয়ে নিরাবেগ বর্ণনার মাধ্যমে তিতাস তীরবর্তী মানুষের জীবনালেখ্য রচনা করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ, যা বাংলা সাহিত্যে তাঁর জন্য একটি স্থায়ী আসন নিশ্চিত করেছে। 'দৃষ্টির গভীরতা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা – এ দু'টি সক্ষমতায় যাদের সাহিত্যবোধ অন্বিত তারাই আঞ্চলিক জীবনের নিবিড়তার অনুভূতির মধ্যে জীবনরসের সন্ধান পান। এই জীবনরস আর ক্ষুদ্র অঞ্চলের জৈবনিক থাকে না, বৃহৎ জীবনের চরম সত্য হয়ে ওঠে। অদ্বৈত মল্লবর্মণ সেই সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন।'[২]

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের এ পর্বের আরেক প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)। বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার নতুন ভূখণ্ডের গ্রামীণ জীবনবাস্তবতার অন্যতম রূপকার তিনি। 'গ্রামীণ সামাজিক পরিবেশের বাস্তব রূপকার হিসেবে রূপক উপন্যাস সৃষ্টির দক্ষতায় এবং তীক্ষ্ণ অথচ পরিহাসব্যঞ্জক ভাষা

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

[২] অয়নান্ত রায়, *তিতাসের আঞ্চলিকতা: সর্বমানবিক জীবনভাষ্য*, 'তিতাস-স্রষ্টা অদ্বৈত মল্লবর্মণ জীবন, সৃজন ও রূপায়ণ', সম্পাদনা: ড. অরূপ কুমার দাস, কোলকাতা: বামা পুস্তকালয়, পৃ. ৪০

নির্মাণে শওকত ওসমান বিরল কৃতিত্বের দাবিদার।'[১] 'ইতিহাস ও মননচর্চার মধ্য দিয়ে শওকত ওসমান রচিত কথাসাহিত্য আমাদের যথাযথ প্রেক্ষিত ও বাস্তবতাকে চিহ্নিত করেছে।'[২] তাঁর *জননী* (১৯৫৮) উপন্যাস-এ বিশ শতকের প্রথম পর্যায়ের গ্রামজীবনের বাস্তবতা এবং হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থানের চিত্র সততার সাথে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিরুদ্ধ স্রোত ঠেলে দরিয়া বিবির জীবনসংগ্রাম মূলত নারীর মাতৃত্বের চেতনাজাত অজেয় আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন। শওকত ওসমানের উপন্যাস *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬৩) স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদী চেতনায় ভাস্বর। গ্রামীণ সামাজিক পরিবেশের বিশ্বস্ত রূপকার শওকত ওসমান বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নিরীক্ষায় স্বতন্ত্র এক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তীক্ষ্ম সমাজচেতনা ও জীবন-নিরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা তাঁকে বাংলা কথাসাহিত্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

দেশভাগের অব্যবহিত পরই ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত ক্ষীণকলেবর একটি উপন্যাস হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতোই অতি দ্রুত সাধারণ পাঠক ও শিল্পবোদ্ধাদের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়। এ-উপন্যাসের নাম *লালসালু*, আর লেখকের নাম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১)। 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র কৃতিত্ব একজন সমাজবিজ্ঞানীর কিন্তু ততোধিক বোধহয় একজন বড় শিল্পীর। মিতভাষণ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, শাণিত, ঋজু ও ধনুকের জ্যা-র মতো টানটান বাক্যবন্ধ, অন্তর্লীন আবেগের প্রচণ্ড চাপ, মোহহীন বুদ্ধিদীপ্ত মনোভঙ্গি এবং অনন্যলক্ষ্য দৃঢ় নির্মাণ-সাফল্য – ইত্যাদি বহুবিধ সিদ্ধি অর্জনে 'লালসালু'র লেখক এমন কৃতিত্ব অর্জন করেছেন যে তাঁকে ভাবালু বাঙালী ঔপন্যাসিকের দলভুক্ত করতেই সমস্যা হয়।'[৩] *লালসালু* উপন্যাসের ব্যতিক্রমী রচনাশৈলী, বাস্তবতাকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রচেষ্টা, ভাবালুতার কাছে শিল্পসত্যকে বিসর্জন না দেয়া ইত্যাদি নানা কারণে এটি সমগ্র বাংলা সাহিত্যে একটি মাইলফলক হিসেবে স্বীকৃত। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র কাছে সাহিত্যরচনা ছিল মহান কোনো সাধনার সমতুল্য। এ কারণে প্রখর সমাজচেতনা আর দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নিজের পরিচিত সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি।

[১] শিরীণ আখতার, *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৩, পৃ. ২৭
[২] শান্তনু কায়সার, *শওকত ওসমান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০১৩, পৃ. ৮০
[৩] রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ.২০

বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অবস্থান কিংবদন্তিসম। 'জগৎ ও জীবনকে দেখার ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রতিভার শক্তিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিন্তার এক অপূর্ব অধিশ্রয়ণ ও সংশ্লেষ সাধিত হয়েছে। তাঁর সৃষ্টিতে একই সঙ্গে কল্পনাপ্রিয়তা, বস্তুকে পঞ্চেন্দ্রিয় নৈকট্যে স্থাপনের মাধ্যমে চিত্ররূপময় করে নির্মাণের যে প্রবণতা লক্ষ করা যায় তাঁর সেই অভিপ্রায় ও শিল্পচিত্তের সংবেদনার মূলে রয়েছে এ দেশীয় জীবনবোধ, চিত্রকলার প্রতি নিবদ্ধ তাঁর আবাল্যের অনুরাগ।'[১] বাস্তবের নির্মোহ বয়ান, মানুষের আলো-অন্ধকারে ভরা জটিল অন্তর্জগতের নিপুণ বিশ্লেষণ আর অননুকরণীয় শিল্পভাষা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জগৎ ও জীবনকে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর ছিল ঈর্ষণীয় ক্ষমতা, আর এই ক্ষমতার অসাধারণ সদ্ব্যবহার করেছেন তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে।

সুদীর্ঘকাল প্রবাসে বসবাস করলেও আবহমান বাংলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও তাদের জীবনযাত্রা ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যরচনার প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। গ্রামীণ সমাজে বিদ্যমান নানা অসঙ্গতি, কুসংস্কার, মানুষে-মানুষে বিভেদ-বিরোধের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণে মনোযোগী হয়েছেন তিনি, আর এর মধ্য দিয়েই মানুষের মনের গভীরে বাস করা চিরন্তন সব প্রবণতাকে কৌতূহলী গবেষকের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছেন। 'সমাজকেন্দ্রিক মানবজীবন তার উপলক্ষ, কিন্তু মানবজীবনের অন্তর্বিশ্লেষণ তার লক্ষ্য। সমকালীন সাহিত্য ধারণায় কথাশিল্পে ব্যবহৃত এই কলাকৌশল পাশ্চাত্য সাহিত্যরীতির নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনের ফল, যা বলা যায় ওয়ালীউল্লাহ্‌ মানসে ফল্গুর মত প্রবাহশীল।'[২] সাহিত্যের সংখ্যায় বহুপ্রজ না হলেও বিচিত্র পথের সন্ধানী ছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌। 'ওয়ালীউল্লাহ্‌ কখনোই সমাজ-বাস্তবতা বা সমাজ চেতনার স্থূল রূপকার ছিলেন না। সমাজচেতন হয়েও তাঁর লক্ষ্য সবসময় অন্তর্গত মানুষ। সেজন্যেই তাঁর ঝোঁক ঘটনার চেয়ে ঘটনা-উত্থিত আবর্তগুলোর দিকে।'[৩] মন্বন্তরের ভয়াবহতা থেকে শুরু করে নর-নারীর সম্পর্কের গভীর বিশ্লেষণ – সব ক্ষেত্রেই সূক্ষ্মদর্শী শিল্পীর পারদর্শিতা দেখিয়েছেন লেখক। স্বভাবসুলভ নৈর্ব্যক্তিকতায় বর্ণনা করেছেন মানুষের গভীর-গোপন ভাবনার কথা, রূপক আর প্রতীকের মায়াজালে

[১] জীনাত ইমতিয়াজ আলী, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ: জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম*, প্রথম প্রকাশ, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা ২০১১, পৃ.২৮

[২] আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প: বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৬, পৃ. ১২০

[৩] আবদুল মান্নান সৈয়দ, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌*, মুক্তধারা, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৬৫

আবদ্ধ করে পাঠককে পৌঁছে দিয়েছেন অনুভূতির নতুন নতুন উচ্চতায়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে পরাবাস্তবতা বা সুররিয়ালিজম-এর প্রভাবও লক্ষ করেছেন অনেক সমালোচক। জগৎ ও জীবনকে চরিত্রের অন্তর্গত চৈতন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করায় ব্যক্তির মগ্নচেতনার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে বহির্বাস্তব, যা গল্পের রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে পাঠককে নতুন এক অনুভূতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯২৩-১৯৮৬) বাংলার গ্রামজীবনকে আশ্রয় করেই গড়ে তুলেছেন তাঁর সাহিত্যভুবন। কথাশিল্পী সরদার জয়েনউদ্‌দীনের উপন্যাস ও গল্প লেখকের তীক্ষ্ণ ইতিহাসবোধ ও সমাজবোধের চেতনায় ভাস্বর। *আদিগন্ত* (১৯৫৬) ও *অনেক সূর্যের আশা* (১৯৬৭) সরদার জয়েনউদ্‌দীনের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। *আদিগন্ত* উপন্যাসে নরনারীর ভালবাসা, ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতা, দুর্নীতি ইত্যাদির আলোকে গ্রামীণ বাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে, যদিও এতে জীবনের গভীরতর উপলব্ধি বা মহত্তর অনুভূতি পরিস্ফুট হয়নি বলে অনেকের ধারণা। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা *অনেক সূর্যের আশা*-য় ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ-দুর্ভিক্ষ-মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদিকে তুলে ধরা হয়েছে। মুসলিম মধ্যবিত্তের স্বাতন্ত্র্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধের সংকট রশীদ করিমের (১৯২৫-২০১১) উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। প্রখর এক ইতিহাসচেতনার দ্বারা তাড়িত হন তিনি, কিন্তু একই সঙ্গে সমকালীন সমাজের নানা অসঙ্গতি আর রূঢ় বাস্তবতাকেও তুলে ধরেন গল্পের অবয়বে। রশীদ করিমের সবচেয়ে আলোচিত দুটো উপন্যাস হচ্ছে *উত্তম পুরুষ* (১৯৬১) ও *প্রসন্ন পাষাণ* (১৯৬৩)। মুসলিম মধ্যবিত্তের স্বাতন্ত্র্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধের সংকট তাঁর উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য, যাতে আধুনিকত্বের পদধ্বনি থাকলেও অখণ্ড জীবনচেতনার অভাবে উপন্যাসগুলো সার্বিক সফলতায় উপনীত হতে পারেনি।

স্বল্পসংখ্যক উপন্যাস রচনা করে যিনি বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন তিনি আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)। 'তাঁর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতো উপন্যাস নিয়ে গভীর বিচিত্র অনুসন্ধিৎসু ও নিরীক্ষার পথে অগ্রসর না হয়ে তিনি একেবারে সাদামাঠাভাবে বাংলাদেশের অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম-জীবনের দুঃখী জীবন-চিত্রকে তাঁর উপন্যাসে

তুলে ধরেছেন।'[১] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঝঞ্ঝামুখর পরিবেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কশাঘাতে উন্মুল মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ক্রমবিকাশমান নগর সমাজের আকর্ষণে এসব মানুষের অনেকেই ঠাঁই নেয় শহরে, জীবিকার প্রয়োজনে নানা কাজে যুক্ত হয়। এদের অনেকেই আবার একসময় শহরের নির্মম-নিষ্করুণ জীবনের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে ফিরে যায় গ্রামে। দুর্ভিক্ষের প্রভাবে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা এবং ফের শহর থেকে গ্রামে প্রত্যাবর্তনকারী এমন কিছু মানুষের গল্প নিয়ে আবু ইসহাকের (১৯২৬-২০০৩) উপন্যাস *সূর্যদীঘল বাড়ি* (১৯৫৫)। দুঃখ-দারিদ্র্য আর শোষণের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামরত জয়গুন আর তার স্বজনদের গল্প বলেছেন আবু ইসহাক, আর এর মধ্য দিয়ে শোষক শ্রেণির দাপটে নিরন্ন, অসহায় মানুষ কীভাবে বারবার ভাগ্যবঞ্চনার শিকার হয় তাও উঠে এসেছে। গ্রামের দরিদ্র মানুষের জীবনবাস্তবতার ছবি অঙ্কনে লেখকের অনুকরণীয় নিষ্ঠার প্রমাণ থাকলেও এতে জীবনের গভীরতর ব্যঞ্জনার শিল্পময় প্রকাশ না ঘটায় আর যথাযথ চরিত্র বিশ্লেষণের অভাবে উপন্যাসটির শিল্পসফলতা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভুবনেও পল্লিসমাজ ও জীবনের সুদক্ষ রূপকার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি, মানুষের স্বপ্ন ও সংগ্রাম, আন্তরিকতা ও হৃদয়হীনতা – সবই চিত্রিত করেছেন স্মরণীয় সব গল্পের প্রেক্ষাপটে। 'জোঁক' নিঃসন্দেহে আবু ইসহাকের শিল্পসমৃদ্ধ গল্পগুলোর একটি, যেখানে গ্রাম্য মহাজনদের হাতে প্রান্তিক চাষিদের শোষণ আর বঞ্চনার এক আবহমান চিত্র ফুটে উঠেছে। গ্রাম্য রাজনীতির কূটচালকে কেন্দ্র করে রচিত এক অনবদ্য গল্প 'আবর্ত'। এই গল্পে গ্রাম্য মোড়লের হাতে গ্রামের সাধারণ মানুষের স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা কীভাবে ভূলুণ্ঠিত হয় তারই করুণ চিত্র বর্ণিত হয়েছে। 'উত্তরণ' গল্পে ফুটে উঠেছে সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র, রূঢ় বাস্তবতা যেখানে দরিদ্র মানুষকে বিপথে যেতে বাধ্য করে। এভাবেই নানা গল্পে বাংলার নিঃস্ব মানুষের জীবনসংগ্রামের বহুমাত্রিক বাস্তবতা আবু ইসহাক তুলে ধরেছেন।

বিভাগ-পরবর্তী প্রথম দশকে শামসুদ্দীন আবুল কালামের সমসাময়িকদের মধ্যে আরো যাঁরা কথাসাহিত্য রচনায় ব্রতী ছিলেন তাঁদের মধ্যে আবু রুশদ (১৯১৯-২০১০), আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (১৯৩৪-), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িকদের থেকে একটু ভিন্ন পথে

[১] শিরীণ আখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

হেঁটেছেন আবু রুশদ। গ্রামজীবনকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনার চলমানধারা থেকে মুসলমান মধ্যবিত্তজীবনের নানা সামাজিক অসঙ্গতি তাঁর গল্প-উপন্যাসে প্রাধান্য পেল। 'মুসলিম মধ্যবিত্তের সংস্কারচেতনা ও চিত্তের প্রবঞ্চনা, নাগরিক মধ্যবিত্তের আত্মগ্লানি ও জীবনবোধের দীনতা এবং দেশবিভাগের আবেগ-উচ্ছ্বাস-উদ্বেগে সিক্ত আবু রুশদের গল্পের ভুবন।'[১] *নোঙর* (১৯৬৩), *সামনে নতুন দিন* (১৯৫১), *ডোবা হল দীঘি* (১৯৬০) তাঁর আলোচিত উপন্যাস। আবু রুশদের উপন্যাসগুলোর মধ্যে *নোঙর*-ই শ্রেষ্ঠ। ব্যক্তিজীবনকে জাতীয় জীবনের বৃহৎ পটভূমিকায় স্থাপন করে লেখক উপন্যাসটিকে সাময়িকতার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে হৃদয়াবেগের সর্বজনীন দিগন্তে টেনে নিয়েছেন।[২] *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান* (১৯৬০) আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাস যাতে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-সমাজের সঙ্গে পুঁজিবাদী নগরসমাজের অনিবার্য সংঘাতের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গল্পকার হিসেবে নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনের সংকট ও সম্ভাবনা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর প্রিয় বিষয় হলেও আবহমান বাংলার গ্রামজীবনের অনবদ্য চিত্রও উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। গ্রামের ক্ষুদ্র পেশাজীবী, কৃষকের পাশাপাশি সামন্তসমাজের প্রতিনিধিদের ক্ষয়িষ্ণু জীবনধারার বহিঃপ্রকাশও ঘটেছে তাঁর নানা গল্পে। আলাউদ্দিন আল আজাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* (১৯৬০)। এ উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে মানুষের মনোবিকলন ও মনোবিশ্লেষণ। তাঁর নদীজীবনকেন্দ্রিক শিল্পসফল উপন্যাস *কর্ণফুলী* (১৯৬২)-র বিষয়বস্তু হচ্ছে পাহাড়ি নদী কর্ণফুলীর তীরে বসবাসরত মানুষের অস্থির জীবনপ্রবাহ। বিশাল বিস্তৃত ক্যানভাসে নিজের গল্পভুবনকে সাজিয়েছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলো শ্রেণিচেতনায় ভাস্বর হলেও পরবর্তীকালে ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তিনি। আমৃত্যু জীবনসংগ্রামী প্রান্তিক মানুষদের জীবনের নানা টানাপড়েন দারুণ দক্ষতায় স্থাপন করেছেন তিনি। পটভূমিতে সমাজের নানা অসঙ্গতি, মানুষের স্বার্থপরতা, নীচতা – এসবকেও স্মরণীয় সব চরিত্রের মাধ্যমে পাঠকের গোচরে এনেছেন।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সফল কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-১৯৭১) ও জহির রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২)-এর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। *সারেং বৌ* (১৯৬২) শহীদুল্লা কায়সারের এক অনন্য সাহিত্যকীর্তি যাতে বঙ্গের সমুদ্র-উপকূলবর্তী মানুষের সংগ্রামমুখর বিপর্যস্ত জীবনের চিত্র কদম সারেং আর

[১] বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০২, পৃ. ১৭৪

[২] মনসুর মুসা, *পূর্ব বাংলার উপন্যাস*, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা ২০০৮, পৃ. ৬১

তার স্ত্রী নবিতুনের জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে ভাষারূপ পেয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস *সংশপ্তক* (১৯৬৫)-এ ঔপন্যাসিকের সাহিত্যিক আয়োজন ব্যাপকতর এবং উদ্দেশ্য মহত্তর হলেও জীবনসত্যের তুলনায় তত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টার কারণে উপন্যাসটির শিল্পসফলতা কিছুটা ক্ষুণ্ন হলেও এটি বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় এক অসামান্য কৃতিত্বের দাবিদার। 'এটি চিরায়তনিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত গদ্য মহাকাব্য। এর বিষয়বস্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক মুক্তির মূলমন্ত্র।'[১] শহীদুল্লা কায়সারের অনুজ জহির রায়হান-এর কথাসাহিত্য জীবনবোধ ও শিল্পরীতিতে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। সমকালীন জীবনের নানা অসঙ্গতি ও অন্তঃসারশূন্যতা উঠে এসেছে তাঁর কথাসাহিত্যে। তাঁর গ্রামজীবনভিত্তিক উপন্যাস *হাজার বছর ধরে* (১৯৬৪)। 'সামন্তসমাজের অন্তঃঅসঙ্গতি, শ্রমনির্ভর শোষণমূলক জীবনব্যবস্থায় নারীর বিপন্ন অস্তিত্ব এবং মানবতার চরম পরাভব ও রোম্যান্টিক সম্ভাবনার চিত্ররূপ হিসেবে এ উপন্যাস অনবদ্য।'[২]

বাংলাদেশের বিভাগোত্তর পর্যায়ের উপন্যাসের ঘটনাংশ প্রধানত গ্রামজীবনকেন্দ্রিক। এদেশে নগরায়ণ তখনও সেভাবে গতিলাভ করেনি। ফলে সাহিত্যিকদের অধিকাংশই শহরাঞ্চলে বাস করলেও কৈশোর ও তারুণ্যের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত গ্রামজীবনই তাঁদের সাহিত্যের মূল উপজীব্য হয়েছে। বিভাগপূর্বকালে নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের 'আনোয়ারা' (১৯১৪), কাজী আবদুল ওদুদের 'নদীবক্ষে' (১৯৫১) উপন্যাসের বিষয়-প্রকরণ ও পরিণামী রসনিষ্পত্তিতে গ্রামীণ জীবনের ভূমিকা ছিল একচ্ছত্র। বিভাগোত্তরকালের ঔপন্যাসিকরা চেতনায়-অবচেতনায় সে ধারারই অনুবর্তন করেছেন। তবে জীবনদৃষ্টির ভিন্নতা এবং অভিজ্ঞতার তারতম্যের কারণে পল্লিজীবনকে সাহিত্যের আয়নায় প্রতিবিম্বিত করার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্নজন বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গি বেছে নিয়েছেন। 'কেউ বাস্তবতার নিরাবেগ অবিকল উপস্থাপনা করেছেন, আবার কেউ অনুপুঙ্খ উপস্থাপনা করা সত্ত্বেও বাস্তবতাকে দেখেছেন রোমান্টিক দৃষ্টিতে ...।'[৩] গ্রামের মাটি ও মানুষের সঙ্গে গভীর ও ব্যাপক সম্পর্ক না থাকলে গ্রামীণজীবনকে নিখুঁতভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা কঠিন। 'শহরবাসী সাহিত্যকর্মীদের পক্ষে গ্রাম-জীবনের অন্তর্নিহিত চেহারা ও চরিত্রে অভিজ্ঞতার অভাব অস্বাভাবিক ঘটনা রূপেই প্রতিফলিত। যোগসূত্রের এই অভাবের ফলে অন্তঃশীলা গ্রামীণ জীবন-চিত্র গভীর

[১] রণেশ দাশগুপ্ত, *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, ঢাকা ১৯৭৩, পৃ. ২০৫

[২] রফিকউল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

[৩] আকিমুন রহমান, *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ* (১৯২০-৫০), প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২০৪

অন্তরঙ্গতায় কিংবা বিশ্লেষী আলোর বর্ণচ্ছটায় শিল্পীর চেতনায় প্রতিফলিত হয় না।'[১] এ কারণে বাংলা সাহিত্যে গ্রামীণজীবননির্ভর বিশ্বাসযোগ্য ও কালোত্তীর্ণ সাহিত্যকর্ম সেসব সাহিত্যিকের পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয়েছে, গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক ছিল ব্যাপক ও গভীর।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের (১৯২৬-১৯৯৭) অবস্থান স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। মূলত রোমান্টিক উপন্যাস *কাশবনের কন্যা'র* সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি নিবিড় হলেও *পথ জানা নাই*- এর মতো বাস্তবঘনিষ্ঠ গল্প রচনা করেও তিনি তাঁর দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন নিঃসন্দেহে। উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটগল্প রচনায়ও তিনি উৎকীর্ণ করেছেন তাঁর শৈল্পিক নৈপুণ্য। গ্রামীণ জনজীবন, বিশেষত দক্ষিণ বাংলার সমুদ্র-উপকূলবর্তী মানুষের সংগ্রামশীল জীবনবাস্তবতা প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে। গ্রামীণ জনজীবনের বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-দাহ, হতাশা-বেদনা, নৈরাশ্য-যন্ত্রণার রূপচিত্রাঙ্কনে তাঁর পারদর্শিতা বিস্ময়কর। গ্রামীণ ভূস্বামী, সাধারণ মধ্যবিত্ত, পরিশ্রমজীবী নিম্নবিত্ত, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার রূপায়ণে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা তুলনাবিরল।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর অনন্য জীবনবীক্ষার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের সাহিত্য-ভুবন। যে অঞ্চলে তাঁর জন্ম, যেখানকার আলো-জল-বাতাসের সঙ্গে তাঁর হার্দিক পরিচয়, সেখানকার মাটি আর মানুষের গল্প বলাই ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। স্বদেশের মাটি ও মানুষকে সাহিত্যের আয়নায় প্রতিফলিত করার বিষয়ে বাঙালি সাহিত্যিকদের কারো কারো বিমুখতা তাঁকে পীড়িত করেছে। এই মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ১৯৭৩ সালে রোম থেকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে, 'বাংলাদেশের সবাই সবসময়ই যেন পশ্চিমমুখী। স্বীয় দেশজ জীবন এবং সাংস্কৃতিক সম্পদকে বারে বারে অবহেলার ব্যাধি যেন আমাদের গুরুতরভাবে পেয়ে বসেছে।'[২] নিজের সাহিত্যরচনার প্রেরণার কথা বলতে গিয়ে সেই একই চিঠিরই আরেক অংশে তিনি বলেছেন, 'সামগ্রিকভাবে নিজেদের সংস্কৃতি সনাক্তীকরণের কাজ এখনো বহুদূর।

[১] আহমেদ রফিক, 'মানিক-উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনচিত্র', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ভুঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত, পৃ. ৫৪

[২] আবুল আহসান চৌধুরী, শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের একটি চিঠি, *শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ*, পৃ. ১২৪, সম্পাদক, সেলিনা বাহার জামান, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃ. ১২৪

আমার উপন্যাসগুলিতে গাঙ্গেয় সভ্যতার আবহে যেমন জীবনচিন্তা গোটা মানুষের জীবনচিন্তার অঙ্গস্বরূপ গড়ে উঠেছে, তার সঙ্গে সনাক্তীকরণ-এর সংগ্রামই মূল উপজীব্য।[১]

সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে বরাবরই দক্ষিণ বাংলার সমুদ্রবিধৌত জনপদে বসবাসরত প্রান্তিক মানুষদের জীবন ও জীবনসংগ্রামের আলেখ্য রচনার প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। এক ধরনের রোমান্টিক আবেগ থেকে তিনি এসব মানুষের সংগ্রামমুখর জীবনের গল্প বলেছেন বিস্তৃত ক্যানভাসে। কখনও শোষকের, আবার কখনও বিরূপ প্রকৃতির রুদ্ররোষের শিকার হয় এসব মানুষ, কিন্তু ঝড় শেষে আবারও তারা মাথা তুলে দাঁড়ায় প্রবল স্পর্ধায়। মানুষ তার আশার সমান বড়ো – নানা ঢঙে, নানা কাহিনির মাধ্যমে এটিই বারবার উচ্চারণ করেছেন তিনি। 'জীবনপলায়নবাদিতা'-র অভিযোগকে ললাটলিখন ধরে নিয়েই তিনি রচনা করে গেছেন গাঙ্গেয় অববাহিকার নিয়তিনির্ভর অন্ত্যজ মানুষের সংগ্রামগাথা। তাঁর জীবনে যেমন, তেমনি লেখনভঙ্গিতেও ছিল এক ধরনের অকৃত্রিম সরলতা। তাঁর উপন্যাসগুলোর চরিত্রচিত্রণ ও সংলাপেও এই সরলতা বারবার ফুটে উঠেছে। কৃষিপ্রধান গ্রামবাংলার লোকজ-ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। নানাভাবে নানা বিন্যাসে তাঁর উপন্যাসগুলোর ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে এই ঐতিহ্যপ্রীতি। কখনো ছড়াগানে, কখনো গ্রামীণ শ্লোকে, কখনো চাষি বা মাঝির গানে দেশজ সংস্কৃতির নানা উপাদান মণিমুক্তোর মতো তুলে এনেছেন তিনি। তার শিল্পিসত্তা সম্পর্কে সমালোচকের ভাষ্য –

> এক. দক্ষিণ বাংলার কাশবনের দেশের মানুষ আর প্রকৃতির প্রতি লেখকের নিশ্ছিদ্র আনুগত্য, উপন্যাসের মধ্যে ব্যবহৃত লোকসংগীত, আঞ্চলিক পরিবেশ ও উপভাষার প্রতি আনুগত্য, উপন্যাসের প্রতি পর্বের সূচনায় উদ্ধৃত লোকসংগীত– এসব কিছুই লোকজীবনের প্রতি লেখকের রোম্যান্টিক আনুগত্যের পরিচায়ক।[২]
>
> দুই. চল্লিশ থেকে আশির দশক অতিক্রমকামী সময় পর্যন্ত শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের যে গ্রন্থসমূহ প্রকাশ পেয়েছে, তার প্রায় সব ক'টিতেই তাঁর জীবনদৃষ্টি ও কথকতার শৈলির ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার ছাপ সুস্পষ্ট।

[১] প্রাগুক্ত।

[২] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা*, দেজ পাবলিশিং, কোলকাতা, পৃ. ৩৯২

পাশাপাশি এই সত্যটিও স্পষ্ট যে, গ্রাম ও শহরের অভিঘাত সম্পর্কিত যে বোধ ও বিশ্বাসকে তিনি বুকে তুলে নিয়েছিলেন প্রথম যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেও তা থেকে তিনি দূরে সরে যাননি।[১]

বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশক আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ব্রিটিশ শাসনের অবসান, দেশভাগ, ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সৃষ্টি এবং পাকিস্তানি শাসনামলে বাঙালির ক্রমবর্ধমান বঞ্চনার অনুভব থেকে বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ এবং পরিশেষে স্বাধীনতার আন্দোলন – এসব বহুমুখী ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের মানুষের আর্থ-সামজিক-রাজনৈতিক জীবনে নানা পরিবর্তনের সূচনা ঘটেছিল। সামাজিক পশ্চাৎপদতা, নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার, সামন্ত-শোষণ ইত্যাদি কারণে সাধারণ মানুষের উন্নতি-অগ্রগতির পথ ছিল অনেকটাই রুদ্ধ। তবে 'চৈতন্যের প্রগতি এবং রাষ্ট্রীয় বিন্যাসের অধোগতির দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সংবেদনশীল শিল্পীকে হতে হলো এক রক্তাক্ত জিজ্ঞাসার সম্মুখীন। নগরায়ণ ও শিল্পায়নের বিলম্বিত, মন্থর বিকাশে বৃহত্তর গ্রামীণ জীবনই হলো তাঁদের মুখ্য উপকরণ উৎস। যে-গ্রাম যুদ্ধ, দাঙ্গা, মহামারি, সামন্তশোষণ, ধর্মশোষণ, স্বাধিকারহীন 'স্বাধীনতা'র নির্মম অভিজ্ঞতায় ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে প্রতিনিয়ত অস্তিত্বের অগ্নিবলয়ের মুখোমুখি, এ-পর্যায়ের ঔপন্যাসিকরা সেই গ্রামীণ জীবন-সংঘাত ও অস্তিত্বের অভীপ্সাকে উপন্যাসের মুখ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করলেন।'[২] বাংলাদেশে এ সময়ে রচিত গল্প-উপন্যাসে – যার বেশির ভাগই গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত – গ্রামাঞ্চলের এই স্থবিরতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাসও এর বাইরে নয়। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত *কাশবনের কন্যা*-য় যেমন, তেমনি ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত *সমুদ্রবাসর*-এও দক্ষিণ বাংলার সংগ্রামমুখর প্রান্তিক মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার খুব বেশি নড়চড় হয়নি; পরিবর্তিত হয়নি শোষকের চেহারা, শ্রেণি-অবস্থান, এমনকি শোষণের পন্থাও। যে অঙ্গীকারকে পাথেয় করে প্রথম জীবনে কলম হাতে তুলে নিয়েছিলেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, সেই একই অঙ্গীকারে দশকের পর দশক ধরে লিখে গেছেন অন্ত্যজ মানুষের স্বপ্নগাথা। 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের সামগ্রিক সাহিত্য-জীবন পর্যবেক্ষণ করে এরূপ ধারণা হয় যে তাঁর কথাশিল্পে যেসব মানুষের আনাগোনা, তারা সবাই প্রায় গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের নদী ও সমুদ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত বিচিত্র চরিত্রের

[১] সরদার আবদুস সাত্তার, শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের চলে যাওয়া এবং রেখে যাওয়া, *শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২
[২] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ (১৯৪৭-১৯৮৭)*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৭, পৃ. ৫৬

লোকসমাজ।'[১] বস্তুত, নদী ও সমুদ্রবিধৌত দক্ষিণবঙ্গের মানুষের জীবনসংগ্রামের কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে সমাজসচেতন কথাশিল্পী হিসেবে নিজের অঙ্গীকারের প্রতিই বিশ্বস্ত থেকেছেন তিনি। এদিক থেকে কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গে সাদৃশ্য টানা যায় তাঁর। দুজনেই জীবনের একটি বড় অংশ প্রবাসে অবস্থান করেছেন এবং মৃত্যুবরণও করেছেন প্রবাসে কিন্তু জীবনভর সাহিত্যসাধনায় বাংলাদেশের অবহেলিত গ্রামাঞ্চলকেই পটভূমি করেছেন তাঁরা। সংখ্যায় গরিষ্ঠ, কিন্তু সমস্ত সূচকে পিছিয়ে পড়া অন্ত্যজ মানুষদের প্রতি এটি তাঁদের সচেতন শিল্প-অঙ্গীকারেরই স্মারক। 'একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রকৃতি-পরিবেশে ও জীবনবৃত্তকেই তিনি বারংবার মমতাময় হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই চেষ্টার মধ্যে যেমন আছে বৈচিত্র্য, তেমনি আছে পাঠকের হৃদয়ে বিস্ময় ও বিমুগ্ধতা ছড়ানোর মত শিল্পনৈপুণ্য।'[২]

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা পনেরোটি। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা দু'টি। অপ্রকাশিত উপন্যাস নয়টি। আরো কিছু উপন্যাসের কথা জানা গেলেও সেগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত উপন্যাসগুলো হলো : ১. রাতের অতিথি (১৯৪১) ২. দুঃখমোচন (১৯৪৫) ৩. কাকলি মুখর (১৯৪৮) ৪. আলমনগরের উপকথা (১৯৫৪) ৫. কাশবনের কন্যা (১৯৫৪) ৬. আশিয়ানা (১৯৫৫) ৭. কাঞ্চনমালা (১৯৬১) ৮. সবাই যাকে করলো হেলা (১৯৬১) ৯. জায়জঙ্গল (১৯৭৮) ১০. মনের মতো ঠাঁই (১৯৮৫) ১১. সমুদ্রবাসর (১৯৮৬) ১২. যার সাথে যার (১৯৮৬) ১৩. নবান্ন (১৯৮৭) ১৪. কাঞ্চনগ্রাম (১৯৯৮) ১৫. ঈষদাভাস (২০১৭)। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত উপন্যাস– কূল-উপকূল (ঈদসংখ্যা 'অন্যদিন' ২০০৫) ও বয়ঃসন্ধিকাল (ঈদসংখ্যা, 'প্রথম আলো' ২০০৬)।

অপ্রকাশিত উপন্যাসগুলো হলোঃ ১. সোনারগাঁও ২. দু মুড়ি সময় ৩. কল্যাণীয়াসু ৪. সিরতাকী ৫. ক্ষীরসাগর ৬. পাল তোলা নাও ৭. ঢেউভরা নদী ৮. সাগর ঠিকানা ৯. দি গার্ডেন অব কেইন ফ্লুটস।[৩]

---

[১] আজহার ইসলাম, *শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

[২] সরদার আবদুস সাত্তার, 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের চলে যাওয়া এবং রেখে যাওয়া', *শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

[৩] আহমাদ মাযহার, শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম: গ্রন্থ ও জীবনপঞ্জি, *উষালোকে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের প্রকাশিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে *রাতের অতিথি*, *দুঃখমোচন*, *কাকলি মুখর*, *সবাই যাকে করলো হেলা* কিশোর উপন্যাস। *মনের মতো ঠাঁই* উপন্যাসের পটভূমি ইতালির ভেনিস শহর। অবশিষ্ট উপন্যাসগুলোতে দক্ষিণ বাংলার সমুদ্র-উপকূলবর্তী মৃত্তিকা-আশ্রয়ী প্রান্তিক মানুষদের জীবন ও জীবনসংগ্রাম রূপায়ণের মাধ্যমে গ্রামীণজীবনের নানা অনুষঙ্গ তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন তিনি। বর্তমান অভিসন্দর্ভের মূল আলোচ্য বিষয় যেহেতু গ্রামীণ জীবন তাই লেখকের সমগ্র উপন্যাস সাহিত্য নয়, বরং তাঁর গ্রামীণ পটভূমিনির্ভর উপন্যাসগুলোই এখানে বিবেচ্য।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের *আলমনগরের উপকথা*[১] উপন্যাসে ক্ষীরসায়র বা আলমনগর গ্রামের অধিবাসীদের জীবনপ্রণালী ও সমাজকাঠামোর বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এ উপন্যাসের কাহিনি ও ঘটনাংশ বর্ণনায় লেখক ইতিহাস, সময় ও সমাজকে অবলম্বন করেছেন। একজন সমাজ-সচেতন পর্যবেক্ষকের গভীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি আলমগনগরের জীবনযাত্রা ও সমাজকাঠামোর ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস উন্মোচন করেছেন। উপন্যাস-কাহিনিকে 'একই সঙ্গে উপকথা এবং ইতিহাস' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ঔপন্যাসিক। 'লোকজীবনে প্রচলিত কাহিনি, কিংবদন্তি ও ইতিহাসবোধের সমন্বয়ে পরিকল্পিত হয়েছে উপন্যাসের ঘটনাংশ। আলমগনগর আসলে বাংলাদেশেরই প্রতিরূপ। ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও জনগোষ্ঠীর জীবনবিন্যাস এবং অস্তিত্বসাধনার রূপ-স্বরূপে বাঙালি মুসলমানের বিবর্তনশীল সমাজ প্রবাহের রূপায়ণই ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট।'[২] সমালোচকের ভাষায়, 'যুগপরম্পরায় প্রসারিত আলমনগরের উপকথা এবং ইতিহাসের ঘটেছে পরস্পর অন্তর্বয়ন মিলন। এ উপন্যাস লেখকের ইতিহাসজ্ঞান, সময় ও সমাজ অভিজ্ঞতার স্বাক্ষরবাহী। অবক্ষয়িত সামন্ত-পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং প্রাচীন সমাজ কাঠামো ভাঙনের রূপচিত্রের মধ্য দিয়ে এখানে উৎসারিত হয়েছে নতুন সমাজ নির্মাণের অভিলাষ।'[৩]

[১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, *আলমনগরের উপকথা*, কোহিনূর লাইব্রেরি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৩৬২। বর্তমান গ্রন্থে *আলমনগরের উপকথা-র* পাঠ এ-সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

[২] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ'*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ. ৬৭

[৩] বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৯, পৃ. ১১৩

কাশবনের কন্যা[১] উপন্যাসের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম সাহিত্যামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম। 'উপলব্ধির সততা ও মৃত্তিকামূলস্পর্শী জীবনচেতনায় *কাশবনের কন্যা* বিভাগোত্তরকালের বিশিষ্ট রচনা। সমাজজীবনের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর শিল্পিমানস জীবনের মৌল উৎসের কাছেই প্রত্যাবর্তন করেছে। দক্ষিণ বাংলার নদীতীরবর্তী মানুষের যে সংগ্রামশীল ও গতিময় জীবনের অন্তর-বাহির তাঁর অন্বিষ্ট, আত্মমগ্ন ও র‍্যোমান্টিক অনুভববিলাসের ফলে তা পরিণত হয়েছে বহির্বাস্তবতাবিচ্যুত অন্তরাবেগ ও আত্মরক্তক্ষরণের শব্দরূপে।'[২] এ উপন্যাসে লেখক হোসেন ও শিকদারের জীবনালেখ্য বর্ণনার মাধ্যমে এ অঞ্চলের নদী ও সমুদ্রনির্ভর নিম্নবিত্ত মানুষের স্বপ্ন ও সংগ্রাম, প্রাপ্তি ও হতাশা, দ্রোহ ও পলায়নবাদিতাকে ভাবময় দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। 'প্রধানত গীতময় ও আবেগময় অনুষঙ্গে তিনি বৃহত্তর বরিশাল জেলার দক্ষিণাঞ্চলের নদী ও সমুদ্রনির্ভর মানুষের সংগ্রাম-সংক্ষোভ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা-বিপর্যয়, হতাশা-অচরিতার্থতাকেই শব্দরূপ দিয়েছেন এ উপন্যাসে। প্রবহমান নদী-প্রকৃতির সঙ্গে চলমান মানবজীবনপ্রবাহকে একীকরণ করে পরিবেশনসূত্রে এ উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে বাংলা উপন্যাসধারায় বিশিষ্ট।'[৩]

কাঞ্চনমালা[৪] উপন্যাসের উপজীব্য বেদে সম্প্রদায়। বেদেদের বিচিত্র জীবনপ্রণালী, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অচরিতার্থতাজনিত হতাশা ইত্যাদি নানা বিষয় ফুটে উঠেছে এতে। উপন্যাসটি বেদে সম্প্রদায়ের জীবনকাহিনি অবলম্বনে রচিত হলেও কাঞ্চন-মালার প্রণয়কাহিনিই উপন্যাসের মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটি সম্বন্ধে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের উক্তি স্মর্তব্য, 'সমগ্র উপন্যাসের পটভূমি ও বক্তব্য পূর্বাপর পূর্ববাংলার বিখ্যাত লোকগীতিকা 'মহুয়া'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।'[৫] কাঞ্চন ও বেদেকন্যা মালার প্রণয়কাহিনিই এ উপন্যাসের মৌল প্রতিপাদ্য হলেও এই সূত্রে বাংলার লোকজীবনের নানা অনুষঙ্গও এ উপন্যাসে ফুটে উঠেছে।

---

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাশবনের কন্যা*, প্রথম প্রকাশ, পরিমার্জিত জয়ন্তী সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪। বর্তমান গ্রন্থে *কাশবনের কন্যার* পাঠ এ-সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

[২] রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ (১৯৪৭-১৯৮৭)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

[৩] গিয়াস শামীম, *বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস (২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, জুন ২০১৫, পৃ. ১৯৩-১৯৪

[৪] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাঞ্চনমালা*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ওসমানিয়া বুক ডিপো ১৬-১৮, বাবুবাজার, ঢাকা, ভাদ্র, ১৩৭২ সাল। বর্তমান গ্রন্থে *কাঞ্চনমালার* পাঠ এ-সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

[৫] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *'পূর্ব পাকিস্তানী কথাসাহিত্য'*, *আধুনিক বাংলা সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৫, পৃ. ১৩৬

জায়জঙ্গল[১] উপন্যাসটি বাংলাদেশের বৃহত্তম অরণ্যাঞ্চল সুন্দরবনের জনবিরল, শ্বাপদ-সংকুল জঙ্গলভূমিকে পটভূমি করে রচিত। লেখক এ উপন্যাসে সাগর মোহনায় গড়ে ওঠা জঙ্গলভূমির জীবন ও প্রকৃতির বাস্তবঘনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরেছেন চমৎকারভাবে। *নবান্ন*[২] উপন্যাসটি রূপারঝোর নামক জনপদকে কেন্দ্র করে রচিত। এটি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা তথা বরিশাল অঞ্চলের একটি জনপদ। উদ্ভব থেকে শুরু করে স্বাধীনতা-উত্তরকাল পর্যন্ত সময়-পরিসরে প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কারণে এ অঞ্চলের নানা পরিবর্তনের ইতিহাস লেখক অত্যন্ত সুচারুভাবে তুলে ধরেছেন এ উপন্যাসে। বিশেষত বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের সমাজবাস্তবতাই এ উপন্যাসের উপজীব্য। *যার সাথে যার*[৩] উপন্যাসে গ্রামীণ পটভূমিকায় মানবজীবনের জীবন-সংগ্রাম, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির জীবনঘনিষ্ঠ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এতে গ্রামের সাধারণ মানুষদের উপর শোষকশ্রেণির অত্যাচার, নির্যাতন, বঞ্চনা এবং অবশেষে নির্যাতিত মানুষের প্রবল প্রতিবাদের প্রেক্ষাপটে পরাজয় বরণের চিত্র বিধৃত হয়েছে।

কাঞ্চনগ্রাম[৪] উপন্যাসের পটভূমি কাঞ্চনগ্রাম নামের এক গ্রামীণ জনপদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বমুহূর্তে কাঞ্চনগ্রাম নামে এই জনপদে বসবাসকারী নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনচিত্র অবলম্বনে উপন্যাসটির কাহিনিবিন্যাস করেছেন লেখক। একই সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্রদের জীবনসংগ্রাম বা জীবনচিন্তাকে সুদূর অতীতে টেনে নিয়ে গেছেন লেখক, ফিরে গেছেন শত-সহস্র বছর আগের বাংলায়। কাহিনির প্রয়োজনে, বিভিন্ন চরিত্রের স্মৃতিচারণ বা জীবনজিজ্ঞাসার সূত্রে পাঠককে তাই বারবার ফিরে যেতে হয় অদূর বা সুদূর অতীতে, ইতিহাসের বিস্মৃত সব পর্বে। কাঞ্চনগ্রাম মূলত বাংলাদেশের আবহমান গ্রামবাংলার প্রতিনিধিত্বকারী একটি জনপদ। 'কাঞ্চনগ্রাম নামে একটি গ্রামকে পটভূমি করে এ উপন্যাসের প্লট পরিকল্পিত হলেও ওই নামের মধ্যে একটি দেশকে, দেশের সৃষ্টি ও তার উত্থানকে, তার আত্মপরিচয়ের

---

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *জায়জঙ্গল*, প্রথম প্রকাশ, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৭। বর্তমান গ্রন্থে *জায়জঙ্গল*-এর পাঠ এ-সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম , *নবান্ন*, প্রথম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৮৭। বর্তমান গ্রন্থে *নবান্ন*-এর পাঠ এ-সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

[৩] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *যার সাথে যার*, প্রথম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৬। বর্তমান গ্রন্থে যার সাথে যার-এর পাঠ এ-সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

[৪] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাঞ্চনগ্রাম*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, সাহিত্যপ্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০০। বর্তমান গ্রন্থে *কাঞ্চনগ্রাম*-এর পাঠ এ-সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

ইতিহাস ও সূত্রকে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস লেখকের দিক থেকে ঘটেছে।'[১] ফলে গ্রামবাংলার চিরায়ত বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন স্থান পেয়েছে এখানে, তেমনি যে ইতিহাসের বর্ণনা এতে স্থান পেয়েছে তা শুধু এ গ্রাম বা দেশের নয়, তা সমগ্র মানবজাতির। বিশালায়তন উপন্যাস 'কাঞ্চনগ্রাম'-কে ঔপন্যাসিক শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের সাহিত্যিক জীবনের মহত্তম সৃষ্টি বা 'ম্যাগনাম ওপাস' বলা যায়। দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর (১৯৭২-১৯৮৭) ধরে রচিত এই উপন্যাসটি তাঁর নিজের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠজন আব্দুল মতিনের ভাষ্যমতে, '১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় অবস্থানকালে এবং সেপ্টেম্বর মাসে রোমে ফিরে যাওয়ার পর শামসুদ্‌দীন সাহেব "কাঞ্চনগ্রাম"-এর খসড়া পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। ১৯৮৬ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে রোম ও মিলান শহরের সান রাফায়েল হাসপাতালে উপন্যাসটি পুনর্লিখনে মনোনিবেশ করেন এবং ১৯৮৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে ঢাকায় অবস্থানকালে লেখার কাজ শেষ করেন।'[২] উপন্যাসটি রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখক বলেন, 'অনেকদিন ধরেই আমার জন্মভূমির মানুষের জীবন-সংগ্রামের ছোট-বড় কিছু কাহিনী বর্ণনার চেষ্টা করেছি; ক্রমে ক্রমে মনে একটা গভীর প্রেরণা অনুভব করেছিলাম যে, একটা ব্যাপক জীবন-চেতনা ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তাকে উপস্থাপন হয়ত আরো সার্থক ও কার্যকরী হবে।'[৩]

কবিসুলভ রোমাণ্টিকতায় গ্রামজীবনের আন্তরিক জীবনগাথা রচনা করে বাংলা উপন্যাসের শতাব্দীপ্রাচীন ধারায় শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম নিজস্ব একটি তরঙ্গ সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন। বিশাল ক্যানভাসে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্রবিধৌত জনপদের ছবি এঁকেছেন তিনি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে গ্রামবাংলার জীবনকে তিনি যেভাবে দেখেছেন সেভাবেই উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ কাঞ্চনগ্রাম উপন্যাসের কথা বলা যায়। এপিকধর্মী এই উপন্যাসে তিনি বাংলার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় স্থাপন করেছেন স্বাধীনতাযুদ্ধে রক্তাক্ত এক জনপদ আর তার মানুষদের। দেখিয়েছেন, কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম বস্তুত সহস্রাব্দ-প্রাচীন এক সুমহান সংগ্রামেরই যৌক্তিক পরিণতি। এছাড়া প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই শোষকের রক্তচক্ষুর বিপরীতে প্রান্তিক মানুষের সঙ্ঘশক্তির জয়কে চিত্রিত

[১] সৈয়দ আজিজুল হক, *বাংলা কথাসাহিত্যে মানবভাবনা*, প্রথম প্রকাশ, কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৪৬
[২] আবদুল মতিন, *শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম ও তাঁর পত্রাবলী*, প্রথম সংস্করণ, র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশান্স, লন্ডন, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৯৮, পৃ.৩০
[৩] প্রাগুক্ত

করেছেন তিনি। এতে এক ধরনের পুনরাবৃত্তিময়তার সৃষ্টি হলেও মানবিকতা আর ইতিবাচক বোধের পুনঃপুনঃ বিজয়বার্তা ঘোষণা করার মাধ্যমে শেষ অবধি শুভবোধ আর মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনারই শিল্পিত প্রকাশ ঘটিয়েছেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম।

ঔপন্যাসিক শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের মতোই গল্পকার শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের সাহিত্যসিদ্ধি অনেকাংশেই নির্ভরশীল উপকূলীয় অঞ্চলের অন্ত্যজ মানুষের জীবনসংগ্রামের সনিষ্ঠ কথাকার হিসেবে। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থগুলো হলো: *শাহেরবানু (১৯৪৫), পথ জানা নেই (১৯৫৩), ঢেউ (১৯৫৩), দুই হৃদয়ের তীর (১৯৫৫), অনেক দিনের আশা (১৯৫৬), জীবন-কাব্য (১৯৫৬) ও পুঁই ডালিমের কাব্য (১৯৮৭), মজা গাঙের গান (১৯৮৭)*। এসব গ্রন্থে বিধৃত গল্পগুলোতে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংগ্রামমুখর জীবনের বাস্তবানুগ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এক ধরনের রোমান্টিক স্বপ্নময়তার আবেশে গ্রাম ও গ্রামের মানুষদের জীবনের নানা অনুষঙ্গকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক, তাঁর গল্পের ক্যানভাসে স্থাপন করেছেন নানা শ্রেণি ও পেশার মানুষের স্বপ্ন ও সংকট, সংগ্রাম ও সম্ভাবনাকে।

ছোটগল্পকার শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের শিল্পিসত্তার বৈশিষ্ট্য দক্ষিণ বাংলার লোকজীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং মানুষের শুভবোধের ওপর প্রগাঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে আস্থাশীল হয়ে নদী আর সমুদ্রবিধৌত দক্ষিণবঙ্গের, বিশেষত বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের খণ্ড-খণ্ড চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে। চরিত্র আর আখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতাকে সর্বত্র অক্ষুণ্ন রাখতে না পারলেও প্রবল আন্তরিকতার জোরে, তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন লোকজীবনের স্বপ্ন ও সংগ্রামের গল্প-গাথা। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের গল্পভুবনে রোমান্টিক স্বপ্নময়তা ও রূঢ় বাস্তবতা সবসময় হাত ধরাধরি করে চলে, দীর্ঘদিন স্বদেশ থেকে দূরে থেকেও তিনি তাঁর অন্তস্তলে ধারণ করে গেছেন সুদূর গ্রামের মেঠোপথের হাতছানি। গ্রামবাংলার জনজীবন তাঁর গল্পে সমস্ত বৈচিত্র্য নিয়ে উঠে এসেছে এক রোমান্টিক স্বপ্নাবেশের আবরণে। "'রিয়েলিটি' ও 'রোম্যান্স'-এর এক চমৎকার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় তাঁর সাহিত্যে। আর এ কারণেই এক চিরতরুণ মনের অধিকারী কথাকার হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে। মূলত শামসুদ্‌দীন আবুল

কালামের স্বাতন্ত্র্য ও অনন্যতা এখানেই যে, জীবনের গীতল ও স্নিগ্ধ রূপের সঙ্গে তিনি অনবদ্যভাবে সংশ্লেষ ঘটিয়েছেন তাঁর রিক্ত ও রুদ্র রূপের, প্রকৃতিকেও নিবিড়ভাবে অন্বিত করেছেন তার সঙ্গে।"[১]

পল্লিবাংলার জনজীবনের দক্ষ রূপকার শামসুদ্দীন আবুল কালাম। তাঁর কলমে মূর্ত হয়ে উঠেছে চিরন্তন বাংলার চালচিত্র। কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী, নৌকার মাঝি-মাল্লা, বেদে ইত্যাদি নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ চিত্র পাওয়া যায় তাঁর নানা গল্পে, যা আমাদের সামনে গ্রামবাংলার শাশ্বত সুন্দর রূপকে ফুটিয়ে তোলে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবনের এক অসাধারণ যোগসূত্র নির্মাণ করেন তিনি, দুর্যোগ-দুর্বিপাক, সুসময়-দুঃসময়ে মানুষ কীভাবে প্রকৃতি ও মানবসৃষ্ট প্রতিকূলতা অতিক্রম করে এগিয়ে চলে সময়ের নিয়মে, তা-ই তিনি তুলে ধরেছেন নানা গল্পে। কায়েমি স্বার্থবাদিতার নিষ্পেষণে কীভাবে সাধারণ মানুষের স্বপ্নগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে তার অসাধারণ নিদর্শন তিনি উপস্থাপন করেছেন নানা গল্পে। শামসুদ্দীন আবুল কালামের অধিকাংশ গল্পের পটভূমি গ্রামীণ জীবন।

তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *শাহেরবানু।*[২] এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত গল্পের সংখ্যা দশটি। গল্পগুলো হলো – শাহেরবানু, ইতিকথা, জাহাজঘাটের কুলি, কেরায়া নায়ের মাঝি, পৌষ, শেষপ্রহর, মূলধন, মুক্তি, জোর যার, ভাঙন। প্রায় প্রতিটি গল্পের ঘটনাপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে গ্রামের অন্ত্যজ শ্রেণির দুঃখ-দুর্দশা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিজনিত জীবনকাহিনি নিয়ে। গ্রামের অতি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের নির্যাতিত ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনচিত্র অঙ্কনে তিনি প্রদর্শন করেছেন দুর্লভ সার্থকতা। এ গ্রন্থের প্রথম গল্প 'শাহেরবানু'-তে দারিদ্র্যপীড়িত মাজেদের জীবনের করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এ গল্পে শাহেরবানু নামের এক মেয়েকে ভালোবাসে মাজেদ। কিন্তু তার স্বপ্নপূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় দারিদ্র্য। উপায়ান্তর না দেখে নৈতিকতা বিচ্যুত হয়ে চৌর্যবৃত্তির মতো কাজ করতেও দ্বিধা করে না মাজেদ। কেবল তাই নয়, তার অপরাধের কথা যাতে প্রকাশ না পায় সেজন্য ছোট একটি শিশুর প্রাণসংহারের মতো গর্হিত কাজও করে ফেলে দিশেহারা মাজেদ এবং এ ঘটনার জেরে শিশুটির পিতার হাতে মৃত্যু ঘটে তার। 'ইতিকথা' গল্পেও দারিদ্র্যজনিত

[১] সৈয়দ আবুল মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *শাহেরবানু*, প্রথম প্রকাশ, নবযুগ প্রকাশনী, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৬৪। বর্তমান গ্রন্থে *শাহেরবানু* এর পাঠ এ-সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

পারিবারিক অশান্তি ও নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। 'জাহাজঘাটের কুলি' গল্পে কুলি জীবনের সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন-হতাশার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গল্পটি লেখকের প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতার ফসল। বরিশাল থেকে ঢাকায় লঞ্চে যাতায়াতের সময় তিনি জাহাজঘাটের কুলিদের জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন। এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য একটি গল্প 'কেরায়া নায়ের মাঝি', যাতে দরিদ্র মাঝি আজহারের পরিবারের দুঃখ-দুর্দশা এবং তার জীবনের করুণ পরিণতির চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। পৌষ মাসে নতুন ফসল ঘরে আসায় এ মাসটি কৃষকদের জন্য আনন্দের হলেও সকল কৃষকের জন্য নয়। 'পৌষ' গল্পে এরকমই এক হতদরিদ্র চাষির হতাশা ও ব্যর্থতার চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রান্তিক কৃষক আজহারের দারিদ্র্যজনিত অসহায়ত্বের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'শেষপ্রহর' গল্পে। সংসার জীবনে সুখ-আনন্দ, ভালোবাসা, স্ত্রী, পরিবার-পরিজন সব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয় হোসেন, যেটি সমাজবাস্তবতার করুণ এক দিক আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। দরিদ্র চাষি মেনাজের জীবনের মূলধন মনু নামের একটি গরু যাকে অবলম্বন করে সে জীবিকা নির্বাহ করে, এবং এই মনুকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে 'মূলধন' নামের গল্পটি। গ্রামে গো-মড়ক দেখা দিলে সন্তালতুল্য মনুকে হারানোর ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে মেনাজ। তার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বনকে হারানোর শঙ্কায় পাগলপ্রায় মেনাজের যে মনোজাগতিক অস্থিরতা, তার মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়েছে প্রকৃতির কাছে দরিদ্র মানুষের অসহায়ত্বের স্বরূপ। 'মুক্তি' গল্পে দেখতে পাই দারিদ্র্যের কারণে পারিবারিক অশান্তি, কলহ-বিবাদ এবং নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের স্বরূপ। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র চেরাগ আলী অভাবের হাত থেকে মুক্তির আশায় স্ত্রী জয়তুনকে বিক্রি করে দেয় মিলিটারি ক্যাম্পে নারী সরবরাহের দালাল চৈতন দাসের কাছে। নদী তীরবর্তী অঞ্চলের অতি পরিচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ নদী-ভাঙনের প্রেক্ষাপটে রচিত 'জোর যার' গল্পে দারিদ্র্যের কারণে প্রেমে ব্যর্থতা এবং ব্যর্থতাজনিত হতাশার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রাম্য তরুণী মরিয়মকে গৃহিণী করে ঘরে তুলতে চায় দরিদ্র চাষি ফজু মিঞা এবং চরিত্রহীন অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ কাজেম আলী উভয়েই। গল্পের শেষ প্রান্তে দেখা যায় মরিয়মকে ঘরে তুলে নেয় কাজেম আলী। তার প্রভাবের সামনে অসহায় ফজু মিঞার কেবল তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। 'ভাঙন' গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দীর্ঘ প্রবাস জীবন শেষে ইতালি থেকে নিজ গ্রামে ফিরে আসা আনোয়ারের জীবনের মর্মন্তুদ এক অধ্যায়ের গল্প বর্ণিত হয়েছে। ব্যর্থ প্রেমের গ্লানি বুকে নিয়ে দেশ ছেড়েছিল আনোয়ার, তারপর বিচিত্র অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করে বাংলার এক দূর গ্রামে রেখে যাওয়া বাবা-

মা-বোনদের কাছে ছুটে আসে সে কিন্তু ততদিনে মন্বন্তরের কারণে তার বাবার মৃত্যু ঘটেছে, মা বোনেরা দেশান্তরী হয়েছে। গল্পের শেষে নদীর ভাঙনে বিলুপ্তপ্রায় বন্দরের সঙ্গে মন্বন্তরের করাল গ্রাসে নিজের জীবনের ভাঙনের মিল রূপকার্থই স্পষ্ট হয়েছে।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *পথ জানা নাই*।[১] এ গ্রন্থের মোট গল্প এগারোটি। 'বন্যা', 'জীবনের শুভ অর্থ', 'বজ্র', 'মদনমাঝির গেলেপতার', 'সরজমিন', 'বাণ', 'অনেক দিনের আশা', 'পথ জানা নাই' প্রভৃতি গল্পে গ্রামীণ জীবনের বিশ্বস্ত চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। '*পথ জানা নাই*' গ্রন্থের প্রথম গল্প 'বন্যা' গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত। এ গল্পে গ্রামীণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং নরনারীর হৃদয়িক অনুভূতি, প্রেমের অচরিতার্থতাজনিত ব্যর্থতা এবং দ্বন্দ্ব কোলাহলময় জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পের শুরু হলেও গল্পের মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্র মধুর প্রেম, অচরিতার্থতা এবং তজ্জনিত ব্যর্থতার কাহিনি বর্ণনায়। লেখক মধুর মনোজাগতিক অস্থিরতাকে বন্যাপ্রকৃতির সঙ্গে একাকার করে পরিবেশন করেছেন। 'জীবনের শুভ অর্থ' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র লোকনাথের স্মৃতিচারণে গ্রামীণ জীবনের অনুষঙ্গ চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। গ্রামের দরিদ্র পরিবারের সন্তান লোকনাথ নিজের চেষ্টায় সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌঁছে যান। কিন্তু নিজের অতীতকে ভুলতে পারেন না তিনি। কোলকাতায় নিজের সদ্যনির্মিত সুরম্য প্রাসাদে অবকাশ যাপনে এসেও তাঁর বারবার মনে পড়ে গ্রামীণ শৈশবকে। পাড়াগাঁয়ের সেই পরিত্যক্ত বাড়িতে ঘুরে আসার ইচ্ছা তাকে বারবার তাড়া দেয়। তেতাল্লিশ-এর মন্বন্তরের বিপুল বিস্তৃত থাবা গ্রামের সাধারণ মানুষের সহজ-সরল জীবনযাত্রাকে কীভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে তার চিত্র প্রতিভাত হয়েছে 'বজ্র' গল্পে। মন্বন্তরের প্রভাবে গ্রামজীবনে দেখা দেয় চরম দারিদ্র্য। ফলে অর্ধাহারে, অনাহারে বিপন্ন মানুষ তীব্র অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। অস্তিত্বহীন মানুষ পরাজয়ের গ্লানিতে নিপতিত হয়। যুদ্ধ আর মন্বন্তরের বজ্রাঘাতে মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্ব আর মূল্যবোধ কীভাবে তিলে তিলে ক্ষয়ে যায় এ গল্প তারই দলিল। 'মদন মাঝির গেলেপতার' গল্পে গ্রামবাংলার নদীপথেও যে নানা অরাজকতা চলে এবং অসদুপায়ে মানুষ জীবনযাত্রা নির্বাহ করে সেই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এ গ্রন্থের

[১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, *পথ জানা নাই*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্যারাডাইস লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, ঢাকা, মে ১৯৬৭। বর্তমান গ্রন্থে *পথ জানা নাই* এর পাঠ এ-সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'সরজমিন', যে গল্পে বন্যাপীড়িত একটি গ্রামের নিরন্ন মানুষের কঠোর জীবন সংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে। লেখকের ভাষায় সে গ্রাম 'এতই নগণ্য যে হয়তো মানচিত্রেও নেই'। নিরন্ন মানুষের জীবনসংগ্রামের ছবি উচ্চবিত্তের এক নগরবাসীর মনে যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তারই অনবদ্য কাহিনি 'সরজমিন'। গল্পের সবচেয়ে বেদনাকরুণ দৃশ্যটি হচ্ছে, বৃষ্টির তোড়ে গল্পের কথক গ্রামের একটি ঘরের মাচায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন যেখানে জ্বরাক্রান্ত এক শিশুর বমিমিশ্রিত শসা পানিতে ধুয়ে পরিবারের অন্যান্য ক্ষুধার্ত সদস্য তা আহার করছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি বিচলিত হয়ে ওঠেন। কথকের পাশাপাশি পাঠকও এ বর্ণনাংশে এসে যেন থমকে যান। 'বাণ' গল্পে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে অন্ত্যজ মানুষ কীভাবে নৈতিকতার প্রশ্নে দোদুল্যমানতায় আক্রান্ত হয় তারই জীবন ঘনিষ্ঠ চিত্র ফুটে উঠেছে। এ গল্পে দেখা যায় দারিদ্র্যের কারণে সুন্দরলালের প্রেম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অতঃপর নিজের মনের মানুষকে পাওয়ার আশায় অনৈতিক উপায়ে ভাগ্য পরিবর্তনে উদ্যোগী হয় সে। 'অনেক দিনের আশা' গল্পে গ্রামীণ নর-নারীর হৃদয়িক সম্পর্ক, দারিদ্র্য, মন্বন্তরের প্রভাব এবং অসহায় দরিদ্র মানুষের ওপর ক্ষমতাশালীর প্রভাব ও শোষণের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। বাল্যবন্ধু আয়নদ্দি ও ফুলজানের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আবর্তিত এ গল্পে আয়নদ্দির প্রতি ফুলজানের আত্মনিবেদনের জীবনঘনিষ্ঠ চিত্র পাই। সে আত্মনিবেদন এতটাই প্রবল যে আইন ও সমাজের চোখে অপরাধী আয়নদ্দিকে আশ্রয় দিতেও কুণ্ঠিত হয় না ফুলজান; শুধু তাই নয়, বড় মিঞা ও দারোগাকে সম্ভ্রম বিলিয়ে দিয়ে আয়নদ্দিকে আইনি ঝামেলা থেকে মুক্ত করে তার সঙ্গে নবজীবনের সূচনা করতে উদ্যোগী হয় সে। কিন্তু সেই ফুলজানের কথা একবারও চিন্তা না করে আয়নদ্দি যখন অন্য একজনকে নিয়ে সংসার করতে চায়, তখন অনেক দিনের লালিত আশাভঙ্গের বেদনায় নিঃশব্দে অশ্রুপাত করা ছাড়া ফুলজানের আর কিছুই করার থাকে না। 'পথ জানা নাই' গল্পের আখ্যান বর্ণিত হয়েছে মাউলতলা নামক একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে গ্রামজীবনে যে নতুন অনিশ্চয়তা ও সংকট দেখা দেয় সেটিই এ গল্পের উপজীব্য। নগরায়ণের প্রতিক্রিয়ায় গ্রামের মানুষের সহজ-সুন্দর-অকৃত্রিম জীবন ধীরে ধীরে পঙ্কিলতা আর কলুষতায় ঢেকে যায়। গ্রামবাসীর আর্থিক আর সামাজিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য যে রাস্তা নির্মিত হয়েছিল সেটিই কীভাবে গ্রামের মানুষের নৈতিক আর সামাজিক অধঃপতনের পথ খুলে দেয় তারই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এ গল্পে। ঘরে-বাইরে নিঃস্ব কৃষক গহুরালী যখন তার সমস্ত ক্রোধ শহরমুখী সেই রাস্তার ওপর মেটায় তখন পাঠক হৃদয়েও দোলা দিয়ে

যায় সেই প্রশ্ন: সম্ভাবনার সোনালি বন্দরে পৌঁছার পথটি আসলে কোথায়? যে পথে পার্থিব আর বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির আগমন, সেই একই পথে কি মূল্যবোধ ধ্বংসকারী ঘুণপোকারও আগমন নয়?

অনেক দিনের আশা[১] গল্পগ্রন্থের গল্পের সংখ্যা ৮টি। গল্পগুলো হলো– 'অনেক দিনের আশা', 'পৌষস্বপ্ন', 'কলাবতী', 'হঠাৎ', 'কালীদহের তীরে', 'দুর্যোগ', 'বাঁদর' ও 'মৌসুম'। গল্পগুলো গ্রামীণ পটভূমিতে রূপায়িত। গ্রামের নিম্নবিত্ত মানুষের অভাব-দারিদ্র্য, নর-নারী সম্পর্ক, ক্ষমতাশালী কর্তৃক দরিদ্র জনগণের প্রতি শোষণ-বঞ্চনা ইত্যাদি গ্রামীণ জীবনের নানা বিষয় এ গ্রন্থের গল্পগুলোতে গুরুত্ব লাভ করেছে। এ গ্রন্থের প্রথম গল্প 'অনেক দিনের আশা' গল্পটি এর পূর্ববর্তী গল্পগ্রন্থ 'পথ জানা নাই'-তেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 'পৌষস্বপ্ন' গল্পে যুদ্ধজনিত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত গ্রামজীবনের চিত্র প্রতিভাসিত হয়েছে। যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাবে অর্ধাহার, অনাহার, কর্মহীনতায় দরিদ্র মানুষের জীবন অসহনীয় হয়ে পড়ে। ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষ খাদ্যান্বেষণে শহরে পাড়ি জমায়। কিন্তু সেখানেও অনুকূল পরিবেশ পায় না তারা। বরং শহরের মানুষের ঔদাসীন্য, অবহেলা হয় তাদের মানবেতর জীবনের নিত্যসঙ্গী। এ গল্পের হতদরিদ্র দম্পতি মকু ও মালেক আকালের সময় ভিটেমাটি বন্ধক ও বিক্রি করে খাদ্যান্বেষণে শহরে পাড়ি জমায়। কিন্তু এক পর্যায়ে স্বামী মালেকের মৃত্যু হলে আবার গ্রামে ফিরে আসে মকু। কিন্তু গ্রামে এসেও সে অসহায় বোধ করে, কারণ যাদের বাড়িতে কাজ করে তাদের ঔদাসীন্য ও আন্তরিকতার অভাব মকুর মনকে দগ্ধ করে। সর্বোপরি গ্রামের লোভী, অসাধু, দুশ্চরিত্র তালুকদারের লোভাতুর দৃষ্টি মকুর জীবনকে কীভাবে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর করে তোলে তার অনুপুঙ্খ বর্ণনাও চিত্রিত হয়েছে এ গল্পে। 'কলাবতী' গল্পে দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নর-নারীর প্রেম-সম্পর্ককে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধিয়ে এক শ্রেণির সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠীর হীন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া এ গল্পে নারীব্যবসায় জড়িত মহিমের চক্রান্তে কলাবতীর জীবনের করুণ পরিণতির চিত্র বিধৃত হয়েছে। 'আসা যাওয়ার কথা' গল্পে গ্রামীণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনচিত্রের নানা অনুষঙ্গ প্রস্ফুটিত হয়েছে। এ গল্পের 'মুনিষ' কাজ করে অবস্থাসম্পন্ন কাসেম খাঁ'র বাড়িতে। সেখানে মুনিষ সাদেকের সঙ্গে কাসেম খাঁ'র বোন রাবেয়ার মধ্যে এক অসম প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। যদিও অসুস্থতার কারণে সাদেকের মৃত্যু ঘটলে সে প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটে। 'হঠাৎ' গল্পে অভাব-

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *অনেক দিনের আশা*, প্রথম প্রকাশ, ওয়ার্সী বুক সেন্টার, ঢাকা ১৯৪৫ । বর্তমান গ্রন্থে *অনেক দিনের আশা* এর পাঠ এ-সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

দারিদ্র্যের কারণে মানব-মানবীর হৃদয়ঘটিত সম্পর্ককেও কীভাবে দূরে সরিয়ে দিতে বাধ্য করে তা উন্মোচিত হয়েছে। এ গল্পের রত্তন একটি মেয়ের প্রেমে পড়লেও সে মনের এ চাওয়াকে প্রশ্রয় দিতে চায় না, কারণ আকালের প্রভাবে তার সংসার দুঃখ-কষ্টে দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। তাই এই দুর্দিনে প্রেম-ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই। 'কালীদহের তীরে' গল্পে সামান্য ঘটনার জের ধরে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনকে কীভাবে বিপর্যস্ত করে এবং এর ফলে যে অনেক সময় অনেক বড় ত্যাগও স্বীকার করতে হয় তার অনুপুঙ্খ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। 'দুর্যোগ' গল্পে এক অসহায় নারীর জীবনের করুণ পরিণতির চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। ক্ষমতাহীন প্রান্তিক মানুষেরা কীভাবে ক্ষমতাবানদের লালসার কাছে জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয় তারই এক বাস্তবানুগ ছবি ফুটে উঠেছে এই গল্পে। গ্রামের বিত্তশালী, দুশ্চরিত্র এক ব্যক্তির কাছে এক দুর্যোগের রাতে কাঞ্চনমালা নামে অসহায় এক নারীর সম্ভ্রম হারানোর এই গল্প তাই কেবল এক নারীর ব্যক্তিগত বেদনার কাহিনি হয়ে থাকে না, আমাদের সমাজদেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়া বৃহৎ ও ব্যাপকতর দুর্যোগেরই অসামান্য প্রতীক হয়ে যায়। 'ক্ষুধা' গল্পটি এক অসম প্রেমের বিচ্ছেদ-বেদনার আখ্যান। গ্রামের অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান হাশেম এবং দরিদ্র পরিবারের কন্যা আমেনার হার্দিক সম্পর্ক গড়ে উঠলেও শ্রেণিবৈষম্যের দুর্মর দেয়াল ভাঙতে ব্যর্থ হয় তারা। বাল্য-কৈশোরের অকৃত্রিম পরিবেশে গড়ে ওঠা মৌলিক সম্পর্কগুলো বাস্তবতার কশাঘাতে কীভাবে অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয় তারই সহজসরল একটি গল্প এটি, যার মাধ্যমে নিয়তির হাতে বন্দি মানুষের জীবনযন্ত্রণাকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক। 'বাঁদর' গল্পটি দাম্পত্যজীবনের টানাপড়েনের কাহিনি নিয়ে রচিত। কেরামত আলী ও বরুজানের দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে হাজির হয় সিকান্দর নামে এক তরলমতি যুবক এবং তার প্রতিক্রিয়ায় কেবল কেরামত ও বরুজানের সংসারের নানারকম সমস্যারই সৃষ্টি হয় না, কেরামত আলীর মনোজগতেও ঘটে বিপুল পরিবর্তন। এ গল্পের মাধ্যমে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনে কীভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত ছন্দপতন ঘটে তারই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

পুঁই ডালিমের কাব্য [১] গল্পগ্রন্থে মোট গল্প বারোটি। গল্পগুলো হলো– পুঁই ডালিমের কাব্য, জীবন-শিল্পী, লালবাত্তি, কায়কারবার, ভাঙ্গন, গায়ের আগুন, সেই লোকটি আর সেই পাখিটির কথা, সেই লোকটি সেই মেয়েটি আর সেই গাছটির গল্প, সেই মেয়েটি ও তার কাঠ গোলাপের গাছটির কথা, রাগ বিরাগের নানাজি, ম্যাজিক-লণ্ঠন, মরম না জানে। এগুলোর মধ্যে সবগুলো গল্পই শহরের পটভূমিতে রচিত, কেবল 'লাল বাত্তি'-ই ব্যতিক্রম – যেটি আংশিকভাবে শহরের পটভূমিতে রচিত হলেও গ্রামীণ পটভূমি ও অনুষঙ্গ উভয়ই এতে প্রাধান্য পেয়েছে। এ গল্পে দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত মুজফ্ফর ও তার পরিবারের নির্মম পরিণতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। অভাবের তাড়নায় নিজ গ্রাম ছেড়ে শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে মুজফ্ফর। একে একে দুই সন্তানকে হারানোর পর মুজফ্ফরের নিজেরও করুণ পরিণতি ঘটে শহরের নির্মম পরিবেশে। গল্পের শেষ অংশে মুজফ্ফরের স্ত্রী আর তার ছেলে মনুয়াকে রাস্তা পার হতে গিয়ে লাল বাতি না মানার জন্য ভর্ৎসনা শুনতে হয় ট্রাফিক পুলিশের। লাল রঙের এই ট্রাফিক বাতির সাথে মুজফ্ফরের পরিবারের জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতির যোগসূত্র তৈরির মাধ্যমে নিয়তির হাতে বন্দি ভাগ্যহত মানুষের অসহায়ত্বের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন লেখক।

মজা গাঙের গান [২] গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত গল্পের সংখ্যা দশটি। গল্পগুলো হলো– রক্তের স্বাদ, নকল, নেপথ্যে, ওয়েভলেংথ, মানসকন্যা, মজা গাঙের গান, সুটকেস, দায়-দাবি, কথা, একটি প্রবন্ধের গল্প। এর মধ্যে কেবল নামগল্প 'মজা গাঙের গান'-ই গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত। এ গল্পে মধ্যবয়স্ক দুই আত্মীয় বরুজান আর তার বেয়াইয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন পর দেখা হওয়া এবং তাদের আলাপচারিতার পরিপ্রেক্ষিতে অতীত ও বর্তমানের এক তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এই প্রতিতুলনার রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে গ্রামের বিশাল নদীটি। এককালের প্রমত্তা সেই নদী আজ পরিণত হয়েছে মজা গাঙে; স্মৃতি আর স্বপ্নে ঘেরা স্বর্ণালি অতীতের কাছে আজকের দিনগুলোও কেমন যেন বর্ণহীন আর রুক্ষ। দুই প্রৌঢ় আত্মীয়ের

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *পুঁই ডালিমের কাব্য*, প্রথম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা, আশ্বিন ১৩৯৪ । বর্তমান গ্রন্থে *পুঁই ডালিমের কাব্য* এর পাঠ এ-সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *মজা গাঙের গান*, প্রথম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা, মার্চ ১৯৮৭ । বর্তমান গ্রন্থে *মজা গাঙের গান* এর পাঠ এ-সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে।

আলাপচারিতায় অর্থ-বিত্ত নাকি মনের শান্তি, কোনটি মানবজীবনের আসল মোক্ষ, সেই জটিল প্রশ্নটিও সামনে চলে আসে।

ঘটনার বর্ণনায়, পটভূমি বিশ্লেষণে আর চরিত্রচিত্রণে শামসুদ্দীন আবুল কালাম পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে এমন কিছু প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র অঙ্কন করেছেন যারা পাঠকের মানসপটে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁর উপন্যাসের উজ্জ্বল চরিত্রগুলোর মধ্যে *কাশবনের কন্যা*-র হোসেন ও কানু শিকদার, *আলমনগরের উপকথা*-র আলমগীর *নবান্ন*-এর দয়াল চৌকিদার, *কাঞ্চনগ্রাম* উপন্যাসের জালাল মিঞা ও আবদুল আলী মাস্টার, *সমুদ্রবাসর*-এর সুজাত আলী ও করিমন, *জায়জঙ্গল*-এর জয়নাল শেখ, *যার সাথে যার* উপন্যাসের নিমু হাওলাদার এবং গল্পের ভুবনে 'পথ জানা নাই' গল্পের গহুরালী, 'নবমেঘভার' গল্পের মাজু মিয়া, 'কেরায়া নায়ের মাঝি' গল্পের আজহার, 'ইতিকথা' গল্পের হোসেন, 'মদনমাঝির গেলেপতার' গল্পের মদন মাঝি, 'কলাবতী' গল্পের কলাবতী, 'পৌষস্বপ্ন' গল্পের মকু ও 'দুর্যোগ' গল্পের কাঞ্চনমালা প্রভৃতি চরিত্র শিল্পসার্থকতায় উৎত্তীর্ণ। বিষয়-ভাবনায় উদাসীন গানপাগল শিকদার এবং নিরিবিলি গার্হস্থ্য জীবনের প্রত্যাশী হোসেন উভয়কে ঘিরেই *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসের ঘটনাক্রম আবর্তিত হয়েছে। তবে কানু শিকদারের চরিত্র-চিত্রণে লেখক যতটা মনোযোগী ছিলেন হোসেন ততটা মনোযোগ পায়নি। ফলত, হোসেন চরিত্রটির স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতি ঘটেনি, যা উপন্যাসটির শৈল্পিক উৎকর্ষকেও কিছুটা ক্ষুণ্ন করেছে। চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে শামসুদ্দীন আবুল কালামের দুর্বলতা হচ্ছে, ভালো-মন্দে মিশানো পরিপূর্ণ মানুষ গড়ার পরিবর্তে মোটাদাগে ভালো এবং মন্দ মানুষেরই ছড়াছড়ি তাঁর উপন্যাসে বেশি। দয়াল চৌকিদার এমনই এক ভালোমানুষের উদাহরণ, জীবনের কোনো পঙ্কিলতা যাকে স্পর্শ করতে পারে না। এ ধরনের চরিত্রগুলো একধরনের ইউটোপিয়ান চিন্তা থেকে উদ্ভূত এবং এ কারণেই জীবনের রূঢ় বাস্তবতার সঠিক প্রতিফলন এ ধরনের চরিত্রগুলোর মাধ্যমে ঘটানো সম্ভব নয়।

বৃহদায়তন উপন্যাস *কাঞ্চনগ্রাম*-এও এ ধরনের দুটি চরিত্র পাই– জালাল মিঞা ও আবদুল আলী মাস্টার। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসে উপরিউক্ত দু'টি চরিত্রই আদর্শবাদী এবং পুরানো চিন্তা ও ধ্যানধারণার সঙ্গে আধুনিকতার সংঘাতের বিষয়ে পূর্ণ সচেতন। তাদের মানসগঠন পরিণত ও ইতিহাস-চেতনায় ঋদ্ধ। হাজার বছর ধরে বহু রাজ্য-রাষ্ট্রের ভাঙ্গাগড়ার মাধ্যমে গঠিত এই জনপদের

বর্তমান দুরবস্থা তাদের পীড়িত করে। কিন্তু প্রখর এই ইতিহাসচেতনার বাইরে তাদের ব্যক্তিজীবন ও গ্রামের অধিবাসী হিসেবে তাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ও দৈনন্দিন টানাপড়েনের তেমন কোনো চিত্র এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়নি। ফলত তারা দুজনেই যাত্রার বিবেকের মতোই এক ধরনের কাল্পনিক চরিত্রের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে; স্বাভাবিক, রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসের প্রধান দু'টি চরিত্র সুজাত আলী ও করিমন। দক্ষিণ বাংলার বিরূপ পরিবেশে সামন্ত জমিদারের অত্যাচার-নিপীড়নের মুখে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো সুজাত আলী নিঃসন্দেহে একটি বর্ণময় চরিত্র, কিন্তু নিরীহ এক গ্রামবাসী থেকে প্রতিরোধ সংগ্রামী হিসেবে সুজাত আলীর বিকাশ ও বিবর্তনকে লেখক সঠিকভাবে চিত্রিত করতে পারেননি। সমালোচকের ভাষায়, 'আশৈশব কুণ্ঠা ও ভীরুতার মধ্যে যে সুজাত আলী বর্ধিত হয়েছে তার মধ্যে আকস্মিকভাবে নেতৃত্বের গুণাবলি সঞ্চারিত করে লেখক এ চরিত্রটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হননি।'[১] সুজাত আলীর বাল্যপ্রণয়ী করিমনের চরিত্র চিত্রণে বরং লেখক অনেকাংশেই সফল হয়েছেন। পঙ্গু স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে বাধ্য হলেও করিমনের মধ্যে সুস্থ-সুন্দর একটি জীবনের স্বপ্ন জাগ্রত, আর এই স্বপ্নকে সফল করতেই জীবনকে ইতিবাচকভাবে নেয়ার প্রবণতা তার মধ্যে বিদ্যমান, যা তাকে সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা মিলিয়ে পরিপূর্ণ একটি চরিত্র হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। *জায়জঙ্গল* উপন্যাসে জয়নাল শেখ ও *যার সাথে যার* উপন্যাসের নিমু হাওলাদারকে কেন্দ্র করেই উপন্যাস দু'টির ঘটনাংশ আবর্তিত হলেও চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ না ঘটা ও উপন্যাসের আখ্যানের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একাত্ম হতে না পারায় চরিত্র দু'টি সামগ্রিক বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের গল্পভুবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে কয়েকটি শিল্পসফল চরিত্র চোখে পড়ে গহুরালী (পথ জানা নাই) যার অন্যতম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এক সংকটময় সময়ে নিভৃত পল্লি মাউলতলার সঙ্গে শহরের সংযোগ ঘটিয়ে দেয়া নতুন একটি সড়ক কীভাবে গহুরালীর মতো অসংখ্য গ্রামবাসীর স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে রূপান্তরিত করল সেটিই মমস্পর্শী আন্তরিকতায় তুলে ধরেছেন লেখক, আর এভাবেই অসহায় গহুরালী হয়ে উঠেছে প্রান্তিক মানুষের স্বপ্নভঙ্গের প্রতীক। 'মৌসুম' গল্পের সখানাথ ও রমানাথের মধ্যে সামন্তপ্রভুর নির্যাতনের মুখে রুখে দাঁড়ানো প্রতিবাদী মানুষের দেখা মেলে। নিশ্চিত বিপদের মুখেও সমাজপতির চোখ রাঙানোকে অগ্রাহ্য করার মাধ্যমে সখানাথ ও রমানাথ তাদের সমকালীন

[১] গিয়াস শামীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

প্রতিবাদী চেতনাকেই ধারণ করে। গ্রামের দরিদ্র এক পোস্টমাস্টার মাজু মিঞার জীবনের অপ্রাপ্তিজনিত বেদনা করুণ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে 'নবমেঘভার' (*দুই হৃদয়ের তীর*) গল্পে। দরিদ্র পোস্টমাস্টার মাজু মিঞার সাধ ও সাধ্যের টানাপড়েনের নিখুঁত চিত্রায়ণ তাকে পাঠকের সহানুভূতির কেন্দ্রে স্থাপন করেছে। বাস্তবতার কশাঘাতে বিপর্যস্ত মাজু মিঞার মধ্যে সংবেদী পাঠক খুঁজে পান নিজেকে, বিশ শতকী যুগযন্ত্রণার এক মূর্ত প্রতীক যেন এই মাজু মিঞা। 'মদনমাঝির গেলেপতার' (*পথ জানা নাই*) গল্পের মদন মাঝি ধনীর সম্পদ লুট করে গরিবের মাঝে বিলিয়ে দেয়। মদনমাঝির চরিত্রচিত্রণে ইচ্ছাপূরণের অবাস্তবতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হলেও নৃশংসতা ও সহৃদয়তার মধ্যে পেণ্ডুলামের মতো দুলতে থাকা তার চরিত্র পাঠকের মনোযোগকে অধিকার করে রাখে। 'কলাবতী' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পের নামচরিত্র কলাবতী পল্লিবাংলার প্রেমময়ী নারীজাতির প্রতীক। বাস্তবতার যূপকাষ্ঠে অসহায় নারীর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা কীভাবে ধূলিসাৎ হয়ে যায় তারই চিত্র ফুটে উঠেছে কলাবতীর করুণ পরিণতির মধ্যে। পল্লিবাংলার কলাবতীদের জন্ম কেবলই সমাজপতিদের কূটচালের ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য – এই চিরন্তন সত্যই যেন কলাবতী চরিত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম। সামন্তপ্রভুর দৌরাত্ম্যের মুখে নারীর অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে মকু (*পৌষস্বপ্ন*) ও কাঞ্চনমালা (*দুর্যোগ*) চরিত্রের মধ্য দিয়ে। ক্ষমতাবান বনাম ক্ষমতাহীনের দ্বন্দ্বে প্রান্তিক মানুষ; বিশেষত নারীদের অসহায়ত্ব এক সমতলে এনে দাঁড় করিয়েছে কলাবতী, মকু ও কাঞ্চনমালাকে।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম পল্লিবাংলার অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্র নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন তাঁর সাহিত্যে। রোমান্টিক আবেগ আর স্বভাবসুলভ আন্তরিকতায় ভূমিসংলগ্ন মানুষের বিপন্নতা আর বঞ্চনার গল্প বলেছেন তিনি, যাতে পরিস্ফুট হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনাকুশলতা। কখনো মোটাদাগে, কখনো তুলির সূক্ষ্ম আঁচড়ে পল্লি জনগোষ্ঠীর ছোট ছোট সুখ-দুঃখের গল্প বলেছেন তিনি – যাতে তাদের অর্জন ও অপারগতা, স্বপ্ন ও সীমাবদ্ধতা আমাদের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রান্তিক মানুষের সঙ্ঘশক্তিতে বিশ্বাসী শামসুদ্দীন আবুল কালাম স্বপ্ন দেখেন এক সমৃদ্ধ আগামীর। তাঁর গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত কথাসাহিত্যে সেই বিশ্বাসেরই প্রতিফলন দেখা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাসে প্রতিফলিত গ্রামীণ জীবন

স্থান ও কালভেদে এদেশের গ্রামীণ জীবন বিচিত্র তবে এমন কিছু অনুষঙ্গ আছে যা গ্রামজীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত। 'বাংলাদেশ চিরকালই ছিল কৃষিনির্ভর। কাজেই ভূমি-ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করেই বাংলাদেশে গ্রামের পত্তন শ্রেণীবিন্যাস এবং রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক-অধিকারের বিকাশ ঘটেছে।'[১] এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, গ্রামীণ জীবন প্রধানত ভূমিকেন্দ্রিক। তাদের জীবন-জীবিকা কৃষিনির্ভর। কৃষিকাজই শহর ও গ্রামের মধ্যে তৈরি করেছে সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য। এর পাশাপাশি উল্লেখ করা যায় উৎসব ও পালাপার্বণ, আতিথেয়তা, পারস্পরিক সম্প্রীতি ইত্যাদির কথা – যা এদেশের গ্রামীণ জনপদের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত বৈশিষ্ট্য। আবার অভাব-দারিদ্র্য, বিবাদ-বিসংবাদ, শোষণ-নির্যাতন এসবও বাংলাদেশের গ্রামীণ জনসমাজে সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্যকে স্বীকরণ করে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিকরা রচনা করেছেন তাঁদের কালজয়ী কথামালা; গ্রামের জীবন ও জনপদকে অবলম্বন করে সৃষ্টি করেছেন গল্প-উপন্যাস। শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম এই ধারারই সার্থক উত্তরাধিকার; যাঁর কথাসাহিত্যের বিস্তীর্ণ পরিসরে চিত্রিত হয়েছে গ্রামীণ মানুষের জীবন-জীবিকার বিচিত্র চলচ্ছবি।

গ্রামবাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে বাংলাদেশের সমুদ্র-বিধৌত দক্ষিণাঞ্চলের মৃত্তিকা-সংলগ্ন জনগোষ্ঠীর সংগ্রামশীল জীবনপ্রবাহের বাস্তবানুগ চিত্র নির্মাণের দক্ষতায় শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাস স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। দক্ষিণ বাংলার নদী ও সমুদ্র-তীরবর্তী জীবন-জনপদের প্রকৃতি ও নিসর্গ, এখানকার মানুষের যাপিত জীবনের ব্যাপক চালচিত্র এ উপন্যাসসমূহে শিল্পসফলভাবে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। সমুদ্র-প্রকৃতির অপার সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা এ অঞ্চলের অধিবাসীদের সংগ্রামমুখর জীবন,

[১] রওনক জাহান, *পাকিস্তান: ফেলিওর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন*, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২, পৃ. ১৯ (মহীবুল আজিজ প্রণীত *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ: ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০২, পৃ. ২৯ থেকে গৃহীত)।

অভাব-দারিদ্র্য, প্রত্যাশা-প্রাপ্তি, বিপর্যয়-বেদনা, সংস্কার-সংস্কৃতি তাঁর মতো করে আর কেউ উপস্থাপন করেননি। তিনিই এ অঞ্চলের সংগ্রামশীল মানুষের জীবনচর্চার অন্তরঙ্গ কথাকার।

প্রকৃতি ও জীবন

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই প্রকৃতি ও মানুষের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। প্রকৃতির নানা ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ এই বিশ্বচরাচর। মানুষের জীবনধারণে প্রকৃতির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। মানবজীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে তাই সাহিত্যে প্রকৃতির উপস্থিতি আপন মহিমায় ভাস্বর। দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্রসন্নিহিত অঞ্চলের নদ-নদী, অরণ্য, মানুষের বিচিত্র জীবন গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেছেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম। প্রকৃতির প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নিসর্গপ্রিয় এই সাহিত্যিকের কথাসাহিত্যে। সমুদ্র-উপকূলবর্তী মানুষের জীবন ও প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়ায় যে চিত্রকল্প তৈরি হয়েছে তা তাঁর অনবদ্য উপস্থাপনায় শিল্পায়িত হয়েছে। নদীনালা খালবিল অধ্যুষিত এ অঞ্চলের জনজীবনে প্রকৃতি কখনো নৈসর্গিক সৌন্দর্যের উৎসভাণ্ডার, কখনো প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে মানবহৃদয়ের গভীর সংবেদনশীল অনুভূতির দ্যোতক।

নদীমাতৃক বাংলার নদী-জল-নিসর্গের সৌন্দর্যে মুগ্ধ লেখক। দক্ষিণবাংলার সমুদ্র-বিধৌত এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ও প্রকৃতির মধ্যে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্কের চিত্র ফুটে উঠেছে লেখকের *কাশবনের কন্যা*-র প্রাক্‌কথনে। এখানে প্রকৃতি চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্রকৃতির সকল অনুষঙ্গের সমাবেশে অর্থাৎ মাটি, মাটি-উদ্ভূত সবুজ-শস্য-বৃক্ষ, খাল-বিল-নদী-নালা-সমুদ্রের 'সহস্র প্রকার সাতনরী হারের মালা' পরে এই দেশ বধূবেশে সজ্জিতা। যার অঙ্গে দুরন্ত যৌবন। প্রকৃতি রূপ-বৈভব দিয়ে 'সংখ্যাতীত সখিজনের' মতো সেই নারীকে ঘিরে রেখেছে এক রুদ্র পুরুষ অর্থাৎ ঝড়-বন্যা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি। এই রুদ্র পুরুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগবেশে এসে–

> মদমত্ত মহাপ্রেমের ক্রীড়া কৌতুকে ক্লান্ত-শ্রান্ত বিশৃঙ্খলা করিয়া আবার উধাও হয়ে যায়। ... বধূবেশী দেশ-প্রকৃতি তখন সুখাবেশে প্রথম গর্ভিণীর স্নেহ ও গরবে হয় অপরূপা জননীর মতো। শান্ত। আকাশে তখন অজস্র আদরের শাদা মেঘ ভাসিয়া ভাসিয়া যায়, নভোনীলিমার আলো মমতা হইয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে, সেই বধূ সম্পদে-সৌষ্ঠবে সাজাইয়া তোলে তাহার সংসার; তাহার সকল জীবন ধর্ম-কর্ম অন্তর সঙ্গীত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে আকাশে বাতাসে,

প্রতিটি দিবসে রজনীতে দুঃখকে সে জয় করে, অঙ্গের সম্পদ সে খুশির আনন্দে সোনালি শস্যের আকারে অকৃপণভাবে ছড়াইয়া দেয়।[১]

প্রকৃতির সে অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ বসুন্ধরা। মানুষ ও প্রকৃতির সাবলীল ও প্রাণবন্ত জীবনক্রিয়াকে লেখক সমান্তরাল একরৈখিক আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন এ উপন্যাসে। সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলের প্রকৃতিপুষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনধারা এবং প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গের গতিময়তা ও চঞ্চলতার মধ্যে লেখক এক অবিচ্ছিন্ন রূপ লক্ষ করেছেন। নদী বা সমুদ্রকে লেখক বলেছেন এ অঞ্চলের অধিবাসীদের 'বিরাট বিপুলা জীবনেরই গতিময়তার প্রতীক'। স্রোতের গতিধারা যে ছন্দে ছুটে চলে সমুদ্র-উপকূলবর্তী মানুষদের জীবনপ্রবাহও তারই অনুগামী হয়ে বয়ে চলে। সর্বব্যাপ্ত সেই ছন্দকেই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন লেখক –

ক. মহাসমুদ্রের ঢেউ কোথা হইতে ধাইয়া ধাইয়া আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে সোনালি সৈকতে, ঘন নারিকেলবীথি তাহার আবেগের স্পর্শ পাইয়া পৌঁছাইয়া দিতেছে যেন কোন মহামন্ত্র আরও অভ্যন্তর দেশে শস্যশ্যামল ক্ষেতে তাই কত ঢেউ, মানুষেরও দৈনন্দিন জীবন-কর্মে সেই একই ছন্দ শতরূপে দৃষ্টিতে ধরা পড়িবে। দেখিও, কী লালিত ছন্দে চাষী বোনে ধান, মাঝি টানে নাও, বৌ-ঝি কাদাজলে গোবরে লেপে তাহাদের ক্ষুদ্র মাটির ঘরের ভিৎ, কেমন করিয়া ভানে তাহাদের ধান, লতাইয়া দেয় সেইসব গৃহস্থালির অঙ্গাভরণের মত পুঁই কি ঝিঙা, কত সব্জির লতাপাতা ডগা।[২]

খ. এইখানের এই বিশাল বহতা নদী যেন বিরাট বিপুলা জীবনেরই গতিময়তার প্রতীক, তাহার ভাঁটা-জোয়ারের টানাপড়েনের ছন্দও যেন মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্মেরও অংশ। বিস্তৃত স্রোতের গতিধারা যে-ছন্দে ছোট ছোট ঢেউ হইয়া চপলমতি শিশুদের মত তীরের মাটিতে হাত বুলাইয়া ক্রীড়াকৌতুকে ভাঙিয়া পড়ে, তাহারই সঙ্গে মিল রাখিয়া এই নদীর অভ্যন্তরের এবং দুই তীরবর্তী জীবনও যেন একই নিয়মের অনুবর্তী হইয়া বহিয়া চলিয়াছে।[৩]

'প্রকৃতির দাক্ষিণ্য অপরিসীম'। আর প্রকৃতির সে অকৃপণ দানে ধন্য সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী। লেখক এ অঞ্চলের জীবন-প্রবাহের উৎসমূল সন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছেন 'গাঙ্গ দেয় সব কিছু,

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাশবনের কন্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১
[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাশবনের কন্যা*, প্রাগুক্ত, ঢাকা, পৃ. ১০
[৩] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাঞ্চনগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০

জীবন-ঐশ্বর্য, ভুবন গড়ে, আর ভাঙ্গে।' তিনি এ অঞ্চলের আদিম বসতির ভিত্তিস্থাপন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়েও অবলোকন করেছেন প্রকৃতির দানের সঙ্গে মনুষ্যজীবনের সম্পর্কের এক শাশ্বত রূপ। সমুদ্রগর্ভ থেকে জেগে ওঠা নতুন চরে মানুষ যেমন অনেক স্বপ্ন নিয়ে ঘর বাঁধে ঠিক একইভাবে নানা ধরনের পশুপাখি ও নলখাগড়া আর হোগলার বনও তাদের আশ্রয় খুঁজে পায় সেখানে। মানসচক্ষে লেখক দেখেন – 'একদিন একদল মানুষ সেখানে আপন অধিকার লইয়া গড়িয়া তুলিবে ঘর-গৃহস্থালি, গরু চরিবে এইদিক সেইদিকের ঘাসবনে, ঝি-বৌরা সযত্নে সাজাইয়া তুলিবে গৃহাঙ্গন, দেহে ছন্দের ঢেউ খেলাইয়া উঠানে ছড়াইয়া দিবে শ্রমের ফসল।'[১] মানুষের চোখে স্বপ্নের মায়াঞ্জন পরিয়ে এই প্রকৃতি কখনো দু'হাতে বিলিয়ে দেয় তার পীযূষধারা, আবার কখনো সব গ্রাস করে নেয় তার রুদ্র-মূর্তি। উপকূলবর্তী মানুষের জীবন নদী ও সমুদ্রের সঙ্গে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ। তাদের জীবনচক্রে প্রাণদায়িনী স্রোতস্বিনীর প্রভাবও ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। এ প্রসঙ্গে লেখকের ভাষ্য–

> গাঙ্গই সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, কখনও অণুর পর অণু পলি মিশাইয়া মাটি গড়িতেছে, আবার অন্য একদিনের খেয়াল-খুশি মত তাহাকে খাবলে খাবলে নিশ্চিহ্ন করিয়া মাতিয়াছে অন্য খেলায়। সেই সঙ্গে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা-বর্ষা, ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ সমুদ্র যেন অনন্ত কাল ধরিয়া চতুর্দিকে জীবনের নিয়ামক হইয়া রহিয়াছে।[২]

নদীর বুকে নৌকা নিয়ে জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো হোসেন মাঝির দৃষ্টিতেও নদী আবির্ভূত হয়েছে নিয়তি-নির্ধারকের ভূমিকায়। নদীর দুইতীরে বসবাসকারী মানুষের জীবনের সকল পরিণতি যেন প্রমত্ত স্রোতস্বিনীর ইচ্ছার ওপরই নির্ভরশীল এবং 'তাহার ঢেউ-এর উপর সওয়ার হইবার সাধ্য যাহার নাই গাঙ্গও তাহাকে পাড়ের উপর হইতে উপড়াইয়া পড়া গাছের মত নিষ্ঠুরভাবে বিশাল সমুদ্রের দিকে টানিয়া লইয়া যায়।' (*কাশবনের কন্যা*, পৃ. ৭৮)। তাই হয়ত সমুদ্র-পাড়ের মানুষরা সমুদ্রের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসে নদী ও সমুদ্রতীরবর্তী মানুষের জীবনসংগ্রামের অন্তরঙ্গ ভাষাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে –

> এই গাঙ্গ বা গঙ্গাকে তাহারা যে যাহার চিত্ত বৃত্তি- প্রবৃত্তি এবং ধ্যান-ধারণা মত দিয়াছে নানা নাম, ডাকিয়া লইতে চাহিয়াছে নিজেদের সঙ্গোপনে অন্তপুরে, কখনওবা তাহার বহিয়া চলা পথের পাশেই সাধের সংসার দেখাইতে চাহিয়াছে। একদিকে তাহার কৃপাদৃষ্টির আগ্রহ, অন্যদিকে সমীহ, দুইয়েরই সংমিশ্রণে জন্মলাভ করিয়াছে নানা ধরনের আচার-বিচার অনুষ্ঠান। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জগৎজীবন স্রষ্টার রূপ যেমন বিভিন্ন, কেউ সন্তুষ্ট আকারে, কেউ

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাশবনের কন্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাঞ্চনগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

> মগ্ন নিরাকারে, সেই একইভাবে জীবজগৎকে লইয়া নিজ নিজ প্রয়োজন এবং ধ্যানানুসারে নানারকম সংস্কার ও পার্বণ জন্মলাভ করিয়াছে কখনও গোপন উপাসনার মত কখনও বা আনন্দমুখর উৎসবে। খণ্ড খণ্ড সমতল অঞ্চলে তাহার একটা মূল রূপ না থাকিলেও নদীমাতৃক ভুবনে তাদের প্রকৃতি নির্ভর জীবন-যাপন কখনও বিধি ব্যবস্থার আকর্ষণের দিকে খুব ঝুঁকিয়া পড়াকে অমঙ্গল রূপ জ্ঞান করিয়াছে।[১]

বাংলার ভূপ্রকৃতি ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য অনাদিকাল ধরে মনোহরণ করে আসছে এদেশের অধিবাসীদের। শ্যামল শস্যক্ষেত্র, দিগন্তবিস্তৃত তৃণপ্রান্তর, জলতরঙ্গের ছন্দ তুলে বয়ে যাওয়া স্রোতস্বিনী, ষড়ঋতুর আশীর্বাদে ধন্য পল্লিপ্রকৃতি – এ সবই বাংলার অধিবাসীদের জীবনধারা ও মানসগঠনে রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। এই দেশের মানুষ একদিকে যেমন অনুকূল প্রকৃতির প্রভাবে উদার ও উষ্ণ হৃদয়সম্পন্ন; অন্যদিকে উদ্দাম সমুদ্রপ্রকৃতি তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে শত দুর্যোগে ভেঙে-না-পড়া ও হার-না-মানা আরেক সত্তারও। দক্ষিণ বাংলার সমুদ্র সন্নিহিত এ অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবেই গড়ে উঠেছে এখানকার জনজীবনধারা। প্রকৃতির কোমল এবং করাল উভয় রূপকেই ভালোবাসতে শিখেছে এ অঞ্চলের মানুষ। উপভোগ করতে শিখেছে প্রকৃতির বহুমাত্রিক রূপ। *আলমনগরের উপকথা* উপন্যাসের প্রারম্ভেই লেখক দক্ষিণ বাংলার সমুদ্র-উপকূলীয় অঞ্চলের প্রকৃতিঘনিষ্ঠ মানুষের প্রকৃতিনির্ভর জীবনের মৌল বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন –

> স্মরণাতীত কাল হইতে এই দেশ 'ধনে ধান্যে-পুষ্পে-ভরা' বলিয়া কীর্তিত হইয়া আসিয়াছে; ইহার ক্ষীরের মত মাটি, তরঙ্গ-চঞ্চল নদী ও বিল, গাঁ-এর সীমানায় সীমানায় বহমান শান্ত খাল-নালা এবং আকাশের উদার নীলিমার পরিবেশ ইহার অধিবাসীদের জীবন যোগাইয়াছে। তাহারাও বন্যা, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার ও বহিরাগত লোভী দস্যুর সহিত অপরাজেয় সংগ্রাম করিয়া সারা দেশের আহার জোগাইয়াছে; অন্ন-সন্ধানী দূরাগত অতিথিও আত্মীয়ের মর্যাদা লইয়া তাহাদের মাঝে বসতি করিয়াছে। কিন্তু নিজেদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার উপযোগী আহারের সংস্থান করিতে পারে নাই; বাদ সাধিয়াছে বন্যা, অজন্মা ও মারী-মন্বন্তর; ...অধিবাসীরা কৃষিজীবী, স্বভাবতই খরা ও পানির জন্য সেই মহা শক্তিমান বিধির, – যাহার ইঙ্গিতমাত্র সৃষ্টি কায়েম হয়, ধ্বংস, বান, তুফান, মহামারী শান্ত হয়। অমোঘ নিয়মে মৌসুমের পুঞ্জ মেঘ ধাইয়া আসিয়া জমিনে জমিনে পশলার পর পশলা নবজীবনের প্রাণ-সঞ্জীবনী বহাইয়া যায়, – করুণা নির্ভর। তাহাদের সরল হৃদয় নির্বিরোধ জীবনাকাঙ্ক্ষায় তাহা মানিয়া লয়;[২]

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *সমুদ্রবাসর*, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬, পুঁথিঘর, ঢাকা, পৃ. ১০-১১
[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *আলমনগরের উপকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

কাশবনের কন্যা উপন্যাসের হোসেন ভবিতব্যের কাছে হার না মানা আশাবাদী সংগ্রামশীল এক মানুষ। অভাবপীড়িত শ্রান্ত-ক্লান্ত দিনগুলোকেই সে জীবনের একমাত্র সত্য বলে মেনে নিতে নারাজ। শত দুঃখের মধ্যেও সে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় বেঁচে থাকার প্রেরণা পায়, সংগ্রাম করে। জীবন সম্পর্কে আশাবাদী হোসেন নিজের উদ্যম ও পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবনের সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। পুরানো বসতভিটাকে নতুন করে গড়ে তোলে। বাড়ির সামনে পুকুর সংস্কার করে সেই পুকুরের পাড়ে আম-কাঁঠাল-সুপারির বাগান করে সেখানকার আয় দিয়ে আস্তে আস্তে কয়েক বিঘা জমিও কিনতে সক্ষম হয় সে। তাছাড়া ক্ষেত, বাগানের কাজ না থাকলে হোসেন খেয়া পারাপার করেও উপার্জনের চেষ্টা করে। 'গাঙ্গ-এর দুর্ধর্ষ শক্তির' বিরুদ্ধে বৈঠার জোর আর কৌশল প্রয়োগ করে হোসেন সকল প্রতিকূলতা জয় করার চেষ্টা করে। 'খোলামেলা গাঙ্গে স্রোত আর বাতাস সবসময় একই মুখি হয় না।' এই কাজ রীতিমত কঠিন ও কষ্টসাধ্য হলেও সারাদিন নদীতে স্রোতের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত হোসেন বিশ্রাম নিতেও চায় না। সে মনে করে 'একবার ক্ষান্ত দিলেই তাহাকে আবার দুঃখ-কষ্টের বিবরে ঢুকিয়া পড়িতে হইবে।' এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কানু শিকদারের জীবনও সংগ্রামশীল। প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম করেই জীবনধারণ করতে হয় তাকে। সে কবিয়াল। গীত-গানের মধ্যেই সে দুনিয়ার তত্ত্বকথা অনুসন্ধানে প্রয়াসী। আত্মীয় পরিজনহীন অসহায় কানু শিকদার একসময় ছিল সচ্ছল পরিবারের সন্তান – যদিও এখন সহায়-সম্পত্তি হারিয়ে হতদরিদ্রের জীবন বেছে নিতে হয়েছে তাকে। সহজ-সরল কানু শিকদার পার্থিব প্রাপ্তির আশাকে জলাঞ্জলি দিয়ে গানবাজনার মধ্যেই শান্তি খোঁজে। কিন্তু এক পর্যায়ে তার জীবনবোধে পরিবর্তন আসে। ভাটি অঞ্চলে নতুন চর জাগার সংবাদ তার মনে নতুন আশার অনুরণন সৃষ্টি করে। শ্রমজীবী স্বপ্নবান বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে অজস্র প্রতিকূলতা ঠেলে নতুন জাগা চরে নতুন জীবন গড়ে তোলার প্রয়াস পায় সে বিপদ-সংকুল ভাটি অঞ্চলে যেখানে 'জীবনের সঙ্গে সর্বক্ষণ যুদ্ধ করতে হয়, এক হাতে ঠেকাইতে হয় রুষিয়া-ফুঁষিয়া ওঠা সমুদ্দর আর অন্য হাতে দৈত্য-দানবের মুষ্ঠির লাহান ঝড়-তুফানরে।' এর মধ্যেই সর্বহারা মানুষগুলো জীবনকে নতুন করে সাজানোর সংগ্রামে লিপ্ত হয়। নিজেদের দুর্বলতা আর অসহায়ত্ব সম্বন্ধে তারা পূর্ণমাত্রায় সচেতন হলেও অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামই তাদের একমাত্র পাথেয়।

জায়জঙ্গল উপন্যাসেও মানুষের প্রকৃতিনির্ভরতার চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষায় মানুষের প্রাণান্ত প্রয়াসের চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। জীবিকার প্রয়োজনে জঙ্গলভূমির বাসিন্দারা দিনমান অরণ্যলোকে বিচরণ করে। খাদ্য-সংগ্রহ, বাসস্থান-নির্মাণ ইত্যাদি নানা কাজে প্রকৃতিই তাদের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু সন্ধ্যার পর প্রকৃতিতে ভর করে রহস্যময় অনিশ্চয়তা। অন্ধকারের রাজত্বে পরিচিত অবয়বগুলোকেও অচেনা আর বিপদ-সংকুল মনে হয়। 'গাছ-পালা ঝোপঝাড়গুলিও নানা মূর্তিমান প্রাণীর রূপ লইয়া খাড়া হইয়া দাঁড়ায়; অতি পরিচিত কড়ই গাছটাকেও তখন একটা বিরাটাকার দৈত্য বলিয়া মনে হইতে পারে।' (জায়জঙ্গল, পৃ.১৮)। *জায়জঙ্গল* উপন্যাসটি বাংলাদেশের উপকূলীয় বনাঞ্চল সুন্দরবনের জনবিরল, শ্বাপদ-সংকুল জঙ্গলভূমিকে পটভূমি করে রচিত। লেখক এ উপন্যাসে সাগর মোহনায় গড়ে ওঠা জনবিরল 'জলজ এবং জঙ্গলাকীর্ণ' অরণ্যাঞ্চল এবং এ অঞ্চলের সংগ্রামমুখর তৃণমূল মানুষদের জীবনকাহিনী শিল্পসার্থক ভঙ্গিতে পরিবেশন করেছেন। এ অঞ্চলের বাসিন্দারা জঙ্গলের ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে জীবন বাঁচানোর কঠিন সংগ্রামে দৃঢ়প্রত্যয়ী। জীবনধারণে অনন্যোপায় না হলে হয়তো এভাবে বিপদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস তাদের হতো না। জীবনের ঘা খাওয়া, অসহায় এবং জীবিকার্জনের কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে এসব মানুষ জঙ্গলকে আশ্রয় করে জীবনে নতুন করে বাঁচার অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে। জঙ্গলে বসতি স্থাপন করা 'ফেরারী খুনী, জেল-পলাতক আসামী, রাজ্য-রাষ্ট্র ভাঙা-গড়ার অভিলাষী গোপন বিপ্লবী, লোকালয় হইতে পলাতক প্রণয়ী যুগল প্রভৃতিরাও এই জঙ্গলে ঢুকিয়া বহির্জগতের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নতুন জীবন গঠনের উদ্যোগী হয়।' সুন্দরবনের গহীন জঙ্গলে ছিটকে আসা এসব মানুষ জঙ্গল কেটে, বন্য-হিংস্র পশুপ্রাণীর সাথে লড়াই করে তাদেরকে হটিয়ে নিজেরা বসতি স্থাপন করেছে। তবে তাদেরকে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়তই সংগ্রাম করে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। আর সম্ভবত সেই কারণেই প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম এবং সতর্কতাই এখানকার মানুষদের জীবনের মূল অবলম্বন। উপকূলীয় বনাঞ্চল সুন্দরবন নানারকম উদ্ভিদ ও বন্য পশুপাখিতে ভরপুর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে অত্যন্ত মনোরম হলেও অঞ্চলটি মনুষ্যবসতির জন্য অনুপযোগী। লেখকের ভাষায় –

> প্রায় অয়নান্ত বৃত্ত অন্তর্গত আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ুর অনুকূল প্রভাবে এইখানে সংখ্যাহীন বিচিত্র জীবকোষ রূপাশ্রয়ের মহোৎসবে নানা প্রাণী ও উদ্ভিদ সমাকীর্ণ এক বিশিষ্ট ভুবন গড়িয়া তুলিয়াছে। নানারকম বিরাটাকার বৃক্ষ, ঘন ঘন

> বাঁশ-ঝাড়, অজস্রলতা ও গুল্ম, দশ-বারো হাত লম্বা হোগলা, গোলপাতা, নলখাগড়া, কাশ ও শণ বন আশ্চর্যরকম জীবনীশক্তি লইয়া স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে এই অরণ্যকে এক মহামহিম রূপ দিয়াছে।। নিচে লতা-পাতার নরম এবং জলজ আস্তরণ ফুঁড়িয়া-ওঠা তীক্ষ্ণ শীর্ষ অগণন উদ্ভিদ-অঙ্কুরের জন্য পা ফেলিবার ঠাঁই পাওয়াও অসম্ভব মনে হয়। উপরে আর্দ্র ও উষ্ণ বাতাস এবং ঘন ডাল-পালা ও পত্রাদির অন্তরালে প্রখর সূর্য একরকম ঢাকা পড়িয়াই থাকে। বাস্তবিকপক্ষে ঐ সূর্যের স্পর্শ পাইবার জন্য উদ্ভিদকূলের মধ্যে প্রতি-মুহূর্তে প্রতিযেগিতার গতি-প্রকৃতি এই অরণ্যের রূপকে আরো ফাঁপাইয়া তুলিয়াছে। অভ্যন্তরে প্রবেশ দুঃসাধ্য। জোয়ারের সময় কোনো কোনো অংশ থৈ থৈ পানিতে ভরিয়া যায়। এই পরিবেশে কেবল অজস্র রকম প্রাণীকূলই প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে তাহাদের বসতি করিয়া চলিয়াছে। প্রায় দৃষ্টিরও অগোচরে সূত্রাকৃতি জোঁক হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাটাকার বাঘ, কুমির এবং অজগরের আপন রাজত্ব এইখানে এখনও অব্যাহত।[১]

এ অঞ্চলের হিংস্র বন্য-প্রাণী এবং জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে সংগ্রামে মানুষকে প্রায়ই হার মানতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বৃহদাকার মাংসাশী প্রাণীর তুলনায় বোলতা, ভীমরুল ও মৌমাছির মতো ক্ষুদ্রকায় প্রাণীই অরণ্যাঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ অঞ্চলে চলার পথও দুর্গম। 'যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বন নৌকা বা তালগাছের গুঁড়ি চিরিয়া বানানো ডোঙা।' এই নৌকা বা ডিঙ্গি চালনার ক্ষেত্রেও কিছু বিশেষ কলা-কৌশল, নিয়ম-কানুন, সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে হয় –

> দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হইলে স্রোতের হিসাব খেয়াল রাখিয়া অগ্রসর হইতে হয়; নেহাৎ প্রয়োজনের সময় ডাঙ্গায় নামিয়া মোটা দড়ি বাঁধিয়া নৌকাগুলিকে কেবলমাত্র গায়ের জোরেই টানিয়া চলিতে হয়; কপাল প্রশস্ত হইলে এবং পাল বাতাসের ভর পাইলে এই পরিশ্রম কিছুটা লাগব হইয়া যায়। তবে ডাঙ্গায় নামিয়া 'গুন' টানাও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সম্ভব হইয়া ওঠে না।[২]

এ অঞ্চলে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে নিরাপদে পা ফেলা যায় বা হাত দেয়া যায়। অরণ্য-প্রকৃতি এবং সেখানে বসবাসকারী প্রাণিকুল যেন পরস্পরের যোগসাজশে 'মানুষের পদসঞ্চারকে ঠেকাইবার জন্য সুনিপুণ যুদ্ধ-কৌশলে বাহিনীর পর বাহিনী উদ্যত করিয়া রাখিয়াছে। (*জায়জঙ্গল*, পৃ. ৭)। এ কারণেই এ অঞ্চলে মনুষ্যবসতি খুব অল্প। শ্বাপদসংকুল এই পরিবেশে জীবনযাত্রা কষ্টকর জেনেও কিছু সহায়-সম্বলহীন, ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষ এখানে বসতি স্থাপন করেছে। পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *জায়জঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

অদম্য স্পৃহা না থাকলে কোনো মানুষের পক্ষে হয়তো এখানে বসবাস করা সম্ভব হতো না। এ প্রসঙ্গে লেখকের ভাষ্য –'আধি-ব্যাধি, ঝড়-বন্যা, অপঘাত-অপমৃত্যু এবং সহযোগী মানুষের সঙ্গেও নিঃশব্দ বিক্রমে লড়াই করিয়া এই জনগোষ্ঠী কেবল টিকিয়া থাকিতেই নয়, একান্ত কাম্য মৃত্তিকার সঙ্গে নিজ সম্পর্ক বিস্তারের দুরূহ সাধনাতে অটল অবিচল থাকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে।' (জায়জঙ্গল, পৃ. ২)। জয়নাল শেখ তাদেরই একজন। জীবনযুদ্ধে ছিটকে আসা এ অঞ্চলের বিচিত্র মানুষের মত সেও সুন্দরী গাছ এবং তালপাতার বনে উদয়াস্ত খেটে জীবনের প্রতি একটা গভীর ক্ষোভ এবং আক্রোশ নিয়ে জীবনযুদ্ধে লিপ্ত আছে। ভাটি-অঞ্চলে জীবনধারণে অনন্যোপায় হয়ে সাত বছর পূর্বে এ অঞ্চলের একদল কাঠুরের সঙ্গে ঘটনাক্রমে এসে এখানে বসতি স্থাপন করে জয়নাল শেখ। আশ্রয়দাতা কাঠুরের কন্যাকে বিয়ে করে সংসার গড়ে তোলে সে। পরবর্তীকালে একমাত্র বোন সাজুকেও নিয়ে আসে এ অঞ্চলে। স্ত্রী হালিমন ও বোন সাজুকে নিয়ে সুখে দুঃখে কেটে যায় জয়নাল শেখের সংসার। লালু খাঁ, তালেব, মিকু – এদের মতোই জোতদার জলিল মিয়ার নিয়োগকৃত শ্রমিক সে। তাদের জীবিকার প্রধান উপায় মূলত বৃক্ষ। জোতদার-মহাজনদের নির্দেশে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে, হোগলা বা গোলপাতা কেটে যে মজুরি পায় তা তাদের পরিশ্রমের তুলনায় অতি নগণ্য। প্রতিকূল পরিবেশে তাদের সে কষ্টসাধ্য কাজের বর্ণনা লেখক দিয়েছেন এভাবে –

> প্রায় বুকসমান জলঠাঁইতে নামিয়া গোলপাতা কাটার কাজ হয়ত এমন কিছু মুশকিলের মনে হইবে না। কিন্তু পানিতে লম্বা লম্বা কালো রঙের জোঁক আছে, নানারকম বিষাক্ত সাপের উপদ্রব আছে, আছে বিষাক্ত কাঁটাওয়ালা মাছ আর পায়ের তলায় পিছল পচা ডালপাতার আস্তরণ। তাছাড়া বোলতা এবং ভীমরুলের চাকও অজস্র। এইসব এড়াইয়া গোড়া হইতে পাতাগুলি ডাঁটসহ কাটিয়া ডাঙা পর্যন্ত ভাসাইয়া টানিয়া আনাও সহজসাধ্য কাজ নয়। সময় সময় স্রোতের দৌরাত্ম্যও আছে।[১]

বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী ভূখণ্ড সুমদ্রের গর্ভ থেকেই জাত। এ কারণে দেশের উত্তরাঞ্চল বা অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে এ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। সমুদ্রের দীর্ঘ সান্নিধ্যে থাকার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতিতে এক ব্যতিক্রমী সৌন্দর্য লক্ষ করা যায়। *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসে বিধৃত জনাঞ্চলের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন–

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *সমুদ্রবাসর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

> সমুদ্রকূলবর্তী সেই সমতল ভূমি ঘন জঙ্গলে আকীর্ণ। নানা ধরনের শ্বাপদসঙ্কুল হইলেও লোকালয়গুলি আরও গভীরে। কোন উপকূলবর্তী বালুভরা তটভূমি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া ঘন তালতমাল নারিকেল সুপারি বনের প্রহরীর কাছে থাকিয়া গিয়াছে। সম্মুখে বিশাল সমুদ্র ক্রমাগত রুখিয়া ফুঁসিয়া ওঠা জীবজগৎকে বক্ষে লইয়া কখনও শান্ত, কখনও উন্মত্ত হইয়া প্রায় লোকালয় পর্যন্ত ধাওয়া করিয়া আসে। সেই কারণেই কাছাকাছি লোকালয় বসতিও নাই।[১]

বস্তুত প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা অনেক সংগ্রামশীল। প্রতিনিয়ত মনুষ্য আর প্রকৃতিসৃষ্ট নানা দুর্যোগের সঙ্গে সংগ্রাম করে এদের টিকে থাকতে হয়। তবুও এসব মানুষ স্বপ্ন দেখে এক উজ্জ্বল আগামীর, কিন্তু হাজার প্রতিকূলতার বাধা ডিঙিয়ে কীভাবে সেই সোনালি ভবিষ্যতের কাছে পৌঁছানো যাবে, তারা জানে না। মনু মল্লিক বা সখানাথ থেকে শুরু করে সুজাত আলী কিংবা করিমন – এ উপন্যাসের সব চরিত্রই নিয়তির হাতে বন্দি। এজন্যই স্বপ্নপূরণের হাতছানি পেয়েও মুহূর্তেই আবার স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় কাতর হতে হয় তাদের।

এ উপন্যাসের লাঠিয়াল সর্দার ইউসুফ সুজার পুত্র সুজাত আলীকে দেখা যায় দারিদ্র্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষায় নতুন জাগা চর ক্ষীরসায়রকে আবাদযোগ্য করার পরিকল্পনা নিতে। তার সঙ্গে যোগ দেয় শামু, তালেব, চান্দু, গনু, ইসাহাকসহ একদল স্বপ্নপিয়াসী দরিদ্র মানুষ। সঙ্গে থাকে করিমন এবং তার স্বামী সিকুও। মুজফ্ফর মিঞার কাছ থেকে কিনে নেওয়া ক্ষীরসায়রকে আবাদযোগ্য করার সংকল্প নিয়ে সুজাত আলী দলবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়। নলখাগড়া, হোগলার বন এবং নানাপ্রকার 'পোক-জোঁক, বোলতা, ভীমরুল, সাপ-খোপের রাজ্যে' মনুষ্যবসতি স্থাপন সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। সেই ভয়ঙ্কর জনবিরল দ্বীপের বুনো জঙ্গল এবং হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের উপদ্রবের চিত্র এ উপন্যাসের আরেক বাস্তবতাকে উন্মোচন করে –

> ক. এদিকে সেদিকে গর্তে থানায় এত্তো এত্তো লকলকানিয়া কালা জোঁক। আর ঘাসের ডগায় গড়ায় চীনা। ... পায়ের নিচের কাদা পিছল, নানা রকম কীট-পতঙ্গ সরীসৃপের অভাব নাই। কেউ দেখে পাখির বাসা, কেউবা দেখে

[১] প্রাগুক্ত, পৃ.১১

কচ্ছপের ডিম। একটা বুনা বেত লতার কাঁটাভরা লকলক করা অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও আঁচড়ে পিঠের একটা দিক বেশ ছাড়িয়া গেল চান্দুর।[১]

খ. সুজাত আলী একটু খোলামেলা জলা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে মনে হইল কে যেন তাহার পায়ে একটা জোর হ্যাঁচকা টান দিয়া জলাভূমির উপর দিয়া হ্যাঁচড়াইয়া ছুটিতে শুরু করিয়াছে। একটু ঠাহর করিয়া দেখামাত্র বুঝিতে পারিল পাতাপানায় ভরা জলার মধ্যেই তাহাকে টানিয়া ছুট দিয়াছে একটা কুমির।[২]

জীবিকার তাড়নায় দিশেহারা মানুষগুলোর অমানুষিক পরিশ্রমে ক্ষীরসায়রের মাটি আবাদযোগ্য হয়ে উঠে। জমিতে চাষ হয় ধান। তৈরি হয় এক নতুন সমাজ। কিন্তু প্রকৃতির রুদ্ররোষ তাদের সকল স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দেয়। সর্বব্যাপী এসব প্রতিবন্ধকতা আর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চাইলেও প্রবল-প্রতাপ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বসের কবলে সমুদ্রগর্ভ থেকে জাত ক্ষীরসায়র আবার সমুদ্রগর্ভেই হারিয়ে যায়। এ উপন্যাসের শেষ পর্বেও দেখা যায়, ক্ষীরসায়র নামে সমুদ্রের বুকে জেগে ওঠা যে চরকে আশ্রয় করে তারা নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে, একদিন সেই চর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় প্রলয়ংকরী ঝড়ের তাণ্ডবে। সেই প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিহরণ জাগানো চিত্র নিম্নরূপ –

সুজাত আলী হঠাৎ অনুভব করিল সে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়া শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। কোথাও কোনও কিছু আঁকড়াইয়া ধরিবার সুযোগও সে পাইল না। কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে সে ক্রমাগত পাক খাইয়া শব্দহীন দৃশ্যহীন অনুভূতিহীন এক ঘোর অন্ধকারের মধ্যে হারাইয়া গেল। ঘূর্ণির সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিল পাহাড়ের মত উঁচু উঁচু ঢেউ, যেন তাহারই চেলা চামুণ্ডা দলবল, নানারকম গর্জন ও কোলাহল তুলিয়া তাহারা মত্ত হইল নিষ্ঠুর ধ্বংসযজ্ঞে। আর কেউই বা কোনও কিছুই তাহাদের আক্রোশ হইতে আত্মরক্ষার সুযোগ পাইল না।[৩]

নবান্ন উপন্যাসে 'রূপার ঝোর' নামক জনপদের কাহিনি বিধৃত হয়েছে। এটি দক্ষিণ পূর্ব বাংলা তথা বরিশাল অঞ্চলের একটি জনপদ। কালের পরিক্রমায় এ অঞ্চলের জনজীবনের নানা পরিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরেছেন লেখক। রূপার ঝোর গ্রামের জমিদার বাড়ির পেয়াদা গগন শেখের পুত্র দয়াল চৌকিদারের জবানিতে ফুটে উঠেছে 'রূপার ঝোর'-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নানা বর্ণনা। লেখকের ভাষায় – যার

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-১৯৫
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫

'ঝলমলে রূপ এখনো চোখ ঝলসে দেয়।' তাছাড়া দয়াল চৌকিদারের চোখে এখনো ভেসে উঠে একসময় এ জনপদে কী ছিলো আর এখন কী নেই। বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবহমান জলস্রোত যেখানে নদীতে গিয়ে মিশেছে তার কাছাকাছি জমিদারদের পাকা কাছারি বাড়ির অদূরে বিশাল এক বটবৃক্ষকে ঘিরে এখানে বসত জমজমাট এক হাট, যেখানে বহু দূর দূরান্ত থেকে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এসে হাজির হতেন খদ্দের-ব্যাপারীরা। বর্তমানে কালের বিবর্তনে হাটসহ পার্শ্ববর্তী সমস্ত জায়গা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। রূপারঝোরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই জনপদের অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা ও কর্মব্যস্ততা একসময় কেমন ছিল তা লেখকের বর্ণনায় চিত্রায়িত হয়েছে –

> গাঙে বড় বড় পাল উড়িয়ে মহাজনী নৌকাগুলির গতিবিধি তো নিরন্তর, আরো ছিল সাহেব কোম্পানির বিরাট বিরাট দুই-তিন তলা জাহাজগুলোর আনাগোনা। সেই জাহাজের দুই পাশের ডানার আলোড়নে গাঙও তাড়া খাওয়া দৈত্য দানবের মতো পাড়ে আছড়ে লুকিয়ে পড়বার পথ খুঁজতো। আস্তে আস্তে জাহাজ এসে ভিড়তো খাল আর গাঙের কোণাকুণি জায়গাটাতে। তখন সামাল সামাল রব পড়ে যেত খালের মুখে বাঁধা নৌকাগুলোর মাঝিমাল্লাদের মধ্যে। সেখানে সারা ঘাটের লোক ভেঙে পড়ে দেখতে যেত কে নামছে উঠছে।[১]

প্রকৃতি ও মানুষের যুগলবন্দির একটি বৈশিষ্ট্য দুয়ের মধ্যে নিরন্তন টানাপড়েন। নদী তীরবর্তী অন্যান্য এলাকার মতো রূপার ঝোরের বাসিন্দারাও স্মরণাতীতকাল ধরে প্রকৃতির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত। রূপারঝোর নামক যে জনপদকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাসের কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে সে রূপার ঝোর-এর অতীত এবং বর্তমান অবস্থার তুলনা প্রতিতুলনার মধ্যেই উদ্ভাসিত হয় এ অঞ্চলের মানুষদের বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের ইতিহাস। নদী-সমুদ্র একদিকে যেমন তার ঐশ্বর্য বিলিয়ে দেয় আবার তার অতল গর্ভেও টেনে নেয়– এটাই যেন এ অঞ্চলের ভবিতব্য। প্রকৃতি যেমন তাদের জীবন-জীবিকার উৎস, তেমনি নানা সময়ে প্রকৃতির রুদ্র রূপের কারণে মানুষের জীবন হুমকির মুখেও পড়ে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা বা নদীভাঙনের মতো বিপদকে সঙ্গী করেই জীবনতরী ভাসিয়ে নেয় রূপার ঝোরের মানুষ। এ অঞ্চলের মানুষদের প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামমুখর জীবনচিত্র ও প্রকৃতি বিধৃত হয়েছে এভাবে– 'কেবল ঐ গাঙই নয়, দক্ষিণ থেকে হঠাৎ ফুঁসে আসা দানবের মতো বড় তুফান কতোবার ছারখার করে দিয়ে গেছে সব কিছু, তবু

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *নবান্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০

মানুষ শামুকের মতো পাড়ের মাটি আঁকড়ে টিঁকে থাকতে চেয়েছে, হার মানতে চায়নি প্রতিকূল ভাগ্য অথবা ভবিতব্যের কাছে।' (*নবান্ন*, পৃ. ৯)

পেশা ও জীবিকা

বাংলাদেশে গ্রামীণ মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধান উৎস ভূমি, যা মায়ের মমতায় আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে সবাইকে আগলে রেখেছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের পলিমাটি দিয়ে গড়া সমতলভূমি কৃষির জন্য অত্যন্ত অনুকূল। স্বভাবতই, কৃষিকে আশ্রয় করেই জীবিকার অবলম্বন খুঁজেছে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। আবহমানকালব্যাপী 'আমাদের প্রধান জীবনোপায়ই ছিল কৃষি এবং ছোট ছোট গৃহশিল্প। কৃষি একান্তই ভূমিনির্ভর। ছোট ছোট গৃহ শিল্পে যাঁহারা নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহারাও প্রধানত না হউন অংশত কৃষকই এবং তাঁহারাও সেইজন্যই একান্ত ভূমিসংলগ্ন জীবনেই অভ্যস্ত ছিলেন। কৃষিভূমি তো সমস্তই গ্রামে; বস্তুত কৃষিভূমিকে আশ্রয় করিয়াই তো গ্রামগুলি গড়িয়া উঠিত।'[১]

সামন্ত সমাজে এদেশের কৃষিজীবীদের অধিকাংশই ছিল বর্গাচাষি; সামন্তপ্রভু বা অবস্থাপন্ন মানুষদের জমি চাষ করে এসব প্রান্তিক চাষি জীবননির্বাহ করে। বাংলার গ্রামাঞ্চলে প্রধানত দুই ধরনের কৃষক দেখতে পাওয়া যেত – প্রান্তিক বা দরিদ্র শ্রেণির কৃষক, যাদের নিজস্ব কোনো জমি নেই বা থাকলেও নামমাত্র। এরা অন্যের জমিতে দিনমজুর বা বর্গাচাষি হিসেবে শ্রমদানের মাধ্যমে কৃষিকাজে ব্যাপৃত থাকে। অন্যদিকে আছে সম্পন্ন কৃষক, যারা প্রচুর কৃষিজমির মালিক, যা উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা ক্রয়ের মাধ্যমে তারা সংগ্রহ করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এইচ. টি. কোলব্রুক বাংলার কৃষক সম্প্রয়দায়কে তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছিলেন – (ক) জমির মালিক কৃষক যিনি নিজেই চাষাবাদকারী, (খ) জমির মালিক কৃষক উচ্চহারে মুনাফার ভিত্তিতে বা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক শর্তে অন্যকে জমি চাষ করতে দিত– আধিয়ার, বর্গাদার বা ভাগচাষী ব্যবস্থা। (গ) জমির মালিক কৃষি শ্রমিক রেখে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জমি চাষের ব্যবস্থা করত। কোলব্রুক বাংলাদেশে ভাগচাষ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই জমিদার ও কৃষকের মাঝখানে জমির স্বত্বভোগী শ্রেণির প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। বর্গাদার বা

[১] দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ট্রাইবাল সমাজের অসমাপ্ত বিলোপ: গণপতি, লোকায়ত দর্শন* (২য় খণ্ড)। প্রথম প্রকাশ, ২০০০, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ২১

ভাগচাষিকে সর্বোচ্চহারে কর দিতে হতো বলে তাদের দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ততা অন্যান্য কৃষকদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল।[১] এই কৃষিব্যবস্থার উৎপত্তি এদেশের ভূমিব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। খাজনা আদায়ের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে জমিদারশ্রেণি যে প্রান্তিক কৃষকদের নানাভাবে উৎপীড়ন করত, তাতে সন্দেহ নেই। 'কৃষক শ্রম প্রদানকারী হলেও জমিতে তার অধিকার ছিল না। যতদিন সে খাজনা দিতে পেরেছে ততদিন তার চাষ করার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু এর ব্যত্যয় ঘটলে সে অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। অথচ কৃষকের ওপরে ছিল একাধিক শ্রেণি যারা প্রদত্ত খাজনার অংশ ভোগ করে থাকত। এভাবে কৃষকের উদ্বৃত্তই শুধু অপসৃত হত না; কখনও কখনও তার বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপকরণেও জমিদার ও সংশ্লিষ্ট শ্রেণি ভাগ বসাত। এভাবে কৃষক নিগ্রহের এক গভীর চক্রে নিপতিত হয়।'[২] ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই, ভাগচাষিরা প্রথম দিকে পুরোপুরি ভূমিহীন ছিলেন না। তাঁদের নিজেদের অধিকারে সামান্য হলেও কৃষিজমি ছিল। কিন্তু ঋণের দায়ে জমি হারিয়ে তাঁরা ক্রমশই স্বত্বহীন ভাগচাষী ও দিনমজুরে পরিণত হন।[৩] 'বাংলার দক্ষিণ উপকূলীয় জেলাসমূহে মধ্যস্বত্ব-সমস্যা ছিল সবচাইতে বেশি প্রকট। এর কারণ অনেক। তবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কারণ জঙ্গলাকীর্ণ উপকূল অঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারণ পদ্ধতি। উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া চলে মধ্যস্বত্বাধিকারীর মাধ্যমে।'[৪] পরবর্তীকালে পাকিস্তান আমলে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার করা হলেও বৃহৎ ভূম্যধিকারী গোষ্ঠীগুলোর রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে গ্রামীণ কৃষিজমির ওপর প্রান্তিক কৃষকদের অধিকার কখনোই জোরদার হতে পারেনি।

প্রকৃতির মায়াজালে জড়িয়ে-পড়া সমুদ্র-তীরবর্তী মানুষগুলো প্রকৃতির দান গ্রহণ করেই বেঁচে থাকে। তাদের দৈনন্দিন জীবনজীবিকার রসদও সংগৃহীত হয় প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকেই। সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামবাংলার পেশা ও জীবিকার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটলেও বিশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্তও কৃষিই ছিল জীবিকার প্রধানতম অবলম্বন। সারা বছর পরিশ্রম করে জমিতে উৎপন্ন শস্যের একটি অংশ নিজে ব্যবহারের জন্য

---

[১] Colebrook, H. T. 'Remarks on the husbandry and internal commerce ob Bengal'. p. 12. ('বাংলার আর্থিক ইতিহাস: অষ্টাদশ শতাব্দী', সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় থেকে গৃহীত)

[২] মনিরুল ইসলাম খান, 'কৃষক সমাজে ভূমি ব্যবস্থা পুঁজি ও বাজার সম্পর্ক', *বাংলাদেশের গ্রাম* (সম্পাদনা: কাজী তোবারক হোসেন ও মুহাম্মদ হাসান ইমাম)। প্রথম প্রকাশ, সামাজিক বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৯৪, পৃ. ৫

[৩] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গ্রামবাংলা: উনিশ শতক', *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩

[৪] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, প্রথম প্রকাশ, চয়নিকা, ঢাকা ২০০২, পৃ. ১৫৭

রেখে বাকিটা বিক্রি করে পরিবারের সমস্ত চাহিদা পূরণ করে সাধারণ মানুষ। সন্তান-সন্ততির পড়াশোনা, চিকিৎসা, উৎসব-আয়োজন ইত্যাদি সমস্ত কাজই করা হয় কৃষিপণ্য বিক্রির মাধ্যমে। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাসে দেখা যায়, কৃষির পাশাপাশি এ অঞ্চলের প্রধান পেশা ছিল মৎস্য আহরণ, নৌকাচালনা, কাঠ কাটা, মধু সংগ্রহ, লাঠিয়ালবৃত্তি প্রভৃতি। বেদে, কামার-কুমার, বৈদ্য, ওঝা-ফকির, কবিয়াল-বয়াতি ইত্যাদি নানা শ্রেণি পেশার মানুষের বসতিও ছিল এ-অঞ্চলে। বেশির ভাগ পেশাই ছিল বংশানুক্রমিক; যেমন: জেলের সন্তান জেলে, আর কুমারের সন্তান কুমার। পরবর্তীকালে নগরায়ণ, শিল্পবিস্তার, শিক্ষার প্রসারসহ নানা কারণে পেশাগত ক্ষেত্রে আসে নানা বৈচিত্র্য। কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে অন্যান্য পেশা, বিশেষত অফিস-আদালতে চাকুরির মুখাপেক্ষী হয় অনেকে।

স্মরণাতীতকাল ধরেই বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মূল পেশা কৃষি। ব্যাপকসংখ্যক মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কৃষিনির্ভরতার কারণে এদেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি সবই কৃষিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। লোকজ সংস্কৃতির ধারাগুলোকেও পরিপুষ্ট করে তুলেছে কৃষিনির্ভর জীবনব্যবস্থা। এদেশের কৃষকদের জীবন সংগ্রামমুখর। দেশের মানুষের মুখে খাবার তুলে দেবার কঠিন দায়িত্বটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেও সম্পদলোলুপ সামন্ত প্রভু, মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া, ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদ এবং স্থানীয় শোষকগোষ্ঠী – সবার হাতে নির্যাতিত হতে হয়েছে কৃষকদের। ফলে জীবনের সমস্ত আনন্দ হারিয়ে কেবল অস্তিত্ব রক্ষার কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়েছে কৃষকদের। গবেষকের মন্তব্য –

> বাংলার কৃষকের চাহিদা খুবই কম। কিছু খাদ্য, কিছু বস্ত্র, কিছু তৈজসপত্র, একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই, কয়েকটা হালের বলদ এবং কিছু চাষের সরঞ্জাম – এই হচ্ছে তার প্রয়োজন। ... সে তার জমিকে ভালোবাসে, পরিবার-পরিজনকে ভালোবাসে এবং অপুষ্ট ও অলাভজনক হওয়া সত্ত্বেও তার গোরুগুলোকে ভালোবাসে। পল্লিজীবনে জমিদারও মহাজনের শোষণমূলক ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও বাংলার কৃষক এমনকি তাদেরও ভালোবাসে। অথচ দুঃখের কথা এই যে, এহেন কৃষকের ওপর অহরহ এমন বিপদ আসে, যাতে তার মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। ... অভাব তার নিত্যসঙ্গী। দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করেও সে খরা, অনাবৃষ্টি আর অতিবৃষ্টির বিপাকে প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে।[১]

[১] এম. আজিজুল হক, *বাংলার কৃষক*, অনুবাদ: ওসমান গনি, ঢাকা: ২০১৬, দিব্যপ্রকাশ, পৃ. ৫০

আলমনগরের উপকথা উপন্যাসে প্রান্তিক কৃষকদের দারিদ্র্যজীর্ণ জীবনের নিখুঁত বর্ণনা আছে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রভাব, কলকারখানার বিস্তার ইত্যাদির কারণে পল্লি অঞ্চলের অনেক কৃষক কৃষিকাজ বাদ দিয়ে কারখানায় চাকরি নেয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষিজমির ক্রমহ্রাসমানতা, উন্নত কৃষিপদ্ধতি গ্রহণে কৃষকদের অনিচ্ছা ইত্যাদি কারণে কৃষির উৎপাদনও ক্রমশ নিম্নমুখী। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৃষিজ পণ্য বণ্টনব্যবস্থার দুর্বলতা, ধনিকশ্রেণির শোষণ ইত্যাদি। এ উপলব্ধি থেকেই সাধারণ মানুষের বঞ্চনার অন্যতম উৎসটি চিহ্নিত করতে পারে দরিদ্র মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল জমিদারনন্দন আলমগীর – 'উৎপাদন ও বণ্টনের অসম-ব্যবস্থা সারা দুনিয়ার মেহনতী মানুষের দুঃখমোচনের প্রধান অন্তরায়।' করীম মোড়লের সাথে আলাপচারিতার সময় সামন্তশ্রেণির একজন হয়েও অকপট সরলতায় বাংলার কৃষক সমাজের দুর্দশা আর বঞ্চনার বিবরণ দেয় আলমগীর –

> মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, জোঁকের কামড় খেয়ে, বৃষ্টিতে পুড়ে তোমরা জমি চাষ করেছো, বন্যার সাথে লড়াই করে, ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে ভুগে ফসল ফলিয়েছো। তারপর সেই ফসল নিজেরা উপোসী থেকে আমাদেরই ঘরে এনে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছো। আমরা সে ফসল বিনাশ্রমে আত্মসাৎ করেছি, খাজনা নিয়েছি, না দিতে পারলে ঘরবাড়ি জমিজমা নীলাম করে তোমাদের মফেজের মতোই উন্মাদ – সর্বহারা করেছি।[১]

সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উজ্জীবিত আলমগীর স্বপ্ন দেখে এমন এক ব্যবস্থার, যেখানে 'যার লাঙল, তারই হবে জমি। সকলের হবে সমান অধিকার।' কিন্তু পুঁজিবাদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার সামনে ন্যায়ভিত্তিক সেই সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা যে সহজ হবে না সেটি অন্যদের মতো আলমগীরও ঠিকই অনুধাবন করে।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের উপন্যাসে সমুদ্র-উপকূলবর্তী এলাকার কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবনের নানা পালাবদল, সংকট ও সম্ভাবনা, তাদের প্রাত্যহিক চালচিত্র সবই নানারূপে চিত্রায়িত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসে বিধৃত কালপর্বে অধিকাংশ কৃষককে বর্গাচাষি হিসেবেই জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে এবং ভূস্বামীর পাওনা পরিশোধ করার পর তাদের ভাগে আর তেমন কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। শোষকশ্রেণির এই অত্যাচারে সীমাহীন ক্ষোভে দগ্ধ হওয়া ছাড়া যেন আর কিছুই করার ছিল না বঞ্চিত কৃষকদের। প্রকৃতির বিরূপতা আর নানামুখী বঞ্চনা উপেক্ষা করেই মাঠে মাঠে ধান ফলানোর সাধনায় লিপ্ত হয় বাংলার কৃষক

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *আলমনগরের উপকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৩-১৬৬

সমাজ। কিন্তু বহুমাত্রিক সমস্যার কারণে সেই কৃষিকাজও ক্রমশই কঠিন এক বৃত্তি হয়ে উঠে। *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসে দেখা যায় সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের অনেকে পিতৃ-পিতামহের পেশা ছেড়ে সোনালি শস্যের আকর্ষণে কৃষিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠে। লাঠিয়াল ইউসুফ সুজার পুত্র সুজাত আলী পৈতৃক পেশা পরিত্যাগ করে মুজফ্ফর মিঞার কাছ থেকে 'ক্ষীরসায়র' নামক নতুন চরের ইজারা নিয়ে বেছে নেয় কৃষকের জীবন। সুজাত আলী, নুরু, চান্দু, তালেব আলী-র মতো কয়েকজন সমমনা প্রান্তিক কৃষককে নিয়ে সে ক্ষীরসায়রে কৃষিকাজে ব্যাপৃত হয়। শ্বাপদ-সংকুল প্রতিকূল পরিবেশের সমস্ত বিপদ-বাধা অগ্রাহ্য করে ফসল ফলানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় এসব কৃষিজীবী মানুষ। অচিরেই নানারকম ধান, বিচিত্র গাছ-গাছালি ও ফুল-ফলের সমারোহে ভরে ওঠে ক্ষীরসায়র। বীজতলা তৈরি, নানারকম ধানের বীজ সংগ্রহ, সেই বীজধানকে পানিতে ভিজিয়ে রেখে ফের চারা গজানোর পর ক্ষেতে রোপণ করার মতো যাবতীয় কাজে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরিশ্রম করে সবাই। ক্ষেতে প্রথম লাঙল দেয়া, ধান বোনা, নিড়ানি দেয়া থেকে শুরু করে ধান কাটা পর্যন্ত সকল কাজে যূথবদ্ধ মানসিকতা নিয়ে অংশগ্রহণ করে তারা। কাজের মধ্যেই তখন সৃষ্টি হয় উৎসবের আবহ –

> ধান কাটিতে নামার আগে সকলের মনেই উৎসাহ-উদ্দীপনা, নানা প্রত্যাশা, এরকম উত্তেজনায় সেই রাত্রে অনেকেরই ঘুম আসিতেছিল না। সুজাত আলী বয়াতিকে ডাকিয়া একটা পুঁথি পড়ার আসর বসাইল বটে তাহার মাচানে, কিন্তু মন নিবিষ্ট রহিল নানা ভাবনায়। পূবের আকাশ ফর্সা হইয়া উঠিতে না উঠিতে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল চতুর্দিক। একটা উৎসবের যথাযোগ্য ভাগীদার হইবার জন্য সকলেই অধীর অস্থির। [১]

মাঠ থেকে ধান সংগ্রহ করার পরও আরও অনেক কাজ থেকে যায়। কিন্তু এই পরিশ্রমকে কোনো পরিশ্রমই মনে হয় না কৃষকদের কাছে। আসন্ন প্রাপ্তির আনন্দে ধান মাড়াইসহ যাবতীয় কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দেয় তারা। কাজের ক্লান্তি দূর করার জন্য ডেকে আনা হয় বসুয়া বয়াতিকে। বয়াতির মনোমুগ্ধকর গানের তালে তালে কাজ চলে ক্লান্তিহীনভাবে। কিন্তু কঠোর পরিশ্রমে উৎপাদিত ধান ঘরে তোলার সময়ই আসে অপ্রত্যাশিত বাধা। গ্রাম্য জোতদার মুজফ্ফর মিঞা ছলনার আশ্রয় নিয়ে চেষ্টা করে দরিদ্র মানুষগুলোর পরিশ্রমের এই ফসলকে হস্তগত করার। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে ডাকাতি করে সমস্ত ধান নিয়ে যায় সে, তার বশংবদদের প্রতিহত করতে গিয়ে প্রাণ হারায় নিরীহ কৃষক গনু। ভাগ্যহত কৃষকদের দীর্ঘ বঞ্চনার

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *সমুদ্রবাসর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

তালিকায় এভাবেই যুক্ত হয় আরেকটি ঘটনা – সম্পদলোভী জোতদারের কাছে যা সামান্য ব্যাপার হলেও অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত দরিদ্র কৃষকদের কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে সমুদ্র-উপকূলবর্তী এলাকার কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবনের নানা পালাবদল, সংকট ও সম্ভাবনা, তাদের প্রাত্যহিকের চালচিত্র সবই নানা রূপে চিত্রায়িত হয়েছে। কৃষিজমির মালিকানা এবং জীবনযাত্রার মানের বিচারে গ্রামীণ কৃষকসমাজ কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত। এদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অবস্থাপন্ন হলেও সিংহভাগই ভূমিহীন ও প্রান্তিক। জমিদারদের বর্গাচাষি হিসেবেই জীবন অতিবাহিত করতে হয় তাদের এবং জমিদারের পাওনা পরিশোধ করার পর তাদের ভাগে আর তেমন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। মুখে কৃষকদের উদ্দেশে ভালো ভালো কথা বললেও বস্তুত তাঁদেরকে উপরে ওঠার সিঁড়ি হিসেবেই ব্যবহার করে শোষক শ্রেণির প্রতিভূরা। কথাসর্বস্ব বিবেকহীন এসব 'গুরু মহাজন'-এর স্বরূপ ফুটে উঠেছে *নবান্ন* উপন্যাসে–

> এক এক ঘাঁটে ডিঙি বাঁধেন, যা কিছু চোখে পড়ে দু'হাতে লোটেন আর গলা উঁচিয়ে এদেকি-সেদিক ঘুরে ওয়াজ করেন – চাষী ভাইসব দেশের উন্নতি নির্ভর করছে আপনাদের উপর। আরো, আরো বেশি ফসল ফলান। আগামী বছরে দেখতে চাই আপনাদের এই এলাকার ফসল দু'গুণ হয়েছে।[১]

'গুরু-মহাজনদের' এই ভণ্ডামি শোষিত-বঞ্চিত মানুষদের গভীর অসন্তোষের কারণ হলেও করার কিছু নেই। কেবল সীমাহীন ক্ষোভে দগ্ধই হতে পারেন তাঁরা। যেমন হয়েছেন গফুর খাঁ নামে এক প্রান্তিক কৃষক। দয়াল চৌকিদারের কাছে মনের চাপা ক্ষোভ এভাবেই উগরে দিয়েছেন তিনি –

> নেহায়েত নসীবের ফের না হলে কি ওনাদের মুখ থেকে ওসব কথা শুনতে হয়। আমাদর গায়ের রক্ত পানি করে মহাজনদের হাতে তুলে দিই, আর তিনিরা সব বালাখানার মৌজে থাকেন! চৌকিদার সাব, ইচ্ছে করে ঐ ব্যাটারে নৌকা শুদ্ধ উলটে ঐ গাঙে ডুবিয়ে দিই![২]

উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ফসল ফলায় কৃষক। জলহীন শুষ্ক ভূমি, প্রকৃতির বিরূপতা আর নানামুখী বঞ্চনার কারণে কৃষিকাজ যে ক্রমশই কঠিন এক বৃত্তি হয়ে উঠেছে সেটি তাদের চেয়ে ভালো আর কে বোঝে!

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *নবান্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
[২] প্রাগুক্ত।

বাংলার কৃষকদের কঠিন এই সংকট কৃষিজীবী সফদার আলীর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে *নবান্ন* উপন্যাসে 'কী ফল আছে এখন কৃষিকাজে? পারে আমাদের মতো লোকেরা তার খাই মেটাতে? উৎপাদন করো, উৎপাদন করো', কিন্তু –

> তার যথাযোগ্য উপায়টা কী? ভালো বীজ চাই, সার চাই, তার জন্য ওৎ পেতে আছে বেপারীরা। ফলনের দিকে চোখ রাখছে চোর-ডাকাত, নয়তো চালাক চালাক ফড়িয়ারা। আমি তো আমি, অল্প জমিজমার চাষীরা জালে পড়া কবুতরের মতো অসহায়ভাবে ছটফট করছে।[১]

বাংলার কৃষকদের কাছে কৃষি শুধু জীবিকার উৎসই নয়, কৃষিজমির সঙ্গে তাঁদের রয়েছে আত্মিক এক সম্পর্ক। তাঁদের জীবনের বড় অংশটিই কাটে মাটির সাথে মিতালি করে। এই মাটি তাই কেবল ফসল ফলানোর মাধ্যমই নয়, তাঁদের জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। *যার সাথে যার* উপন্যাসে কৃষক নিমু হাওলাদারকে তাই দেখা যায় ধানক্ষেতে দাঁড়িয়ে মাটির প্রতি ভালোবাসায় আচ্ছন্ন হতে। নিজের স্ত্রী জরিনার সাথে তখন ফসল ভরা মাঠের একটি ভিন্ন রকমের সম্পর্কও আবিষ্কার করে সে –

> সমস্ত ক্ষেতটার দিকে চোখ বুলিয়ে নিমু হাওলাদারের বুকে একটা কাঁপন বয়ে যায়। জরিনাকে বিয়ে করে আনার পরও এরকম একটা অনুভূতি টের পেয়েছে সে। তবে জরিনার সঙ্গে অনেক রঙ্গরস করা যায়, কিন্তু মাটিকে করতে হয় সম্ভ্রম। তবু কোনখানে যেন একটা মিল আছে।[২]

যুগের পর যুগ ধরে শোষকশ্রেণির গড়ে তোলা দমনমূলক সমাজব্যবস্থায় কৃষকদের দুরবস্থা নিরসনের কোনো বাস্তব সম্ভাবনা নেই। তাঁদের জন্য শাসক-শোষকদের যত হা-হুতাশ, সেটি নিতান্তই লোক দেখানো। গ্রামবাংলার আরো অনেক সচেতন মানুষের মতো *কাঞ্চনগ্রাম* উপন্যাসের সম্পন্ন কৃষক জালাল মিঞাও তা-ই মনে করে। এ কারণে শহরে বসবাসকারী ধনিকশ্রেণির মানুষেরা কৃষকদের উন্নতির জন্য যেসব পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন তাতে কোনো আস্থাই তার নেই –

> জালাল মিঞা দুনিয়াদারির অনেক কিছুই বোঝেনা সত্য, কিন্তু যতই হিসাব কষিয়া দেখে কোনও অবস্থাতেই যেন চাষের অথবা চাষীর মূল অবস্থাগুলির কোনও পরিবর্তন ঘটিতেছে না। শহর হইতে অনেক ডাক-ডঙ্কা বাজাইয়া নতুন নতুন কিসিমের কর্মকর্তা ব্যক্তিরা একেবারে ওয়াজ-মাহফিলের মত শান-শওকত করিয়া হরেক প্রকারের

[১] প্রাগুক্ত, পৃ.৫১

[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *যার সাথে যার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

> নছিহত দিয়া যায়, কৃষিদ্রব্য উপযুক্ত রকম বাজারজাতকরণের জন্যও তাহারা বিভিন্ন উদ্যোগের কথা বলে, বীজ-সার প্রভৃতির বিষয়ে, এমন কি কৃষিকার্যে ঋণ জোগাইবার প্রশ্নেও কত মছলা। কিন্তু জালাল মিঞা উৎসাহিত হয় নাম প্রলুব্ধ বোধ করে না, কেন না লোভ দেখাইবার ধরনেই তাহার আপত্তি। কেবলই মনে হয় যত না চাষী-কৃষকদের সহায়তার আগ্রহ, তারও অধিক তাহাদেরই নিজেদের কোন গরজ।[১]

দক্ষিণ বাংলার সমুদ্রবিধৌত অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন নদী। বিপুল বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর ছাড়াও অসংখ্য নদী-নালা-খাল-বিলে পরিপূর্ণ এই অঞ্চল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিপুলসংখ্যক মানুষ মৎস্য আহরণের ওপর ভিত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করছে। কালের পরিক্রমায় স্বতন্ত্র এক জীবনধারা তৈরি করেছে এই পেশাজীবী মানুষ, যা তাদের সামগ্রিক জীবনযাত্রাকে দান করেছে অনন্যতা। 'জেলে জীবনে নদী, নৌকা, জাল, মাঝি-মাল্লা, মৎস্য আহরণ ও বিপণন ইত্যকার বিষয়কে কেন্দ্র করে এমন এক অনন্য সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে যা একান্তই তাদের নিজস্ব, তারা তাদের সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে খুবই সচেতন, জীবন নির্বাহের নিজস্ব বিধি-বিধানের ওপর তারা যেমন অত্যন্ত আস্থাশীল, তেমনি দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ মূল্যবোধসমূহের যথার্থতা সম্পর্কেও তাদের রয়েছে অগাধ বিশ্বাস।'[২]

নদীমাতৃক এই দেশে কেবল মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীই নয়, সব শ্রেণি-পেশার মানুষই বছরভর মৎস্য আহরণ করে থাকে, যা সময়বিশেষে উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করে। শামসুদ্দীন আবুল কালামের *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসের ঘটনাংশ উন্মোচিত হয়েছে বর্ষা মৌসুমে এ অঞ্চলের মানুষদের মৎস্য-শিকার উৎসবের বর্ণনার মধ্য দিয়ে। এ উৎসবের চিত্রায়ণের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের নদী ও সমুদ্রনির্ভর জীবনপ্রবাহের চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে। বর্ষা মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিতে গাঙের মোহনা বেয়ে ইলিশের ঝাঁক নামলে মাছ ধরার সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না গ্রামবাসীরা। তাই রাত্রির দ্বিপ্রহর-উত্তীর্ণা নিস্তব্ধ অন্ধকারে যখন কেবল দূর অরণ্যাঞ্চল থেকে ভেসে আসা শিয়াল-কুকুরের ডাক ছাড়া জীবনের আর কোনো

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাঞ্চনগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

[২] বাংলাপিডিয়া, 'জেলে' [মো: আনোয়ার হোসেন]। ওয়েবসাইট: http://bn.banglapedia.org

সাড়া পাওয়া যায় না, সেই ঘনকালো নিশুতিকালে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যেও অনেকেই ডিঙি নৌকা নিয়ে নদীতে নেমে পড়ে মৎস্যশিকারের উদ্দেশ্যে।

সমুদ্রবাসর উপন্যাসে ধীবরপল্লি কামদেবপুরের বাসিন্দা সখানাথ এবং তার সঙ্গী রতিকান্ত, দেবনাথ, শ্রীহরি, নিতাই, চৈতন্য, রামু, গিরিশ, গৌতম প্রমুখের জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন মৎস্যশিকার। মাছ ধরে বিক্রি করে এরা দিনাতিপাত করে। নদী ও সমুদ্রবক্ষে অভিযানের মাধ্যমে তারা মৎস্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন গঞ্জে, হাটে, বাজারে বা মহকুমা সদরে বিক্রি করে। এ থেকে যা উপার্জন, তা দিয়ে কায়ক্লেশে দিন চলে গেলেও ঘর-গৃহস্থালির সব প্রয়োজন কিংবা ছোট-বড় সকলের স্বাদ-আহ্লাদ পূরণ করতে পারে না। ফুঁসে ওঠা সমুদ্র-নদীর রুদ্ররোষকে উপেক্ষা করে জীবিকার উপকরণ সংগ্রহ করে ধীবর সম্প্রদায়ের এসব মানুষ। তারপরও দারিদ্র্যের করাল গ্রাস থেকে তাদের মুক্তি মেলে না। কারণ–

> কখনও সামান্য কখনও প্রচুর শিকার লইয়া জোয়ারে ভাসিয়া যায় কাছাকাছি হাটবন্দরের উদ্দেশে। সবই বেচিয়া দিতে কোনো অসুবিধা হয় না, কিন্তু খরিদ্দাররা উপযুক্ত মূল্য কেউই দেয় না। হাট-বাজারের মালিক এবং গণ্যমান্য জনকে একরকম বিনামূল্যেও কিছু দিতে হয়। [১]

এ রকম পরিস্থিতির শিকার *নবান্ন* উপন্যাসের জেলে সমাজের প্রতিনিধি গফুর খাঁ-ও। সংসারে অভাব-অনটনের কারণে খরার মৌসুমেও মাছ শিকারে বের হয় গফুর খাঁ। পুকুর-ডোবা-নালা বা খালের পানি শুকিয়ে গেলে প্রবল প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে মাছ ধরে সংসার চালায়। লেখকের বর্ণনায়,

> ঘরভরা অজস্র সন্তান-সন্ততি নিয়ে তার দিন গুজরানও হয় না কয়েক মুঠ ভাত মুখে দিয়ে। উপায়ান্তর না দেখে খরার সময় মেতে উঠেছে জীয়ল মাছের শিকারে। দারুণ রৌদ্রের তেজে ক্ষেত মাঠ যখন একেবারে শুকিয়ে ঠা ঠা, শুকিয়ে যায় পুকুর, বাড়ির জমির উঁচু আইলের পাশের নালা ডোবাও, সেই সময় তারই মধ্যে খোড়ল-সুড়ঙ্গ খুঁজে খুঁজে সে হাতড়ে উঠায় বড় বড় কই আর শিঙ মাগুরের ঝাঁক। অমন কর্মে কতোবার কতোজন সাপের খোড়লে হাত দিয়ে প্রাণ দিয়েছে। তাছাড়া যেখানেই ঐ মাছের ঘুপটি সেখানেই বড়ো বড়ো বিষাক্ত সাপের ভিড় অবধারিত। সব জেনেশুনেও গফুর খাঁর এই বিপজ্জনক কাজের মারফত সংসার চালাবার কড়ি সংগ্রহ ছাড়া আর উপায়ান্তর ছিল না।[২]

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *সমুদ্রবাসর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *নবান্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে সমাজের তথাকথিত গণ্যমান্য ব্যক্তি দ্বারা বঞ্চনার শিকার হয় গফুর খাঁ। অসময়ে জীয়ল মাছ খাবার শখ হলে গফুর খাঁর শরণ নেয় তারা। মাছ নিয়ে যায়; কিন্তু দাম দেয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। ফলে এ ধরনের নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে তারা বের হতে পারে না। তাই কারো কারো মনে এ পেশার প্রতি অনীহা দেখা দেয়।

কাঞ্চনগ্রাম উপন্যাসের জেলে সমাজের প্রতিনিধি জেলে পাড়ার মুরারী। মৎস্যজীবীর পেশায় আগের মত আয়-উপার্জন না থাকায় আরো অনেক জাতভাইয়ের মত দেশত্যাগের ভাবনা উঁকি দিয়েছিল মুরারীর মনে। কিন্তু অবশেষে পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি আঁকড়ে থাকারই চিন্তা করেছে সে। মানুষের বিদেশি পণ্য ও খাবারের প্রতি লোভ, স্বদেশী যে কোনো বস্তুকে অবহেলার মনোভাব এমনকি দেশের পণ্য (যেমন গলদা চিংড়ি) বিদেশে রপ্তানি করার ঝোঁক – এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার সে। এর মধ্যেও তার সবচেয়ে বড় আনন্দ, যখন তার হাতে ধরা মাছ মানুষের তৃপ্তির কারণ হয়। মুরারীর ভাষ্যে–

> আমি অসাধু চোরের কাছে আমার মেহনতের ফসলই-বা বেচমু ক্যান? আমি যখন গাঙ্গ-হাওরের মাছ লইয়া হাটে বাজারে যাই, দেখি তা দেশের মানুষের ঘরে ঘরে কেমন কলরবের কারণ হইয়া উঠতে আছে, তখন তার মধ্যে, হাতের টাকাগুলানের চাইয়াও বড় একটা আনন্দ টের পাই, খোলামেলা জল-বাতাস যেন না চাহিতেই গর্বে বুক ভরিয়া ফেলে। চাচা, কেবল ঐ একটা সময়েই আর যেন কোনও শ্বাসকষ্ট হয় না।[১]

তাছাড়া জোতদার-মহাজনদের নজর এড়িয়ে গ্রামের প্রান্তিক মানুষরা স্বাধীনভাবে কোনো বৃত্তি নির্বাহ করতে পারে না। *জায়জঙ্গল* উপন্যাসে ক্ষমতাবানদের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে রাতের অন্ধকারে কাউকে কাউকে দেখা যায় মৎস্যশিকারে। বাঘকে ফাঁকি দিয়ে এই মাছ শিকারের বিষয়টিও ভীতিকর এবং দুঃসাহসিক। তারপরও জীবিকার তাগিদে শ্রমজীবী এসব মানুষ রাতের অন্ধকারের মতো মৃত্যুভয়কেও তুচ্ছ করে। হিংস্র বাঘের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মৎস্যশিকারের দুঃসাহসিক অভিযানের চিত্র লেখকের বর্ণনায় –

> এই মাছ শিকারীরাও ডোঙা বা ছই তোলা বদ্ধ ডিঙিতে চাপিয়া গহন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। অনেক খাল-নালাই ভাটার টানে একেবারে জলশূন্য হইয়া যায়। কিন্তু কিছু কিছু জলা জায়গায় অথবা গর্তে কিছু কিছু মাছ

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাঞ্চনগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

আটকাইয়া থাকে। সেই সময় মাছখেকো বাঘ পাশের ঘন ঘাসবন অথবা ঝোপঝাড়ের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসে। আটকা পড়া ঐ মাছগুলিকে থাবায় থাবায় জলা ঠাঁই হইতে তুলিয়া পাশেই আরেকটা গর্ত করিয়া আটকাইয়া দেয়। ভাটার গতির পিছনে পিছনে এইভাবে বহুদূর পর্যন্ত তাহারা মাছ সংগ্রহ করিয়া চলে। ক্লান্ত বা খুবই ক্ষুধার্ত হইয়া পড়িলে অথবা জোয়ার আসার আন্দাজ করিয়া ঐ মাছ খাইতে খাইতে পিছন ফিরিয়া আসে। বদ্ধ নৌকার মধ্যে বসিয়া মাছ শিকারীরা অপরাহ্নের অন্ধকারে কখনো বা জ্যোৎস্নাজ্বলা রাত্রিকালে বাঘকে কিছুটা দূর আগাইয়া যাইতে দেখিয়া, বাতাসের গতি হিসাব করিয়া ঐ মাছগুলি নিঃশব্দে তুলিয়া আনে।[১]

নদীমাতৃক বাংলাদেশে সহস্র বছর ধরে নদীপথে পণ্য ও যাত্রী পারাপার করা হচ্ছে, আর একে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এক গুরুত্বপূর্ণ পেশাজীবী শ্রেণি মাঝি। মাঝিদের জীবন বৈচিত্র্যময়, উপভোগ্য ও সংগ্রামমুখর। নদীর উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দূর-দূরান্তে চলে যায় তারা। অভাব আর দারিদ্র্যের সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকা অবস্থাতেই গানের সুরে মনের সমস্ত কষ্ট আর বঞ্চনাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে তারা।

কাশবনের কন্যা উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হোসেন জীবিকার প্রয়োজনে কেরায়া নৌকার মাঝির পেশা বেছে নেয়। এ কাজে পূর্বাভিজ্ঞতা না থাকলেও কঠোর পরিশ্রম ও দৃঢ় মনোবলকে সম্বল করে মাঝি হিসেবে দক্ষতা অর্জন করে সে। প্রথম প্রথম এ পেশাটির সঙ্গে মানিয়ে নিতে বেশ কষ্ট হয়েছে হোসেনের, কিন্তু হাল ছাড়েনি। সে বুঝতে পেরেছিল, হাল ছাড়লেই জগৎ-সংসারের নানা সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে। তাই পিতৃপ্রতিম ছবদার মাঝি ও বন্ধু আমজাদ মাঝির কাছ থেকে বুদ্ধি পরামর্শ নিয়ে এগিয়ে যায় সে। তাদের কাছে এ পেশার নানা প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা সম্পর্কেও ধারণা পায়। যেমন, ছবদার মাঝির কাছে সে জানতে পারে যে, ঘাটে নৌকা বাঁধার স্থানের জন্য এখন চর দখলের মতো ঝগড়া-বিবাদ লেগে যায়। তাছাড়া আগে এত নৌকা ছিল না, ফলে চড়নদারের অভাব হতো না। আর চড়নদারেরাও খুব ভালো এবং উদার ছিল। তাদের কৃপায় 'কেবল কেরায়ার পয়সাটাই নয়, ভালো-মন্দ অনেক কিছু জুটিয়া যাইতো।' কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতির বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। ভালো চড়নদার যেমন আর দেখা যায় না, তেমনি নৌকা এবং মাঝির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মাঝিদের মধ্যে চড়নদার নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়।

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *জায়জঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

ফলে এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে ঘাট মাঝিদের অসাধু মনোবৃত্তি গড়ে উঠে। তাই 'এখন ঘাট মাঝির সঙ্গে বুঝ-বন্দোবস্তটাই বড় হইয়া ওঠছে। তারে আগাম কিছু না দিলে সে আমলেই নেয় না।' শুধু তাই নয় মাঝে মাঝে তাদের কিছু মাছও দিয়ে আসতে হয়। ছবদার মাঝিদের মতো দরিদ্র মাঝিদের ওপর যারা এরকম অন্যায় আচরণ করে তাদের প্রতি হোসেন ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে ছবদার মাঝি তাকে সাবধান করে বলে, 'মানিয়া যাওয়াই ভালো। এই সব কথা কেউ একবার ওনাগো কানে উঠাইলে আর এই ঘাটে ঠাঁই হইবে না।' ছবদার অবশ্য মাঝিদের এ অবস্থার জন্য তাদের স্বগোষ্ঠীর মানুষদেরও কিছুটা দায়ি বলে মনে করেন। তার উক্তিতে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় –'এই তো দেখো, এতো নৌকা, এতো মাঝি কিন্তু সক্কলে একজনে আরেকজনের কাঁধে পাও দিয়া উপরে উঠতে চায়। তা না হইলে এই ঘাটের কাম কাজে সকলেরই কিছু না কিছু উপায় থাকতো।' (পৃ. ৫৫)। নানা প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কেউ কেউ অন্য কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে এ পেশা অবলম্বন করেই দিনরাত পরিশ্রম করে যায়। কখনো কখনো 'এক আধটা রাত্তির বাড়ি আসা ছাড়া অন্য কোনো হাউস-বিলাস নাই।' নৌকাতেই তাদের থাকা, খাওয়ার জন্য রান্নার আয়োজনও করতে হয়।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের আরেক পেশা লাঠিয়াল-বৃত্তি। এদের কাজ ছিল পুণ্যাহ বা বর্ষাসংক্রান্তিতে লাঠি খেলা প্রদর্শন বা বিভিন্ন পক্ষের আহ্বানে যুদ্ধ বা 'কাজিয়া'য় অংশ নেওয়া। কখনো কখনো উৎসব উপলক্ষ্যেও তাদের ডাক আসত বিভিন্ন 'মুলুক' থেকে। 'সারা গায়ে তেল মাখিয়া রঙিন শিরস্ত্রাণ আর শুধুমাত্র কটিবন্ধ বসনে, বাহুতে বাজু, গলায় তাবিজ আর হাতে বল্লম লইয়া যখন ইউসুফ সুজা আর মতলব সর্দারের দলবল সেইসব উৎসবে যোগ দিতে যাইত, গাঙ্গের দুইধারে অজস্র মানুষ আসিয়া দাঁড়াইত কেবল তাহাদের দেখার জন্য।' (*সমুদ্রবাসর*, পৃ. ৫৯)। কালের বিবর্তনে এ পেশার চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা কমে এলে অনেকে হয়ে পড়ে নিঃস্ব ও দরিদ্র। লেখকের বর্ণনায়, 'কেবলমাত্র জমিজমার দখল না হয় কাহাকেও মারিয়া ধরিয়া খেদাইয়া দেওয়া ছাড়া আর তাহাদের বড় একটা ডাক পড়ে না'। ফলে, বংশানুক্রমিক এ পেশা ছেড়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাদের অনেকে অন্য পেশা বেছে নিয়েছে; অনেকে শহরে-বন্দরে উঠে গিয়ে পাইক-বরকন্দাজের কাজ নিয়েছে, কেউ ডাকাতিতে মন দিয়েছে, কেউবা 'কাঠ-পাতার কারবার' জুটিয়েছে। *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসে দেখা যায়, সমুদ্রবক্ষে জেগে ওঠা নতুন চর দখলের জন্য মুজফ্ফর মিঞা

লাঠিয়াল বাহিনীকে ব্যবহার করে। জোতজমিহীন, দরিদ্র কিন্তু সচেতন ও প্রতিবাদী চরিত্র মনু মল্লিকের সঙ্গে লাঠিয়াল বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাদের হাতে মনু মল্লিকসহ তার কয়েকজন সহযোগী নিহত হয়। অতঃপর খুব সহজেই নতুন চর মুজফ্ফর মিঞার হস্তগত হয়। কিন্তু কালের পরিক্রমায় লাঠিয়ালদের কারো কারো মধ্যেও সৃষ্টি হয় সচেতনতাবোধ। যেমন, লাঠিয়াল ইউসুফ সুজার পুত্র সুজাত আলী বংশানুক্রমিক এই পেশার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। সে চায় অন্যের হুকুমের গোলামি না করে চাষাবাদ করে নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করতে। ইউসুফ সুজা ও সুজাত আলীর কথোপকথনে এ পেশার প্রতি সুজাত আলীর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠার কারণ বর্ণিত হয়েছে। তার মতে, 'মারামারি, খুন-জখমের পেশাতেই বা আর এমন কি লাভ হইতে আছে?' (পৃ. ৮৫)

সুন্দরবন সন্নিহিত সমুদ্র-উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধানতম নির্ভরতা সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ অরণ্য জয়নাল শেখ ভাটি-অঞ্চলে জীবনধারণে অনন্যোপায় হয়ে একদল কাঠুরের সঙ্গে অরণ্যভূমিতে বসতি স্থাপন করে। স্ত্রী হালিমন ও বোন সাজুকে নিয়ে জয়নাল শেখের সংসার। জোতদার জলিল মিয়ার নিয়োগকৃত দিনমজুর সে। তার মত লালু খাঁ, তালেব, মিকু এরা সবাই জলিল মিঞার দিনমজুর। তারা জোতদার-মহাজনদের নির্দেশে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে, হোগলা বা গোলপাতা কেটে যে মজুরি পায় তা দিয়ে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করে। কেউ কেউ মধু সংগ্রহের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও নিযুক্ত থাকে। তবে জোতদার-মহাজনদের নজর এড়িয়ে স্বাধীনভাবে বৃত্তি নির্বাহ করতে পারে না তারা। এ কারণেই ক্ষমতাবানদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়িয়ে রাতের অন্ধকারে কেউ কেউ মধু সংগ্রহ করে। *জায়জঙ্গল* উপন্যাসে লেখকের বর্ণনায় এ অঞ্চলের মৌয়ালদের মধু সংগ্রহের কাহিনি চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে –

> মৌ-শিকারীরা দিনের আলোক শেষ হইতে না হইতেই ছোট ছোট তালগুড়ির ডোঙা লইয়া খাল-নালা বাহিয়া সইসব চাকের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়। তারপর সারা শরীরে পুরো কাঁথা অথবা চটের আচ্ছাদন জড়াইয়া মশাল হাতে লইয়া গাছ বাহিয়া উপরে উঠে; নিঃশব্দে একেবারে কাছাকাছি গিয়া সেই মশালে আগুন ধরাইয়া মৌচাকের চতুর্দিকে বুলাইয়া মৌমাছি দলকে পুড়িয়া-খেদাইয়া দেয়। পরে চাক চাক সেই মৌভাণ্ড ভাঙিয়া দড়ির সাহায্যে মাটির উপর অপেক্ষায় থাকা সঙ্গীর হাতে নামাইয়া দেয়। ততক্ষণে তাহাদের তামাম দেহে মৌমাছিরা সাক্রোশে ছাইয়া পড়িয়াছে; কেবল মশালের আগুনের হলকা দিয়া তাহাদের তাড়াইয়া-পুড়াইয়া মৌ শিকারীরা

ঝটপট সরিয়া পড়িতে চেষ্টা করে। মাঝেমধ্যে মৌমাছির দংশনে কিংবা হঠাৎ বাঘের মুখে পড়িয়া জীবন হারানো এই জীবিকার স্বাভাবিক অনুষঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে।[১]

এ অঞ্চলের আরেক গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী বেদে। বেদেরা সাধারণত ভাসমান জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তারা সাধারণত নৌপথে বাংলাদেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চলাচল করে। নৌকার বহর নিয়ে নদীপথে ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন এলাকায়। আর তাই নদীবিধৌত অঞ্চলগুলোতে তাদের বেশি দেখা যায়। নদী তীরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে তারা কিছুদিনের জন্য ডেরা বাঁধে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামের অভ্যন্তরে। গ্রামে গ্রামে সাপের খেলা দেখিয়ে, সাপ ধরে, সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা করে কিংবা ছোটখাট হস্তশিল্প বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারপর আবার জীবিকার তাগিদে চলে যায় অন্য কোথাও।

সমুদ্রবাসর উপন্যাসে বেদে জীবনের নানা বৈশিষ্ট্য লেখকের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। এসব বর্ণনায় দেখা যায়– 'সম্বৎসর তাহারা সবসময় গাঙ্গের এই দিক ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও যায় খাল বা খাড়ি বাহিয়া অভ্যন্তরের পল্লীতে পল্লীতে। মনে হইল, স্রোতের অপেক্ষাতেই তাহারা পাড়ে নৌকা বাঁধিয়াছে। পুরুষেরা ব্যস্ত হইল আহার্য প্রস্তুতে, কেউবা বসিল গাঙ্গের জলে বড়শী পাতিয়া।' (পৃ. ৪৭)। অন্যদিকে বেদেকন্যারা নানা পণ্যের বেসাতি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় পল্লির আনাচে কানাচে। তাদের বিক্রিত পণ্যের মধ্যে আছে – 'মেয়েদের কেশ তৈল, সুগন্ধী সাবান, খোঁপা সাজাইবার কাঁকই কাটা, পাটের সুতায় বাঁধা কাচের চুড়ি, পুঁতির মালা, পায়ের আলতা'। এছাড়া সাপের খেলা দেখানো, তুকতাক ইত্যাদি কাজও তারা করে থাকে। জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোর কারণে বেদে সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দ নয়। তারা বিভিন্ন সময় নানা প্রতিবন্ধকতা কিংবা প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হয়। বিশেষ করে বেদেকন্যারা এর শিকার হয় বেশি। পল্লির অভ্যন্তরে পণ্য বিক্রির সময় গ্রামের দুষ্টু লোকদের কুনজর থেকেও তারা রেহাই পায় না। এমনই এক দুষ্টু লোক ইউসুফ সুজার কুনজরে পড়েছিল এক বেদেনি। তবে বেদেকন্যারা এসব অসাধু লোকদের হাত থেকে বাঁচার নানা কৌশল জানে ও তাদের মোকাবেলার সাহস রাখে। বেদেনীর নির্ভীক উক্তিতে সেই সৎ সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়, খোঁপার ভেতর থেকে একটি কাঁটা বের করে

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০

উত্যক্তকারী ইউসুফ সুজাকে সে সরোষে বলে, '... বেশি উলাস দিও না ভাল মানুষের পো, এই কাঁটায় এমন বিষ নাই যা ভরিয়া রাখতে কসুর করছি।' (পৃ. ৫০)। এক পর্যায়ে ইউসুফ সুজা বেদে সম্প্রদায়কে নানারকম 'আকাম-কুকাম' করার অপবাদ দিলে প্রতিবাদী বেদেকন্যার মুখেও এ জগৎ-সংসারের প্রচলিত নিয়মের প্রতি পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সে বলে–

> আকাম-কুকামের কথা যদি কও, যদ্দূর জানছি-শুনছি তোমাগো ডাঙ্গার মানুষের কীর্তি-কলাপ তার চাইয়া হাজার গুণ বেশি। এমন যে সাপ সেও পোষ মানে, তোমরা মানুষের রাজ্যে কী করতে আছো? পলাইয়া বেড়াই না আমরা, তোমাগো মানুষের রাজ্যেই আমাগো ঠাঁই দেও না। সৃষ্টি যে করছে তারও দয়া পাইলে আমাগোও এমন দশা হইত না।[১]

কাঞ্চনমালা উপন্যাসেও বেদেদের বিচিত্র জীবনপ্রণালী, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, অচরিতার্থতাজনিত হতাশা ইত্যাদি নানা বিষয় ফুটে উঠেছে। *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসের বেদে সম্প্রদায়ও নদীকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। পদ্মা নদীতে সাত-আটখানা নৌকার বহর নিয়ে দলের প্রধান বা সর্দার মঙ্গল মাঝি নদী তীরবর্তী বিভিন্ন গ্রামে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করে। তাদের জীবনপ্রণালী নিয়ে লেখকের বর্ণনা নিম্নরূপ–

> নানা জায়গায় তাহারা সাপের খেলা দেখায়, সাপ ধরে, নানারকম ঔষধ, মাদুলি, শিকড়, গাছ-গাছড়া বেচে, টোটকা চিকিৎসা করে, ওঝালি করে, চুড়ি বেচে, আর বেচে রঙবেরঙের তাগা, ছোট ছোট আরশী আর কাঠের 'কাঁকই'; না করে কি! ঝাড়ফুঁক, তুকতাক ছাড়াও নানা রকম 'গুণ'-এর কাজও করিতে চায়। বিষ বেচা, কাহাকেও বশ করা বা পাগল করিয়া দেওয়া মন্ত্র দিয়া, কিংবা বাদরের হাঁড় ভিতে পুঁতিয়া কাহাকেও নির্বংশ করাও নাকি তাহাদের সাধ্যের মধ্যে।[২]

উপন্যাসে বর্ণিত নদীতীরবর্তী জনপদ কাঞ্চনগ্রামে। একসময় বেদেদের শত শত নৌকাবহর গাঙের পাড়ে সমবেত হয়ে বিশাল উৎসবের সৃষ্টি করলেও এখন তাদের আনাগোনা অনেক কমে গেছে। তবে এখনও তাদের অস্তিত্ব আছে। *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসের বেদেদের মতো এরাও হাট-বাজারের কূল-উপকূলে ভিড় করে পেশাগত কর্ম সমাধা করার পর আবার তারা ভেসে যায় অন্য কোনো গন্তব্যের উদ্দেশে। তাদের

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *সমুদ্রবাসর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাঞ্চনমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য– 'তাহারা আকর্ষিত হয়, কিন্তু কোনও স্থায়ী বন্ধন মানে না, তাহাদের নিজস্ব বোধ-বিশ্বাস-জীবন যেন সব সময়ই অন্তেবাসী হইয়া রহিয়াছে বরাবর'। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য বেদে সম্প্রদায়ের তুলনায় *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসের বেদে দলটির কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই দলের সর্দার মঙ্গল মাঝি মানুষের অকল্যাণ হয় এমন কোনো কাজ করতে চান না। কেননা তার বাবা সাপের বিষ বেচার অপরাধে জেল খেটেছিলেন। তাছাড়া 'তাহার লক্ষ্য উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বৃত্তিটাকে যত দূর সৎভাবে চালাইয়া যাওয়া'। এ দলের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর সদস্যরা সকলে বেদে বংশোদ্ভূত নয়। এ প্রসঙ্গে লেখকের বর্ণনা: 'এই দল গড়িয়াছে মঙ্গল মাঝি নিজেই। এখান-ওখান হইতে এক এক করিয়া সকলে আসিয়া জুটিয়াছে তাহার সঙ্গে। (পৃ. ৫)। এ দলের অন্যতম সদস্য পবন মাঝি গানপাগলা ফকির ধরনের লোক। অন্ধ পবন মাঝি গান শুনিয়ে, মেয়ে চাঁপার নাচ দেখিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াত। বেদে দলের সর্দার মঙ্গল মাঝি তাদের দলে যোগ দেবার প্রস্তাব দিলে পবন মাঝি রাজি হয়। মঙ্গল মাঝির কন্যা মালা মঙ্গল মাঝির ঔরসজাত সন্তান নয়। মালাকে তিনি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন নদীর তীরে, ঝড়ে বিধ্বস্ত উল্টানো নৌকার পাশে। বেদে দলের আরেক সদস্য কালাও স্ত্রী বিয়োগের পর সংসার বিমুখ হয়ে বেদে দলে যোগ দিয়েছে। কালার ভাষায় – 'এই দুঃখেই তো ঘর ছাড়িয়া বাদিয়া হইয়াছি ভাই।' (পৃ. ৪৯)

বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে একসময় লোকজ চিকিৎসক তথা বৈদ্যদের ব্যাপক পদচারণা ছিল। বৈদ্য-কবিরাজ বা হেকিম-ফকিরেরা সাধারণত বাক-চতুর হয়। কথার চালাকিতে তাদের কেউ কেউ গ্রামের সহজ-সরল বিশ্বাসী মানুষদের প্রতিনিয়ত প্রতারিত করে। এমনই এক ধূর্ত বৈদ্যের দেখা পাওয়া যায় *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসে। হাটভর্তি মানুষের সামনে 'তৈলে-সিদ্ধ সাপ, বিষাক্ত তক্ষক-গিরগিটির ভিয়ান দেওয়া মালিশ, অজস্র রকমের পশুপাখির হাড়' নিয়ে একের পর এক অসম্ভব দাবি করে যায় সে। বাংলাদেশের আরেকটি গ্রামীণ পেশা হচ্ছে কুমার। মাটির তৈজসপত্র নির্মাণ ও বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে তারা। *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসে লাঠিয়াল সর্দার ইউসুফ সুজার পুত্র সুজাত আলীর জবানিতে কুমারপাড়ার অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন লেখক–

> পাড়ের উপর হাঁড়ি-পাতিল-কলসী বাসনের টুকরার স্তর জলের অনেক নিচ অবধি জমাট। কতযুগ ধরিয়া সেই কুমার পাড়া সেইভাবে ব্যবসাপত্র চালাইয়া আসিতেছে ভাবিয়া সে বেশ বিস্ময়বোধ করিল। এককালের ছোট সেই

> সত্র যেমনভাবে এখন এত বিস্তৃত করা সম্ভব হইয়াছে, তাহার চরভূমিকেও অনুরূপ উপায়ে সাজাইবার একটি ভাবনাও তাহাকে পাইয়া বসিল।[১]

গ্রামবাংলার আরেকটি অতি পরিচিত পেশা ছুতার বা কাঠমিস্ত্রি। গৃহস্থালি নানা উপকরণের পাশাপাশি নৌকা তৈরির কাজেও কাঠমিস্ত্রিদের প্রয়োজন পড়ে। *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসে দেখা মেলে কাঠমিস্ত্রি বিজয়রত্নের। বংশানুক্রমে এই পেশায় জড়িত সে। কাঠ, বাঁশ ও বেতের কাজে তাদের পারিবারিক দক্ষতা এ অঞ্চলে সমাদৃত। লেখকের ভাষ্য–

> বংশানুক্রমে তারা নানা রকমের ডিঙি বানিয়ে এসেছে। ... তালের গুড়ির-ডোঙা হোক, হোক সুপারী গাছের অথবা কাঁঠাল কি সেগুন কাঠের ডিঙি পানসী, তাদের কাজের কখনো কামাই ছিল না। সেই সঙ্গে ঘরবাড়ি তৈরির কাজেও সবচেয়ে আগে ডাক পড়তো তাদের। ... হাটে হাটে তাদের তৈরি ঝুড়ি-ঢাকনা, কড়ি-বাঁধাপুরা, মোড়া, জলচৌকি, বেলন-বাসন প্রভৃতির রঙ-বেরঙের পসার রীতিমতো শোভা ছিল এক কালে। বাড়ির মেয়েরা আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েও ছিল সে কাজে ওস্তাদ।[২]

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে একসময় লোককবি তথা কবিয়াল এবং বয়াতিদের খাতির ছিল অনেক। বাংলার উদার, গ্রামীণ পটভূমিকায় বেড়ে ওঠা কবিয়ালরা জীবনের নানা গুঢ় সত্য নিয়ে গান রচনা করতেন এবং পালা-পার্বণ ও নানা আসরে সেগুলো গাইতেন। এঁরা সাধারণত সংসার বিবাগী হতেন এবং গানবাজনা নিয়েই পড়ে থাকতেন। এদেশে কবিগানের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। 'উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলাদেশের কবিগানের দেহে যৌবনের জোয়ার বইতে থাকে। ঢাকা, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় এ-সময়ই অনেক বড়ো বড়ো কবিয়ালের অভ্যুদয় ঘটে।'[৩] মৃত্তিকাসংলগ্ন মানুষের হৃদয়িক প্রবৃত্তির তাড়নায় জন্ম নেয়া লোকগান এদেশের সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতাকে বহুভাবে ঋদ্ধ করেছে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, শামসুদ্দীন আবুল কালামের জন্মস্থান ঝালকাঠি জেলায় কবিগানের বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে। ফলে তাঁর গল্প-উপন্যাসে কবিয়াল ও বয়াতিদের যে উল্লেখ সেটি ঔপন্যাসিকের প্রত্যক্ষ

---

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *সমুদ্রবাসর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২,৪০

[৩] যতীন সরকার, 'বাংলাদেশের কবিয়াল', শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত '*বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য (প্রথম খণ্ড)*, বাংলা একাডেমি, ২০০৬, ঢাকা, পৃ. ১২২

অভিজ্ঞতাজাত বলেই ধরে নেওয়া যায়। *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কবিয়াল কানু শিকদার। জীবন ও সংসারের প্রতি চরম উদাসীন শিকদার 'গীত-গানের' মধ্য দিয়ে জগতের তত্ত্বকথা অনুসন্ধানে প্রয়াসী। পিতা জয় জামালী ও পিতামহ করম আলীও ছিলেন সংসার ও বিষয়ধর্মে উদাসীন। লেখকের ভাষায় –'বাড়িয়ালের মধ্যে ধানমলা, ধান বাছাই কিংবা সংসারের কোনো কাজকর্মই তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিত না। একমনে অজস্র গীত-কথার স্রোতের মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া তিনি গল্প শুরু করিয়া দিতেন।' (পৃ. ৬৭)। কানু শিকদারের পিতা জয় জামালী সম্বন্ধে লেখকের ভাষ্য – 'সে না দেখিত খেত-খামারের কাজকর্ম, না কোনো উৎসাহ বোধ করিত ঘর-পরিবারের প্রতি।' শৈশব থেকেই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র ভাবাদর্শ নিয়ে বেড়ে উঠেছেন কানু শিকদার। জীবন সম্পর্কে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা, বিশ্ব-সংসার আপন নিয়মে চলে। মানুষের উদ্যোগ আয়োজন তার কিছুই বদলাতে পারে না। ভিন্নতর এই জীবনদৃষ্টি এবং পিতামহ করমালীর প্রভাবে শৈশব থেকেই কানুর মধ্যে দেখা দেয় কবিয়াল প্রতিভা। কিন্তু এই প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হওয়ার পূর্বেই প্রচণ্ড মহামারির ভয়াল থাবা কিশোর শিকদারকে নিঃস্ব করে তার পরিবার-পরিজন, সহায়-সম্পত্তি সব কিছু গ্রাস করে নেয়। আত্মীয়-স্বজন যারা ছিল তারাও শিকদারকে সাহায্য করার চেয়ে সম্পত্তি ভোগ-দখলে অধিক মনোযোগী ছিল। শান্তিপ্রিয় সহজ-সরল উদার প্রকৃতির কানু শিকদার জোর-জবরদস্তি অথবা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় নিজেকে না জড়িয়ে গীত-গানের চর্চার মাধ্যমে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে।

পিতামহ করমালী ছাড়াও যে বাল্যপ্রণয়ী জোবেদার উৎসাহ-উদ্দীপনায় কানু কবিয়াল হয়ে উঠেছিল, সেই নারীও একসময় কানুকে ছেড়ে অন্যত্র সংসার স্থাপন করে। কানু শিকদার ও জোবেদার প্রেমসম্পর্ক সামাজিক মর্যাদা না পাওয়ার কারণ হিসেবে শিকদারের ঔদাসীন্য এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ি করে জোবেদা। এছাড়া গীত-গানের ভাবাবেগের মূল্যহীনতার কথাও জোবেদার উক্তিতে ফুটে ওঠে–

> সক্কলেই কয় ঘর সংসারের উপর মমতা নাই বলিয়াই তোমাগো বংশ এমন সহজে উজাড় হইয়া গেছে। তোমার কোনো উদ্বেগ বাস্তবিকই থাকলে তুমি সেইমত উদ্যোগ আয়োজন করতা। কিন্তু গীতকথা দিয়া ভরণপোষণ হয়

না। সক্কল বাপ-মাই চায় নিজ নিজ মাইয়া ভাল পাত্রে দিয়া অবস্থার উন্নতি। তোমার কথা কেউরই বিবেচনায় আসে নাই, আর আমিও কিছু করতে পারি না। তুমি যাও, যাও মিছামিছি আর অন্যের রোষের কারণ হইও না।[১]

যদিও জোবেদার সংসার জীবন সুখের হয়নি। স্বামী-শাশুড়ির অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে একপর্যায়ে জোবেদা স্বামী-সংসার ছেড়ে চলে এসেছিলো শিকদারের কাছে, সমর্পণ করেছিলো নিজেকে। কিন্তু শিকদারের দ্বিধাগ্রস্ত মনে নানা প্রশ্ন– 'বাসনা কি কামনার ঊর্দ্ধে জীবন নাই, কিন্তু কোন কামনা তার জীবনে বড় সত্য? সে কি কেবলই ঐ জোবেদাকে আকাঙ্ক্ষা, না অন্যতর কিছু?' (*কাশবনের কন্যা*, পৃ.২০৭)। এই অন্যতর কিছুর সন্ধানই কবিয়াল শিকদারের জীবনের সাধনা। জোবেদাকে তাই সে বলে– 'কবির কাজ তো ম্যাজিক দেখান না জোবু, তাকে সত্য দেখাইতে হয়, সুন্দরের দিকে আকৃষ্ট করতে হয়।' (*কাশবনের কন্যা*, পৃ. ১৯৯)। গীত গানের মাধ্যমে জীবনের তত্ত্ব সন্ধানী শিকদার অবশেষে জীবনের মাহাত্ম্য খুঁজে পায়। তাই বৃহত্তর স্বার্থে জনমানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখে সত্যিকারের কবি হতে চায়।

সমুদ্রবাসর উপন্যাসের উজ্জ্বল চরিত্র বসুয়া বয়াতি ধান কাটার মৌসুমে গানে গানে কৃষকদের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। তার গানে কর্মক্লান্ত কৃষকেরা ক্লান্তি ভুলে কাজে আনন্দে মেতে ওঠে। ধান কাটা, মাড়াই, ওজন করা – প্রতিটি ধাপেই উৎসাহ জোগানোর জন্য আছে বসুয়া বয়াতির গান। উদাহরণস্বরূপ, ধান কাটার শুরুতেই বসুয়া বয়াতির প্রণোদনামূলক গান–

আল্লা আল্লা বলো সবাই,
তাঁর রহমত চাই
এই আসমান-জমিনে যেন
সাধ মিটাইতে পাই গো
আশ মিটাইতে পাই। (পৃ. ২৮৫)

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাশবনের কন্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

আবার দাড়ি-পাল্লায় ধান মেপে সাজি ভরার সময় ভিন্ন গান– 'একে এক, এক এক, একে এক আল্লা, দুইয়ে দুই দুই নেত্র, তিনে তিন তিনে তিন তিনে তিন তিন কাল–'

'নবান্ন' উপন্যাসে ডাকপিয়ন সফদার আলী। রোগা পাটকাঠির মতো চেহারা। মাথার চুলও প্রায় উঠে গেছে। পাঞ্জাবির বুক পকেটে ঠাসা কাগজপত্র-চিঠি এবং কয়েকটা কলম পেন্সিল সঙ্গে নিয়ে ছাতা হাতে বেরিয়ে পড়ে চিঠি বিলি করতে। রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডাক পৌঁছে দেয়। সেসময় কেউ তাকে আপ্যায়ন করে, কেউ বা বকশিশ দেয়। যখন সে চাকুরিটা পেয়েছিল তখন খুশিই হয়েছিল, কিন্তু এখন সময়ের সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ায় যা মাইনে পায় তা দিয়ে সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। দয়াল চৌকিদারের সঙ্গে আলাপচারিতায় সফদার আলী ভাষ্য থেকে তার আর্থিক টানাপড়েন সম্বন্ধে জানা যায়। সে জানায়, মাস শেষে যে মাইনে পায় তা দিয়ে এক সপ্তাহেরও খোরাক জোটে না। তাছাড়া মানুষের ভ্রমণ ও সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধির কারণে এখন প্রচুর পরিমাণে চিঠি লেনদেন হয়, ফলে আগের তুলনায় খাটুনিও বেড়ে গেছে অনেক।

এ উপন্যাসে বিজয়রত্ন পেশায় কাঠমিস্ত্রি। বংশানুক্রমে সে এই পেশায় জড়িত। কাঠ, বাঁশ ও বেতের কাজে তাদের পারিবারিক দক্ষতা এ অঞ্চলে সমাদৃত। এই কাজ তাদের জন্য আর্থিক সচ্ছলতাও এনেছে। ঘরবাড়ি বা নৌকা তৈরি, কাজ যাই হোক, জীবিকার সংস্থানের জন্য কখনো চিন্তা করতে হত না এ পরিবারের সদস্যদের। লেখকের ভাষায়–

> তালের গুড়ির-ডোঙা হোক, হোক সুপারী গাছের অথবা কাঁঠাল কি সেগুন কাঠের ডিঙি পানসী, তাদের কাজের কখনো কামাই ছিল না। সেই সঙ্গে ঘরবাড়ি তৈরির কাজেও সবচেয়ে আগে ডাক পড়তো তাদের। ... হাটে হাটে তাদের তৈরি ঝুড়ি-ঢাকনা, কড়ি-বাঁধাপুরা, মোড়া, জলচৌকি, বেলন-বাসন প্রভৃতির রঙ-বেরঙের পসার রীতিমতো শোভা ছিল এক কালে। বাড়ির মেয়েরা আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েও ছিল সে কাজে ওস্তাদ।[১]

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *নবান্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২,২৪

অভাব ও দারিদ্র্য

অভাব ও দারিদ্র্য পল্লিবাসীদের জীবনের অনিবার্য নিয়তি। বাংলার গ্রামাঞ্চলে 'গোলাভরা ধান আর পুকুর ভরা মাছে'র গল্প রূপকথার মতোই। বস্তুত, সুবিধাভোগী কিছু মানুষই কেবল সেখানে প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাস করে। নিজের উৎপাদিত শস্য আর খালবিল থেকে প্রাপ্ত মাছের ওপর গ্রামের মানুষের নির্ভরশীলতার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। অতীতে জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও সম্পদের যোগানও ছিল অপর্যাপ্ত। ফলত সাধারণ মানুষের আর্থিক দুর্দশার অন্ত ছিল না। কায়ক্লেশে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারলেও নগদ অর্থের অভাবে অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে তারা হিমশিম খেত। গ্রামের জোতদার, মহাজন কিংবা মোড়ল-মাতব্বর ছাড়া নগদ অর্থ সাধারণ মানুষের হাতে খুব কমই ছিল।

পাকিস্তানি শাসনে গ্রামের প্রান্তিক মানুষের অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বাংলাদেশে (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) উৎপন্ন সম্পদ ভোগের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাদের আয় বৃদ্ধি করেছে, আর এদেশের মানুষকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত ও পিষ্ট করেছে শাসন-শোষণের যাঁতাকলে। ফলে এদেশের সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের কোনো হেরফের হয়নি। এখনও এদেশের গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যপীড়িত। সাধারণ মানুষের ওপর সচ্ছল ও সুবিধাভোগী দৌরাত্ম্যও সমানেই চলে। ফলে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে নিপতিত প্রান্তিক মানুষ ক্রমশই আরও দরিদ্র হতে থাকে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিত্য প্রকোপে তারা ক্রমশ বিপন্নদশায় নিক্ষিপ্ত হতে থাকে।

অভাব ও দারিদ্র্যকে পল্লিবাংলার মানুষ অনিবার্য নিয়তির মতোই মেনে নিয়েছে যুগ যুগ ধরে। কৃষিনির্ভর গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজই মানুষের জীবিকার প্রধানতম অবলম্বন। এ কারণে প্রকৃতির বিরূপতায় ফলন কম হলে মানুষের জীবনে নেমে আসে অসহনীয় দারিদ্র্য। আবার শোষকের দুঃশাসনও তাঁদের জীবনে প্রতিনিয়ত সৃষ্টি করে অভাব-অনটন। আবহমানকাল ধরেই শাসকশ্রেণির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরই নির্ভর করেছে গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না। খাজনা আদায়ের নামে জমিদারদের অত্যাচারের শিকার হয়েছে তারা। ইচ্ছে হলেই তাদেরকে ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তুচ্ছ কারণে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আর এভাবেই শাসক শ্রেণির অনুগ্রহের পাত্র হয়ে

মানবেতর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে নিরীহ মানুষ, যা তাদেরকে দারিদ্র্যের ভয়াবহ দুষ্টচক্রে আবদ্ধ করে রেখেছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। একদিকে প্রকৃতি অন্যদিকে শোষকের শাসন ও প্রতাপের বশ্যতা মেনে নেওয়া নির্বিরোধ, নির্ভেজাল জীবনপ্রত্যাশী এই প্রান্তিক মানুষদের জীবনে শতাব্দীকালব্যাপী সংঘটিত জীবন-ইতিহাসের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ লেখক চিহ্নিত করেছেন এভাবে–

> নিজেদের রক্ত জল করা পরিশ্রমে আহৃত যে সম্পদের বুনিয়াদে সফল জীবন সাজাইবার স্বপ্ন দেখে, তাহার উপর কোনো অধিকারই অনুভব করে না; হয়তো একদিন দেখে মরিয়া যে জমিনে আশ্রয় লইবে সেখানেও তাহাদের অধিকার নাই। জমির মালিকের সুচতুর ভূমিকায় ইহাও বিধির বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়া হালের গরুর পশ্চাতে আরেকটি গরুর মতোই পুনর্বার লাঙল ধরিয়া অমৃতগর্ভ জমিতে ও ফসলের স্বর্ণে সফল জীবনের বুনিয়াদ সন্ধানে ব্রতী হয়। কখনওবা জমিন ও আসমানের সবার বড় মালিক, সেই বিধির আরশের দিকে চাহিয়া কাতর ফরিয়াদ জানাইয়া রহমত যাঞ্চা করে। দেহ ও মনের দুর্বলতা সৃষ্ট ফসলে সংক্রামিত হয়, আর দীর্ঘশ্বাসে দীর্ঘশ্বাসে আসমান ভারী হইয়া উঠে।[১]

আলমনগরের উপকথা উপন্যাসে জমিদারতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু, দুর্বল এক রূপ যেমন প্রত্যক্ষ করা যায়; তেমনি এই পটভূমিতে বুর্জোয়া পুঁজিবাদী শোষকশ্রেণির মাথা তুলে দাঁড়ানোর চিত্রও দেখা যায়। এদিক দিয়ে এ উপন্যাস বাংলার ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণের পরিচয়বাহী। আলমনগরের এক সময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নবাব পরিবারের সৌভাগ্যসূর্য অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাভোগী একটি শ্রেণি, যারা এক সময় নবাবদেরই আজ্ঞাবহ ছিল, তারা কীভাবে ধীরে ধীরে শাসক তথা শোষকের স্থানটি দখল করে নিচ্ছে তার স্পষ্ট একটি ছবিও পাওয়া যায় এ উপন্যাসে। নবাব পরিবারের উত্থান পতনের সঙ্গে যেন আলমনগরের সাধারণ মানুষের জীবনতরঙ্গের উত্থান-পতনও এক সূত্রে গাঁথা। নবাবের দ্বিধা-দৌর্বল্যের কারণে আলমনগরের প্রজাদের ভাগ্যাকাশেও দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দেয়। সবাই আশায় বুক বাঁধে, নবাবের সন্তান আলমগীর পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে এলে সবার জীবন থেকে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ কেটে যাবে। কিন্তু আলমগীরের প্রত্যাবর্তনের পর এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মীর খাঁ-র মত লোকের নিষ্পেষণের কবল থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য তার হাতে কোনো জাদুর কাঠি নেই। আলমগীর গ্রামের সাধারণ মানুষের ভাল চায় বটে, তবে কোনো বৈপ্লবিক পন্থায় তার বিশ্বাস নেই। সে বরং নিজের বৈজ্ঞানিক

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *আলমনগরের উপকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

আবিষ্কারকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারলেই খুশি। গ্রামের পথে একা একা ঘুরে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র নিজের চোখে দেখে আলগমীর; দেখে 'আলমনগরের ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ জীবন-যাত্রা। চাষী রৌদ্রে পুড়িয়া চাষ করিতেছে, অস্থি-কংকালসার গৃহস্থবধূ পুকুরের কলমী শাক তুলিতেছে, রুগ্ন শিশুগুলি মাছ ধরিতেছে, ধূলা কাদা মাখিয়া, কলা গাছ চিরিয়া তাহার 'থোর' খাইতেছে; বৃদ্ধেরা বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে।' (পৃ. ৪০)। তবে সাধারণ মানুষের কাতারে দাঁড়িয়ে মীর খাঁ বা চৌধুরী সাহেবদের প্রতিরোধ করার পরিবর্তে এক ধরনের নির্মোহ ঔদাসীন্য যেন ভর করে তার ওপর। গ্রামের মেঠোপথে চলতে গিয়ে চারদিকে যেন এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে সে। গ্রাম বাংলার চিরায়ত সৌন্দর্যের মধ্যেও 'উহাদের রুগ্ন দেহগুলি, শ্রীহীন বেশবাস দেখিয়া আলমগীরের মনের কষ্ট বাড়িয়া যায়। চিরাচরিত পথে চলিতে চলিতে তাহারা যে নিশ্চিত গহ্বরের মুখেই আগাইয়া যাইতেছে, তাহা কেহ জানে না।' (পৃ. ৬৮)। গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতা থেকে আলমগীর বুঝতে পারে, দুঃখ ও দারিদ্র্যের সঙ্গে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের আবহমানকালের যে টানাপড়েন, তা বুঝি আর কখনও শেষ হবে না। গ্রামের সাধারণ কৃষক তোফেল যখন তাকে বলে, 'এখন তো দু'এক মাসের খোরাকী ঘরে আছে, তা-ই একটু হাসি-খুশি দেখছেন। অভাব শুরু হবে বর্ষা আসার শুরুতে – তখন পেটে খিল লাগিয়ে কেবল ঘরে শুয়ে থাকা। কবিলাটা তো এমনি একদিন বিনা ওষুধে মরে গেল। বেশি অসহ্য হলে ঘটি-বাটি, জমি-জমা বন্ধক রেখে টাকা আনো ...'; তখন আলমগীরের সঙ্গে পাঠকও বুঝতে পারে, সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের মতোই দারিদ্র্যের সঙ্গে অনিঃশেষ যুদ্ধও পল্লিবাংলার চিরন্তন জীবনচিত্রেরই অপরিহার্য এক অঙ্গ।

কাশবনের কন্যা উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্র হোসেন ও শিকদার, যাদের জীবনপ্রবাহ বর্ণনার মাধ্যমে সমুদ্র-উপকূলবর্তী গ্রামীণ মানুষদের সংগ্রামশীল জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। হোসেন ও কানু শিকদার উভয়েই নিঃসঙ্গ ও অসহায়। বাবা-মা আত্মীয়-পরিজনহীন এই সংসারে তাদের পথচলা। তবে হোসেন আশাবাদী ও পরিশ্রমী। অপরপক্ষে কানু শিকদার জগৎ সংসারের প্রতি উদাসীন এবং হতাশাবাদী। হোসেন মনে করে পরিশ্রম এবং চেষ্টা করলে একদিন নিশ্চয়ই ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু শিকদার বলে, 'অভাব দুঃখের জ্বালা ধরানিয়া দিনগুলোই মোগো জন্য সত্য। আর বেবাকই মিছা, একেবারে ডাহা মিছা।' কিন্তু হোসেন এ ধরনের হতাশাব্যঞ্জক কথা মেনে নিতে চায় না। সে চরম দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও

উজ্জ্বল ভাবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। তার বিশ্বাস 'দিন কাহারও একই রকম কাটে না।' এই বিশ্বাস বুকে নিয়ে সে নিজের উদ্যম ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অভাব-দারিদ্র্যের বিরূদ্ধে সংগ্রামশীল হয়ে ওঠে। ক্ষেত-খামারের কাজের পাশাপাশি তাই সে খেয়া পারাপারের কাজও করতে থাকে। যদিও এত পরিশ্রম সত্ত্বেও 'হোসেনের জীবনে এখনও স্বাচ্ছন্দ্য নাই, গৃহস্থালি-সংসারের বহনেরও সামর্থ্য নাই'। তারপরও হোসেন অসুখী নয়। তার সান্ত্বনা – 'আর যাহাই হউক, দুইমুঠো ভাতও এখন জোগাইতে পারিতেছি'। অভাব-দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামরত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ হোসেনের এ মন্তব্য থেকে ধারণা করা যায় গ্রামীণ অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের চাহিদা খুব বেশি নয়। তারা দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারলেই খুশি। যদিও এটুকু খুশিও তাদের ভাগ্যে জোটে না। হোসেন তাই বলে 'যে অভাবে উপবাসে থাকে নাই সে এই দুই মুঠা ভাতের মূল্য বুঝিবে না।'

বাবা-মাকে হারানোর পর হোসেনের জীবন অন্যের করুণানির্ভর হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ভিক্ষা করে তাকে দুবেলা দুমুঠো ভাতের জোগাড় করতে হয়েছিলো। সেই তমসাচ্ছন্ন দুর্দিন থেকে সে মুক্তি চায়। জীবনের হাল ছেড়ে দিতে সে রাজি নয়; কারণ তার বদ্ধমূল ধারণা, ক্ষান্ত দিলেই দুঃখ-দুর্দশা আবার চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরবে। জীবন সম্পর্কে আশাবাদী হোসেন পরিবার-পরিজন নিয়ে সুখে সংসার করতে ইচ্ছুক। তার ধারণা মনের মতো একজন সঙ্গী পেলে এই জীবনযুদ্ধের সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করা সহজ হতো। মনে মনে সেই সম্ভাব্য গৃহিণী হিসেবে সে কল্পনা করে বাল্যসখী সখিনাকে। সখিনার মুখটিই বারবার ভেসে ওঠে তার হৃদয়পটে। কিন্তু তার সে স্বপ্নও সার্থক হয় না। আর্থিক দুর্বলতাজনিত হীনম্মন্যতা এবং সামাজিক অবস্থানের কথা বিবেচনা করে সে দোলাচলে ভোগে। নিজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে হোসেনের বিব্রতভাব প্রকাশ পায় সখিনার মায়ের সঙ্গে বিয়ের প্রসঙ্গে বাক্যালাপকালে: 'যা দিনকাল পড়ছে চাচী, এখন দুই বেলার ভাত জোগানই দায়, খাওয়ামু কি বিয়া করিয়া।' (পৃ. ৩৩)। দারিদ্র্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হোসেনের কাছে বিয়ের চিন্তা বাতুলতা বলেই মনে হয় –

> তাহার ঘর দুয়ারের যে ছিরি, তা কোনও কন্যারই মন ভুলাইতে পারিবে না। তাহাকে বধূবেশে এই ভাঙা ঘাটে নামাইয়া লওয়া, এমন অযত্নে পড়িয়া থাকা উঠানের উপর দিয়া মল বাজাইয়া সে ধীরে ধীরে তাহার ঐ মনে গিয়া উঠিবে, এমন কল্পনার বাস্তবিকই কোনও অর্থ নাই।[১]

একদিকে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার কারণে সখিনাকে না পাওয়া, অন্যদিকে নিজের ঘরবাড়ির ভগ্নদশা তাকে মানসিকভাবে অস্থির করে তোলে। 'ঘরের চাল বদলান দরকার, মূলিবাঁশের বেড়াগুলিও খসিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে; ভাল কাদা জোগাড় করিয়া ভিটাটাকেও মজবুত না করিলে চলে না। তা না হইলে হয়ত আরও একটা বন্যার কালে একেবারে গলিয়াই মিলাইয়া যাইবে' ইত্যাদি নানা বিষয় তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে করে তোলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। হোসেনের কষ্টকর জীবনযাপন অভাব ও দারিদ্র্যের পরিণতি মানুষের অস্তিত্বসংকটের স্বরূপকেই প্রকট করে তোলে। যেখানে দুমুঠো অন্নের সংস্থান এবং মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুর ব্যবস্থা করাও দুষ্কর, সেখানে জীবনের অন্য কোনো চাহিদা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে হোসেনের ভাষ্য : 'দুইমুঠ খাওন জোগানের জন্য কোনও দিকেই যেন আউগান যায় না।' অন্যদিকে হোসেনের বন্ধু কবিয়াল কানু শিকদার ছিল সচ্ছল পরিবারের সন্তান। একসময় তাদের আর্থিক অবস্থা ছিল বেশ ভালো। কিন্তু প্রচণ্ড মহামারির ভয়াল থাবা কিশোর শিকদারকে নিঃস্ব করে পরিবার পরিজন সহায়-সম্পত্তি সব কেড়ে নেয়। ফলে কিশোর শিকদারের জীবনে নেমে আসে অভাব-দারিদ্র্য নামক বিপর্যয়। দারিদ্র্যের কারণে বাল্যপ্রণয়ী জোবেদার প্রেম থেকেও বঞ্চিত হয় সে। শিকদার-জোবেদার প্রেমসম্পর্ক সামাজিক মর্যাদা না পাওয়ার কারণ হিসেবে শিকদারের ঔদাসীন্য এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ি করে জোবেদা। এছাড়া গীত-গান ও ভাবাবেগের মূল্যহীনতার কথাও জোবেদার উক্তিতে ফুটে ওঠে–

> সক্কলেই কয় ঘর সংসারের উপর মমতা নাই বলিয়াই তোমাগো বংশ এমন সহজে উজাড় হইয়া গেছে। তোমার কোনো উদ্বেগ বাস্তবিকই থাকলে তুমি সেইমত উদ্যোগ আয়োজন করতা। কিন্তু গীতকথা দিয়া ভরণপোষণ হয় না। সক্কল বাপ-মাই চায় নিজ নিজ মাইয়া ভাল পাত্রে দিয়া অবস্থার উন্নতি। তোমার কথা কেউরই বিবেচনায় আসে নাই, আর আমিও কিছু করতে পারি না। তুমি যাও, যাও মিছামিছি আর অন্যের রোষের কারণ হইও না।[২]

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাশবনের কন্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

দারিদ্র্যের আরেক করুণ শিকার ছবদার মাঝি। স্ত্রী-কন্যা এবং নাবালক পুত্রকে নিয়ে অসুস্থ বৃদ্ধ ছবদার মাঝির পরিবার। নদীপথেই ছবদার মাঝির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ঘটে নবাগত মাঝি হোসেনের। একপর্যায়ে ছবদার মাঝি অসুস্থ হয়ে পড়লে মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয় হোসেন। সেখানে তার পরিবারের শোচনীয় অবস্থা দেখে মানবিক কারণে কয়েকটা দিন থেকে যায় হোসেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ছবদার মাঝিকে বাঁচাতে পারে না, দিন-দুয়েকের মধ্যেই সে মারা যায়। মৃত্যুর পর মৃতের সৎকার করার 'সাধ্য-সামর্থ্যও' ছিল না তার পরিবারের। এমতাবস্থায় হোসেন শোকগ্রস্ত পরিবারের পাশে থেকে সৎকারের আনুষ্ঠানিকতাও সম্পন্ন করে। এ প্রসঙ্গে ছবদার মাঝির পরিবারের অসহায়ত্বের যে চিত্র হোসেন অবলোকন করেছে তা লেখকের বর্ণনায় এভাবে চিত্রায়িত হয়েছে–

> তেমন সংসার মানুষ যে কোন সুখে করে! কাফন-দাফনের ব্যয় দূরের কথা, ঘরে উপযুক্ত আহার্য পর্যন্ত নাই। সে বাহির হইতে কেরায়া খাটিত, স্ত্রী সামান্য কিছু জুটাইয়া আনিত জমি-জমাওয়ালাদের বাড়িতে ধান ভানিয়া, না হয় অন্য কোন কাজ করিয়া। মেয়ে মেহেরজানকে বিবাহ দিয়াছিল অনেক আশা করিয়া, কিন্তু পণের কড়ি জোগাইতে পারে নাই বলিয়া সে মেয়ের সংসারও সুখের হয় নাই। নানারকম অত্যাচারের কবলে পড়িয়া সে একদিন অগত্যা বাপের বাড়ি চলিয়া আসিয়াছে, বরপক্ষও আর খবর লয় নাই। সে-ও আর কিছুতেই সেইমুখী হইবে না স্থির করিয়া বাপের শণের কুঁড়াতেই রহিয়া গিয়াছে।[১]

এরকম পরিস্থিতিতে মানবিক ভাবনায় তাড়িত হয়ে হোসেন কয়েকদিন অবস্থান করে শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে। এসময় এই পরিবারের দুঃখ-দুর্দশা অত্যন্ত কাছ থেকে দেখে হোসেন। ফলে তাদেরকে দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের দুর্ভোগ থেকে বাঁচানোর উপায় সন্ধানে সচেষ্ট হতে দেখা যায় হোসেনকে। ছবদার মাঝির স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনকালে সে বলে, 'আপনাগোই বা কী ব্যবস্থা হইবে? এইভাবে তো আর জীবন চলতে পারে না।' (পৃ. ১৬২)। তবুও জীবন চলে, তবে সে জীবন মানবেতর। কায়ক্লেশে কোনোরকমে বেঁচেবর্তে থাকা। *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসেও সমুদ্র-তীরবর্তী এসব দারিদ্র্যকাতর মানুষের জীবনচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এ উপন্যাসের সখানাথ, রতিকান্ত, দেবনাথ, শ্রীহরি, নিতাই, চৈতন্য, রামু গিরিশ, গৌতম জেলে সমাজের প্রতিনিধি। দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে মাছ শিকার করে সে মাছ বাজারে বিক্রি করে তাদের সংসার চলে। তবে ন্যায্য দামের অভাব এবং সমাজের এক শ্রেণির লোকের স্বার্থপরতার জন্য তারা যা উপার্জন

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

করে তাতে তাদের সংসার চলে না। এ উপন্যাসের আরেক প্রান্তিক চরিত্র মনু মল্লিক। জোতজমিহীন মনু মল্লিক স্ত্রী জরিনাকে নিয়ে ভাটি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে। সেখানে 'ঘোর জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার করে জন্তু-জানোয়ারের' ভয়কেও অগ্রাহ্য করে কোনোরকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছে তারা। দারিদ্র্যজীর্ণ অবস্থা থেকে মুক্তির আশায় নতুন জাগা চরে চাষাবাদের উদ্দেশ্যে চর দখল করার পরিকল্পনা করে সে। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন মুজফ্ফর মিঞার প্রবল প্রতাপের কাছে পদদলিত হয়। মুজফ্ফর মিঞার লাঠিয়াল বাহিনীর সঙ্গে চর দখল নিয়ে লড়াই বাঁধলে নির্মম মৃত্যু ঘটে মনু মল্লিকের। স্বপ্নের সেই চরের জল-মাটির অতল গহ্বরে চিরতরে বিলীন হয়ে যায় তার অস্তিত্ব।

গ্রামীণ নারীদেরকেও দেখা যায় দারিদ্র্য প্রশমনের কিংবা সংসারের সচ্ছলতা আনার উদ্দেশ্যে পুরুষের পাশাপাশি সমানভাবে লড়াই করতে। *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসের ছবদার মাঝির স্ত্রী অন্যের বাড়িতে কাজ করে, বসতভিটার প্রাঙ্গণে সব্জির চারা রোপণ করে এবং সেগুলো পরিচর্যা করে। সেই বাগান এবং সব্জি গাছগুলো তাদের কাছে সন্তানতুল্য। ঝড়ের দাপটে সব্জির মাচান ভেঙে পড়লে মাচান ঠিক করার প্রাক্কালে ছবদারের স্ত্রী কন্যা মেহেরজানকে বলে, 'দেখিস মেহের, দেখিস, সাবধানে লতাইয়া দে, গাছে যেন ব্যথা না পায়।' *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসের মনু মল্লিকের স্ত্রীকে দেখা যায় স্বামীর সঙ্গে পানের বরজের পরিচর্যা করতে। সিকুর স্ত্রী করিমনকে দেখা যায় স্বামীর সঙ্গে বাঁশের তৈরি ঝুড়ি, খলুই, চাঁই, সাজি-পুরা, পাখা ইত্যাদি বানাতে সাহায্য করতে; হাঁস, মুরগি, কবুতর পালতে। চান্দুর স্ত্রী জোবেদা এবং দুই বোন ভানু আর অনুও 'রান্না-বান্না, মাচানের নিচে কাছাকাছি জমিনের উপর শাক-সব্জি বপন-রোপণ তদারকির ফাঁকে ফাঁকে বড়শি পাতিয়া সমুদ্র হইতে শিলান-পাঙাশ টানিয়া উঠান, ডিম হইতে ফোটা হাঁস-মুরগির ছানাগুলিকে চিল-শকুনের খপ্পর হইতে রক্ষা করিবার ইত্যাদি নানা কাজের মধ্য দিয়ে' সংসারের অভাব-অনটন দূর করবার চেষ্টা করে। কিন্তু তারপরও দারিদ্র্যের ছোবলে জর্জরিত তাদের জীবন। চান্দুর কষ্টকর পারিবারিক জীবনচিত্র দেখে সুজাত আলীর বিস্ময়ভরা উক্তি–

এতো খাওয়াইয়া তোমার ঘরে, সমূহ কিছু একটা উপায় না পাইলে কেমন করিয়া কী করতে পারবা। যে কামই হউক, মান-অভিমান মনে না রাখিয়া তোমার পক্ষে তাইতেই লাগিয়া যাওয়া উচিত। দেখোতো, এই দুধের পোলাপানগুলোরও চাইয়াও ঐ ঘাস-সব্জির চারাগুলানও কেমন তরতাজা।[১]

অভাব-দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামরত মানুষের আরেক প্রতিনিধি *যার সাথে যার* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিমু হাওলাদার, বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা। বাংলাদেশের আর আট-দশটি গ্রামের মত এ গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও অভাবের তাড়নায় পিষ্ট, তাদের জীবনেও আছে ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, আছে জীবনের না পাওয়া গুলোকে সম্বল করে কোনো না কোনোমতে বেঁচে থাকার প্রাণান্ত চেষ্টা। দরিদ্র নিমু হাওলাদার সামান্য ক্ষেত-খামার থেকে যা পায় তাতে তার সংসার চলে না। পরিবারের সদস্যদের চাহিদা মেটাতে সে কৃষিকাজের পাশাপাশি বাড়তি পরিশ্রম করে। কাকডাকা ভোরে উঠে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে আনে। খেজুর রস, তালের রস, আখের রস থেকে গুড় তৈরি করে সেই গুড় বাজারে বিক্রি করে সংসারের টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে আনে। মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও পরিবারের সকলের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয় নিমু হাওলাদার। একমাত্র কন্যা আয়েশার সামান্য চুল বাঁধার তাড়ার আবদারটুকুও মেটাতে পারে না সে। শুধু তাই নয়, মাটি দিয়ে ঘর লেপা শেষে আয়েশা কাপড়ের অভাবে ভিজে শাড়ি শুকানো পর্যন্ত পুকুরের পানিতে অবস্থান করে। স্ত্রী জরিনার মুখেও শোনা যায় আক্ষেপের সুর: 'এক শাড়ি ছেড়ে আরেক শাড়ি পরার ভাগ্য থাকলে তো আর কথাই ছিলো না।' (পৃ. ২১)

কিন্তু আক্ষেপ থাকলেও নিমু হাওলাদারের আদর্শ সঙ্গী হিসেবে স্ত্রী জরিনা স্বামীর স্বল্প আয়ের মধ্যে সংসারটাকে কোনোমতে টেনে নেবার চেষ্টায় সদাব্যস্ত। এই কাজে তাকে সাহায্য করে মেয়ে আয়েশা এবং শাশুড়ি। নিমু হাওলাদারের অভাবের সংসারে দৈনন্দিন আহারের সংস্থান হয় বিল বা পুকুর, ডোবা থেকে ধরে আনা মাছ কিংবা পুকুর-ডোবা থেকে তুলে আনা কলমি শাক, কচুর লতি, বাড়ির আঙ্গিনায় লাগানো পুঁই লতা কিংবা বড় গাছ জড়িয়ে বেড়ে ওঠা বুনো ধন্দুল পেড়ে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়। তাই প্রতিদিনই অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন যাপন করতে হয় তাদের। মেয়ে আয়েশার সঙ্গে জরিনার কথোপকথনে সেই সংশয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে এইভাবে: 'এবার ঐ বাপ-ব্যাটা কিছু নিয়ে না এলে আজ আর মুখে দেবার মত

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *সমুদ্রবাসর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

কিছু নেই। দ্যাখ দিকি আয়েশা, কাপড়টা ঘাটে রেখে তুই কয়েকটা কলমীর ডগা তুলে আনতে পারিস কিনা।' (পৃ. ২১)

নিমু হাওলাদারের ন্যায় প্রতিবেশী হাশেম মৃধাও প্রবল দারিদ্র্যপীড়িত। মৃধার শ্রী-ছাদহীন হতদরিদ্র গৃহ-পরিবেশের বর্ণনায় লেখক বলেছেন:

> হাশেম মৃধারও মাটির ঘর, খড়ের চাল। কিন্তু আশপাশগুলো একেবারে গাছপালা শূন্য। উঠান খা খা। কেবল একধারে একটা দড়িতে ঝুলছে কয়েকটা ছেড়া কাঁথা। তার ব্যাঙ্গাচির মত কিলবিল করা ছেলেমেয়েদের কেউ তার একটা পেশাবে ভিজিয়েছে বলে মনে হয়। আর উঠানের মাঝ বরাবর ঠাঁইয়ে একটা বাঁশের কুলার উপর কিছু ছোট ছোট তিতপুঁটি কি চাঁদা খলসে রোদে শুকোবার জন্য মেলে দেওয়া। দাওয়ার একধারে একটা ছেলে কি মেয়ে কাঁথা মুড়ি দিয়ে জ্বরে ধুঁকছে। অন্যগুলির চেহারার মধ্যেও যেন কোনো শ্রী ছাদ নেই।[১]

নিমু হাওলাদার, হাশেম মৃধার মত চুড়িওয়ালি নিঃসঙ্গ কদভানুর জীবনেও নিত্যসঙ্গী দারিদ্র্য। তার দারিদ্র্য ও নিঃসঙ্গতার চিত্র লেখকের দরদি কলমে এভাবে চিত্রিত হয়েছে –

> চুড়িওয়ালী কদভানু এখন একেবারেই কোমরভাঙা, লাঠিতে ভর দিয়ে ছাড়া উঠে দাঁড়াবারও শক্তি নেই। তার কুঁড়ে ঘরের অবস্থাও ততোধিক জরাজীর্ণ। একপাল বেড়াল আর উঠানের কি ঘরের চালার নিচে শালিক চড়ুই ছাড়া তার আর কেউ কোথাও নেই। দাওয়ার একধারে সে তন্দ্রায় পড়েছিল একটা ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে। নিমু হাওলাদারের সাড়া পেয়ে সে প্রথমটা একটু অবাক হয়ে যায়। অনেক কষ্টে একটা আধভাঙা জলচৌকি এনে ঝেড়ে পুছে তাকে বসতে দেয়।[২]

জোতদার জলিল মিঞার পরিবারের সদস্যদের অত্যাচারের শিকার হয়েই আজ কদভানুকে এমন দারিদ্র্যজীর্ণ ও নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

নবান্ন উপন্যাসে দারিদ্র্য ও অভাবের সাথে প্রতিনিয়ত সংগ্রামরত মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। জন্ম থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শিখে যায় অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ। বলা যায়, দারিদ্র্যের সর্বব্যাপী এক

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *যার সাথে যার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

দুষ্টচক্রের মধ্যেই অতিক্রান্ত হয় তাদের জীবন। লেখকের শক্তিশালী বর্ণনায় দারিদ্র্যের করাল চিত্র এভাবে ভাষারূপ পেয়েছে –

> পেটের খিদের জ্বালায় কাশেম তার বাড়ির চারধারের গাছপালাগুলোকেও কেটে খেয়েছে। বাড়ির কিনারায় আসতেই নজরে পড়েছে বারান্দার খাটালে কাশেমের বৌ এক পাল বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে পড়ে রয়েছে। জ্যোৎস্নার সাড়া পেলেও সূতিকায় ভোগা শরীর নিয়ে তার উঠে বসবারও শক্তি নেই।[১]

এ উপন্যাসের গফর খাঁ-এর পরিবারও অভাব-অনটনে জর্জরিত। 'ঘর-ভরা অজস্র সন্তান-সন্ততি' নিয়ে তার সংসার। তবে দারিদ্র্যের প্রকোপ থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টার অন্ত রাখে না সে। তাই গফর খাঁ-কে দেখা যায় অনেক বিপজ্জনক, ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও গর্তে হাত দিয়ে মাছ সংগ্রহ করছে জীবিকার প্রয়োজনে। পরিবারে একটার পর একটা নতুন মুখ যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভাব আরো প্রকট হয়ে উঠে। ফলে মৌলিক চাহিদা মেটাতে অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়ে কেউ কেউ। ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে চুরি-ডাকাতিতেও হাত পাকায় কেউ কেউ। অপরপক্ষে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যারা অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সক্ষম, তারাও চোর ডাকাতের উপদ্রবে নিরাপদ-নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করতে পারে না। পরিশ্রমী চাষি মুজফ্ফর মিঞার উদ্বেগাক্রান্ত উক্তিতে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ গ্রামীণ জনজীবনের এক কঠিন সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে–

> ঐ বিলের মধ্যে আগে মাছের অন্ত ছিলো না। এখন সবাই পোনাগুলো পর্যন্ত ধরে নিয়ে খেয়ে ফেলছে। ফল-ফলারি বাগানে তাকিয়েও চোখে পড়বে কিছু? খিদে যদি মিটেও যায় লোভের খাই আর শেষ হয় না। বাপদাদার কাছে শুনেছি একেক সময় আসমান কালো করে পঙ্গপাল ঝাঁপিয়ে পড়তো ক্ষেতের উপরে, দেখতে দেখতে সব খেয়ে শূন্য করে ফেলতো সাধের ফসল, মায় চারাকে পর্যন্ত। এখন আর পোকামাকড় নয়, রাজ্যের মানুষেই সেইরকমভাবে সবখানে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। নিজে এত পরিশ্রম করে এটা-সেটা ফলাই তাই নিয়ে বহুজনের চোখ টাটানিরও শেষ নেই। তাদের চোখে কেবল হিংসা ছাড়া কিছু দেখি না। মনে হয় একটু অসাবধান হলেই তারা চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদেরও ফকির করে ছাড়বে।[২]

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *নবান্ন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮১
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

অন্তঃসারশূন্য জরাজীর্ণ গ্রামীণ মানুষদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অবলোকন করলেও স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় কী নিদারুণ কষ্টে অতিবাহিত হয় তাদের জীবন। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে চিত্রায়িত হয়েছে সে কষ্টকর জীবনের প্রতিচ্ছবি–

> একটা প্রায় মজে আসা খালের উপরকার নড়বড়ে সাঁকো পার হয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ে পরনের কাপড় প্রায় খুলে ফেলে পানি কাঁদার মধ্যে ছ্যাক দিয়ে সামান্য দু-একটা মাছের পোনা ধরছে কালো কালো হাড় জিরজিরে দুটি রোগা বৌ। তার সাড়া পেয়ে কাদাভরা পানির মধ্যে তারা প্রায় গলাসমান লুকিয়ে পড়েছে। একটা শস্যক্ষেতের ধারে কাফিলা গাছের ডাল কেটে কেটে জড়ো করেছে মাথায় গামছা বাঁধা এক চাষী। তার সারা গায়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। একটা উলঙ্গ ছেলে রোগা গরুটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে বাড়ির দিকে। এক বাড়িয়ালের কাছ দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়েছে কেমন করে ধসে পড়েছে তার মাটির দেয়াল, উপরের বারান্দার চালের কাঠামোর খড়কুড়ো পর্যন্ত টেনেটুনে অন্য কাজে লাগিয়েছে।[১]

গ্রামীণ অন্ত্যজশ্রেণির মানুষদের দারিদ্র্যের প্রকটতা সম্পর্কে উপন্যাসের দয়াল চৌকিদার নিজেদের বোধ-বুদ্ধি ও অসচেতনতাকেই দায়ি করেছে। তার মতে – নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য ও বিচ্ছিন্নতার কারণে জমি ভাগের ফলে ফসল উৎপাদনেও ব্যাঘাত ঘটেছে। 'দেখাও দেখি আমাকে কোন বাড়িতে বারো ভাই তেরো আইল তুলে নিজেরাই নিজেদের দুর্দশা ডেকে আনেনি?' (পৃ.৩৩)। দরিদ্র পরিবারের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে তার অভিমত– 'পেটে দেবার মতো দানা নেই, তবু বিয়ে-শাদী আর বাচ্চা বিয়োবার তো কমতি হচ্ছে না।' (পৃ. ২৬)। মহাজন, দালাল, ফড়িয়াদের দৌরাত্ম্যের ব্যাপারে গ্রামের মানুষদের অসচেতনতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছে–

> আমাদের নিজেদের শত্রু আমরা নিজেরাই। ... কিছু দিতে নয়, কেবল নিতে আসার গরজেই ঐ মহাজনেরা এইসব ঘাটে এসে ডিঙ্গি বাঁধেন। আর আমরাই হিংসায় জ্বলে পুড়ে নিজেদের সর্বনাশ নিজেরা করার পথ দেখাই।[২]

দীর্ঘায়তন উপন্যাস *কাঞ্চনগ্রাম*-এও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম। কেবল দরিদ্র মানুষের জীবনচিত্র বর্ণনাই নয়, ইতিহাসের আলোকে

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

গ্রামবাংলার অভাব ও দারিদ্র্যের স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন তিনি। দারিদ্র্যকে তিনি বিচার করেছেন নিয়তিনির্দিষ্ট এক বিশাল জীবনধারার অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে। মানুষ আর প্রকৃতির সম্মিলনে জীবনের যে বিশাল-বিচিত্র আয়োজন, তাতে অভাব ও দারিদ্র্যও হয়ে উঠেছে এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। লেখকের মনে হয়েছে দুঃখ-দারিদ্র্য, দৈন্য-দুর্ভোগ যেন মানুষের জীবনধারারই একটি অংশ। মানুষ যখন প্রতিনিয়ত জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে লিপ্ত, অজ্ঞাত কোনো পরম শক্তি যেন ঠিক সেই সময় তাঁর 'দুর্জ্ঞেয় লীলাখেলা' নিয়ে অন্য কোথাও ব্যস্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের নানামুখী সমস্যা ও সংকটের দিকে নানাভাবে ইঙ্গিত করেছেন লেখক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবেশ দূষণ, যুদ্ধবিগ্রহের প্রভাবে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়া অভাব ও দারিদ্র্যের বিষবাস্প যে গ্রামের সমাজব্যবস্থাকে ক্রমশ স্থবির করে দিচ্ছে সেটি লেখকের সংবেদনশীল কলমে নানাভাবে ফুটে উঠেছে। দারিদ্র্যের করালগ্রাস থেকে মুক্তির জন্য সাধারণ মানুষের ক্রমাগত প্রচেষ্টাকে এক ধরনের যুদ্ধ হিসেবে দেখেছেন তিনি, যে যুদ্ধের আশু কোনো সমাপ্তি তাঁর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

সামন্তপ্রভু ও প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্য

বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থা ছিল সামন্ত বা আধা-সামন্ত প্রথা-নির্ভর। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস প্রণীত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদেশের সমাজব্যবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে শাসকদের অনুগ্রহধন্য একটি শ্রেণি ভূমিস্বত্বের ওপর যে একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করে আসছিল, সেটির অবসান ঘটে এবং হিন্দু বণিক ও মহাজনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে জমিদারদের নতুন একটি শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। 'স্থায়ী ভূমিস্বত্ব আইন উপ-সামন্তপ্রথা প্রক্রিয়ার সূচনা করে এবং পরবর্তীকালে উপরে জমিদার শ্রেণি ও নিচে বিরাটসংখ্যক ভূমি চাষিদের সমন্বয় ভূমি সম্পর্কের দিক থেকে রায়তি স্বত্বের বহুবিভাজন প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটায়। উপ-সামন্ত ব্যবস্থা যা বাংলায় পত্তনিধারী হিসেবেও পরিচিত, জোতদার, গনতিদার, হাওলাদার, তালুকদার এবং ভূঁইয়াদের মতো মধ্যবর্তী খাজনা সংগ্রাহকের সৃষ্টি করে। এর সামগ্রিক প্রভাবে ভূমিস্বার্থসংশ্লিষ্ট বহুবিভক্ত একটি সমাজের আবির্ভাব ঘটে।'[১] মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার শ্রেণির উদ্ভব প্রসঙ্গে গবেষকের ভাষ্য–

[১] রেবতী বর্মণ, *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫, ঢাকা, পৃ. ৭৮

> ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধি ও শাসন ব্যবস্থার চিরস্থায়িত্বের জন্য একটি একান্ত বশংবদ শ্রেণী সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ছিল আত্যন্তিক। ... এভাবে এক অভিনব ভূস্বামী শ্রেণীর আবির্ভাব হতে থাকে, এবং এঁরাই কর্নওয়ালিশের আশীর্বাদে ধনধান্যে গরিমায়, কৃষকের যাবতীয় ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে ঘরবাড়ি ভেঙে নিজেদের 'রাজা'বাবু পরিচয় ঘোষণা করে।[১]

বিশ শতকের শুরুতে বঙ্গভঙ্গ, বিশেষ করে সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত কোটা প্রথার সুবিধা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যেও ভূম্যধিকারী একটি শ্রেণির বিকাশ ঘটে। এই সম্পদশালী মুসলিম জনগোষ্ঠী মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজগঠনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক এই জমিদার শ্রেণির কাছে প্রজাহিত নয়, বরং নিজেদের ভোগবিলাসই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। গবেষকের ভাষায়–

> বাংলার দক্ষিণ-উপকূলীয় জেলাসমূহে মধ্যস্বত্ব-সমস্যা সবচাইতে বেশি প্রকট। এর কারণ অনেক। তবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কারণ জঙ্গলাকীর্ণ উপকূল অঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারণ পদ্ধতি। উপকূল অঞ্চলে কৃষি সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া চলে মধ্যস্বত্বাধিকারীর মাধ্যমে। ... মধ্যস্বত্ব-সমস্যা একদিকে উৎপাদন ব্যাহত করে, অপরদিকে খাজনার হারও অন্যায়ভাবে বাড়িয়ে দেয়।[২]

খাজনা আদায়সহ নানাবিধ শোষণমূলক কার্যক্রম অবাধে চালিয়ে যাওয়ার জন্যই ভূ-স্বামীরা প্রজাদের ভেতর থেকে সুবিধাভোগী একটি শ্রেণি সৃষ্টি করতেন। এই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি কেবল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই নয়, পল্লিবাংলার সামগ্রিক সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিসরেও নিজেদের প্রভাবকে ছড়িয়ে দেয়। সমাজের এই প্রভাবশালীদের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কেউ কেউ প্রতিবাদ করতে চাইলেও অধিকাংশ মানুষই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মুখ বুঁজে সকল অত্যাচার সহ্য করে যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পূর্ববাংলার ভূমি ব্যবস্থার পর্যালোচনাকালে উঠতি এই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির বহুমাত্রিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিদেশি গবেষকের ভাষ্য–

> সম্মিলিত কৃষক জোটের ক্ষেত্রে উপরের স্তরের প্রজাদের মূল্যবান ভূমিকা পালনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের আলোকে এভাবে এ এলাকার ভূস্বামীগণ 'সবচেয়ে প্রভাবশালী' প্রজাদের মৃধা ইত্যাদি হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং সামান্য

[১] অরবিন্দ পোদ্দার, 'শস্যের ভিতরে রৌদ্রঃ অন্বিষ্টের সন্ধানে সমাজমানস', *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
[২] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক কাঠামো*, প্রথম প্রকাশ, চয়নিকা, ঢাকা ২০০২ পৃ. ১৫৭

> সামাজিক সুবিধা ও অবৈধ করের ভাগ দিয়ে তাদের স্বদলে আনেন। ... প্রতিবেশী চাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অবগত কৃষককুল থেকে আগত এই সব লোককে কাজে লাগিয়ে ভূস্বামীগণ প্রজাদের সামাজিক ব্যাপারে ছাড়াও তাদের পারিবারিক ব্যাপারেও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। ... উল্লেখযোগ্য যে, এইসব পদ বংশানুক্রমিক ছিল না, অন্যদিকে তা 'অনেকটা নিলামের মতো করে' সর্বোচ্চ ডাক প্রদানকারীদের নিকট বিক্রয় করা হতো।[১]

বিশ শতকের শুরুতে ধনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ ঘুণপোকার মতো ভেতরে থেকে সামন্তসমাজের ভাঙনের সূচনা করে। পুরানো মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণা, অনুশাসন এবং রীতিনীতি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে শুরু করে। বাংলার গ্রামাঞ্চলে এই প্রক্রিয়াটি ধীরগতিতে এলেও সময়ের পরিক্রমায় সেটি ক্রমশ জোরদার হতে থাকে। সামন্তপ্রভুরা প্রাণান্ত চেষ্টা করে গ্রামজীবনে তাদের মৌরসি-পাট্টা জারি রাখতে; কিন্তু সময়ই তখন তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। শোষণ ও নির্যাতনের পাল্লা ভারি করে সামন্তসমাজ চেষ্টা চালায় তাদের ক্ষয়িষ্ণু আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখতে। ফলে বিশ শতকের প্রথমার্ধে সাধারণ প্রতিবাদী জনতার সাথে সামন্তপ্রভু ও তাদের বশংবদদের সংঘাতের ঘটনা বাড়তে থাকে।

মানবসমাজের সূচনালগ্ন থেকেই শোষক আর শোষিতের দ্বন্দ্ব চলমান। গ্রামবাংলাও তার বাইরে নয়। আবহমানকাল ধরেই এখানে ক্ষমতাভোগী শোষকের হাতে ক্ষমতাবঞ্চিত শোষিতরা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়ে আসছে। শোষকের সংখ্যা শোষিতের তুলনায় নগণ্য, কিন্তু সমাজব্যবস্থাটি তাদেরই গড়া। ফলে সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হয়েও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন চালাতে তারা দ্বিধান্বিত হয় না। এরা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর 'রক্তজল করা পরিশ্রমে আহৃত' সম্পদ সুচতুর কৌশলে লুণ্ঠন করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছে। কিন্তু গ্রামীণ অধিবাসীদের ভাগ্য পরিবর্তনে কোনো ভূমিকা রাখেনি। বরং তাদের অত্যাচারে পর্যুদস্ত হয়েছে সাধারণ মানুষ। যাদের কষ্টার্জিত সম্পদ হস্তগত করে সমাজপতিরা সম্পদের পাহাড় গড়ে সেই প্রান্তিক মানুষগুলো বরাবরই থেকে যায় অবহেলিত। *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসে লেখক বলেন 'অথচ সম্ভবত সেই মানুষ গোষ্ঠীই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে প্রকৃতির মতোই নিঃশব্দে সব ইতিহাস উপাখ্যানের ভিত্তিস্বরূপ জীবনকাব্যের কুশীলব।' (*সমুদ্রবাসর*, পৃ. ৯)। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে

[১] নারিয়াকি নাকাজাতো, *পূর্ব বাংলার ভূমিব্যবস্থা: ১৮৭০-১৯১০* (অনুবাদ: স্বরোচিষ সরকার, অনুবাদ সম্পাদনা: সিরাজুল ইসলাম ও রতনলাল চক্রবর্তী), প্রথম প্রকাশ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ২০০৪ পৃ. ১৯১

বহিরাগত শাসকদের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনধারণ করছে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা। 'কখনও মুখ বুঁজে সহ্য করেছে তাদের অত্যাচার। আবার কখনো বা শত্রুর হাতে লণ্ডভণ্ড হয়েছে তাদের সাধের সংসার।' (*সমুদ্রবাসর*, পৃ. ৯)। যে মনুষ্যগোষ্ঠীর অক্লান্ত শ্রমের বদৌলতে জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম এলাকা বাসযোগ্য হয়ে ওঠে সেই ভূমিই একসময় দখল হয়ে যায় কোনো ভূ-স্বামী কর্তৃক। আবার কখনো দেখা যায় 'ডাঙ্গার লোকালয় থেকে তাড়া খেয়ে খেয়ে' যে মানুষগুলো আশ্রয় নিয়েছিল এ জঙ্গলভরা অঞ্চলে, একসময় তাদেরকেই এই ভূ-খণ্ড ছেড়ে চলে যেতে হয় অন্য কোথাও। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, স্বার্থান্ধ সমাজপতিরা যে রূপ বা চেহারাতেই আবির্ভূত হোক না কেন, তাদের আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা বরদাস্ত করে না। বরং তাদের ভাষ্য – 'আমি মালিক হইয়া শাসন করিব, তোমরা শাসিত হইবে। ইহা বিধির বিধান। তাঁহার এবং আমার বশ্যতা স্বীকার করো আর লুণ্ঠিত ও অত্যাচারিত হইবে না।' অধিকারহীন নির্যাতিত মানুষগুলো প্রবল শাসন-শোষণকে বিধিলিপি বলে মেনে নেয়ার চেষ্টা করে, যদিও এরই মধ্যে কিছু মানুষ অত্যাচারীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টায় ব্রতী হয়।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে গ্রামীণ মানুষের জীবনে সামন্তপ্রভু ও প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্যের বিভিন্ন দিক উন্মোচন করেছেন। *আলমনগরের উপকথা* উপন্যাস ক্ষীরসায়র তথা আলমনগর নামে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বঙ্গোপসাগর-সন্নিহিত একটি জনপদের মানুষের জীবনকথা নিয়ে রচিত। এই সূত্রে তৎকালীন সময় ও সমাজকাঠামোর ভাঙনের চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে লেখকের সচেতন সমাজমানসেরই রূপায়ণ ঘটেছে। এ উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে একটি জমিদার পরিবার যেটি এ অঞ্চলে 'নবাব পরিবার' নামেই খ্যাত। এ পরিবারের ইতিহাস প্রাচীন। কয়েক শতাব্দী আগে মধ্য-ভারতের মোগল দরবারের পীর হজরত জামালুদ্দীন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে এসে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মানুষদের সরলতায় আকৃষ্ট হয়ে এখানেই বসতি স্থাপন করেন। পীর সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলমউদ্দিন গদিনশীন হলেন। তবে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ না করে তিনি দিল্লির বাদশাহর নিকট দূত প্রেরণ করেন পীরজাদা-র পরিবর্তে 'নবাব' হিসেবে অধিষ্ঠিত হলেন। পীরের মাজারে নিবেদিত অর্থে খাস জমি দখল করে তিনি গোড়াপত্তন করলেন নবাব বংশের। আর এভাবেই কয়েক পুরুষ পার হয়ে

আলমনগরের বর্তমান নবাবের হাতে পিতৃপুরুষের নবাবীর দায়িত্ব এসে পড়েছে। তবে বর্তমান নবাব একটু অন্য প্রকৃতির। নবাবী নয়, বরং শিল্প সাধনাতেই তিনি ব্যাপৃত থাকতে চান। তিনি বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেন কাব্য ও সঙ্গীতসাধনায়। *আলমনগরের উপকথা* উপন্যাসে আমরা জমিদারতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু, দুর্বল এক রূপ প্রত্যক্ষ করি, আবার এই পটভূমিতে বুর্জোয়া পুঁজিবাদী শোষকশ্রেণির মাথা তুলে দাঁড়ানোর চিত্রও অবলোকন করি। এদিক দিয়ে এ উপন্যাস বাংলার ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণের পরিচয়বাহী। আলমনগরের এক সময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নবাব পরিবারের সৌভাগ্যসূর্য অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাভোগী একটি শ্রেণি, যারা এক সময় নবাবদেরই আজ্ঞাবহ ছিল, তারা কীভাবে ধীরে ধীরে শাসক তথা শোষকের স্থানটি দখল করে নিচ্ছে তার স্পষ্ট একটি ছবি এ উপন্যাসে পাওয়া যায়।

নিজেদের অভিজাতবংশীয় বলে দাবি করা জমিদার এবং তাদের উচ্ছিষ্টভোগী মোড়ল, মাতব্বর, জোতদাররা শোষকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। নানাভাবে এরা গ্রামীণ নিম্নবিত্তের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। গোষ্ঠীপতিদের অনুমতি ছাড়া গ্রামের দরিদ্র মানুষদের হার্দিক কোনো সম্পর্কেরও যেন অধিকার নেই। *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হোসেন ভালোবাসে গঞ্জে আলীর কন্যা সখিনাকে। পিতৃ-মাতৃহীন নিঃসঙ্গ জীবনে বাল্যসখী সখিনাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পাওয়ার স্বপ্ন দেখে সে। কিন্তু সেই স্বপ্ন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, যখন সখিনার বিয়ে ঠিক হয়ে যায় অন্যত্র। যেখানে বিয়ে ঠিক হয়েছে সেখানে 'গঞ্জে আলীর লাহান ভিত-ভুঁই ছাড়া মানুষের পক্ষে রাজি না হইয়া' কোনো উপায় ছিল না। ফলে না পাওয়ার বেদনায় রুদ্ধ ক্রোধে ফুঁসে উঠলেও নিরুপায় হোসেন। এরকম পরিস্থিতিতে গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার এক কঠিন সত্য উন্মোচিত হয়েছে কানু শিকদারের দৃষ্টিতে – 'গাছের ফল, পুষ্করণীর মাছ, ক্ষেত-খামারের সেরা জিনিস, এমনকি ঘরের ঝি-বৌরেও কর্তাব্যক্তিদের ভোগে নেওয়ার নিয়মটাই সত্য হইয়া আছে।' প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্যের কাছে সাধারণ মানুষ সবসময়ই অসহায়। এ কারণে হোসেনের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শিকদার যখন বলে, 'তোমার আমার মত মানুষের উপর সব অবস্থা-ব্যবস্থা যেন কেবলই চোখ রাঙাইয়াছে', তখন প্রান্তিক মানুষদের প্রতি সহানুভূতিহীন নির্মম সমাজের অত্যাচারী রূপটাই যেন নতুন করে পরিস্ফুট হয়।

সমাজের যত বিধিবিধান, নিয়মনীতি কেবল দরিদ্র ও নিম্নবর্গের মানুষদের ক্ষেত্রেই যেন প্রযোজ্য। অন্যায়ের এই বাতাবরণ দীর্ঘ হতে হতে সাধারণ মানুষ ক্রমশ হতবল ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এ কারণে শিকদার যখন জোবেদাকে তার স্বামী-শাশুড়ির বিরুদ্ধে নির্যাতনের বিচার চাইতে বলে তখন জোবেদার কণ্ঠে ফুটে ওঠে তীব্র ক্ষোভ– 'রাজ্য-রাজা সাজাইয়া-সাজিয়া যারা প্রধান হইয়া বসে তারা কবে কখন কোন ন্যায়বিচারটা করেছে?' (পৃ. ২১৭)। সময়ের বির্বতনের সঙ্গে রাজ্য-রাষ্ট্রের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনের কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তারা কেবল ক্ষমতাবানদের প্রয়োজনই মিটিয়ে গেছে। *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসে দেখা যায় ফুঁসে-ওঠা সমুদ্রের রোষকে উপেক্ষা করে যেসব শ্রমজীবী মানুষ সমুদ্রের বক্ষ থেকে জীবিকার উপকরণ সংগ্রহ করে, তাদের শ্রমের ফসলকে বিভিন্ন কৌশলে আত্মসাৎ করে নিজের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করে স্থানীয় জোতদার মুজফ্ফর মিঞা। ধীবরপল্লির দলপতি সখানাথ ও তার সহকর্মীরা মাছ শিকারের সময় নতুন জাগা এক চরের সন্ধান পায়। কেউ কেউ সে চর নিজেদের দখলে রাখার ইচ্ছে প্রকাশ করলেও সহকর্মীদের অনুনয় উপেক্ষা করে নতুন জেগে ওঠা চরের সংবাদ মুজফ্ফর মিঞাকে জানিয়ে দেয় সখানাথ। কেননা সখানাথ জানে, মুজফ্ফর মিঞার শক্তির দাপটে এ চর আগলে রাখার সামর্থ্য তাদের নেই। গ্রাম-প্রধান কালুর বক্তব্যে ফুটে ওঠে মুজফ্ফর মিঞার দৌরাত্ম্যের চিত্র–

> ঐদিকে যে স্বয়ং মুজফ্ফর মিঞার সঙ্গে বিবাদে নামা সেইদিকে তোমাগো কেউ খেয়াল আছে। বলি, তোমাগো কী আগুনে পুড়িয়া মরার জন্য পিঁপড়ার মত ডানা গজাইছে।[১]

মুজফ্ফর মিঞার ক্ষমতা সম্পর্কে কালুর ধারণাই সত্য প্রমাণিত হয়। মনু মল্লিকের মত ক্ষমতাহীন মানুষদের স্বপ্নপূরণ তো দূরের কথা, লাঠিয়াল ইউসুফ সুজার লাঠির জোরে তার অস্তিত্বকেই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। নতুন চরের মাটিগর্ভেই মিশিয়ে দেয়া হয় মনু মল্লিকের নশ্বর দেহ। পরবর্তীতে খাসমহলের কেরাণিকে বশে এনে নতুন চরে দখলিস্বত্ব স্থাপন করে মুজফ্ফর মিঞা এবং চরের নাম দেয়া হয় ক্ষীরসায়র। ইতিহাসের পরিক্রমায় দেখা যায় লাঠিয়াল ইউসুফ সুজার পুত্র সুজাত আলী ক্ষীরসায়রে চাষাবাদের স্বপ্ন দেখে, তাই সে মুজফ্ফর মিঞার কাছ থেকে দুই হাজার টাকার বিনিময়ে নতুন চর ইজারা নিয়ে কৃষিকাজ শুরু করে। সুজাত আলী ও তার সহচরদের প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফলে ক্ষীরসায়রের জমিতে

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *সমুদ্রবাসর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

ফসল ফলে। কিন্তু সে ফসলের সুফল তারা ভোগ করতে পারে না। মুজফ্ফর মিঞার পোষা ডাকাতদলের হাতে পরিশ্রমী মানুষগুলোর সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। ডাকাতদের প্রতিহত করতে গিয়ে প্রাণ হারায় গনু নামের এক নিরীহ কৃষক। হাতেনাতে ধরতে না পারলেও তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এ ঘৃণ্য কাজটির পিছনে কার হাত সক্রিয়। লাঠিয়াল ইউসুফ সুজাকে দিয়ে নানা কার্য উদ্ধার করলেও তারই পুত্র সুজাত আলীর কষ্টার্জিত ফসল ছিনিয়ে নিতে এতটুকু দ্বিধা করেনি মুজফ্ফর মিঞা। একইভাবে পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে মুজফ্ফর মিঞার কঠোরতার নিদর্শন পাই মনু মল্লিকের প্রতি তার উক্তিতেও –

> ওইসব প্যাঁচালে কোন লাভ হইবে না মনু মল্লিক। এইবার ফসল ভালো হয় নাই, আরেকবার খরার দোহাই, আমি দানছত্র খুলিয়া কাঙাল খাওয়াইতে বসি নাই। এখন তুমি যাও, যেমন করিয়া হউক, বাকি-বকেয়া শোধের উপায় বাহির কর।[১]

স্বভাবতই প্রভাবশালীদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাধ্য গ্রামের সাধারণ মানুষদের হয় না। যারা মুখ বুঁজে দুঃশাসন সহ্য করতে পেরেছে তাদের এই মুল্লুকে ঠাঁই হয়েছে যারা পারেনি তাদের পড়তে হয়েছে নানা বিপাকে, পোহাতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। *জায়জঙ্গল* উপন্যাসে দেখা যায় জোতদার-মহাজনরা কীভাবে গ্রামের মানুষদের ওপরও প্রভাব খাটিয়ে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে নিজেরা ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। এ অঞ্চলের প্রতিটি তালুক কোনো না কোনো মহাজনের অধীনে এবং অধিবাসীদের প্রায় সবাই কোনো না কোনো মহাজনের অধীনে দিনমজুরের কাজ করে। তাদের সুখ-সুবিধার দিকে মহাজনদের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। যেকোনো উপায়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিলেই তারা ব্যস্ত। মহাজন জলিল মিঞা সম্পর্কে জয়নাল শেখের মন্তব্য –'জলিল মিঞা যে সেইসব বোঝতে চায় না। তার গরজ মতো কাম না করতে পারলে সে পাইক-পেয়াদা দিয়ে খেদাইয়া দেয়, সেই জায়গা দেয় নতুন মানুষরে। এইসব বিষয়ে তার দয়া-মায়া বিবেচনা থাকলে তো কথাই আছিলো না।' (পৃ. ৫১)। কেবল ধনসম্পদ নয়, এসব জোতদার-মহাজনদের নারীলিপ্সাও প্রবল। সুযোগ পেলেই নারীর অসহায়ত্বকে হাতিয়ার করে তাকে ভোগ করার চেষ্টা করে। এদের মধ্যে রয়েছে একাধিক বিয়ে করার প্রবণতাও। *জায়জঙ্গল* উপন্যাসে তালুকদার জলিল মিয়ার নজর পড়ে তার অধীনে কর্মরত জয়নাল শেখের অল্পবয়সী বোন সাজুর ওপর। জলিল মিয়ার লোভীদৃষ্টি থেকে বোনকে কীভাবে রক্ষা করবে তা ভেবে জয়নাল শেখ হয়ে পড়ে উদ্বিগ্ন। কেবল মহাজন-

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

তালুকদার নয়, তাদের পাইক-পেয়াদাদের দৌরাত্ম্যও কম নয়। জলিল মিঞা কিছুদিনের জন্য শহরে গেলে তার অনুপস্থিতির সুযোগে তার পেয়াদা মোকাম্মেল সাজুকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু জয়নাল শেখ রাজি না হলে মোকাম্মেল লোক-লস্কর দিয়ে জোরপূর্বক সাজুকে তুলে নিয়ে যায়। *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসে লম্পট জমিদার মুজফ্ফর মিঞার নজর পড়ে মনু মল্লিকের সুন্দরী স্ত্রী জরিনার ওপর। জরিনাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের কবলে আনার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে সে। মনু মল্লিকের মৃত্যুর পর তার বাড়িতে এসে খোঁজ-খবর, সাহায্য-সহযোগিতার নামে নানা অপপ্রস্তাব দেয়। প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষণীয় –

> আমি তো কথা দিলাম। আমার ওখানে তোমার কোনো অসুবিধা হইবে না। এইখানে তোমার মত সুন্দরী যুবতী মাইয়ার একলা থাকন ঠিক না। এখানে পশুরেও হয়তো ঠেকাইয়া রাখন যায়, কিন্তু মানুষের হাত থেকিয়া নিস্তার নাই। ... মনে রাখিও বেটি এই ভিটা আঙ্গার করিয়া মিশাইয়া দিতে একটা রাত্তিরও লাগবে না। তখন উঠবা কোথায়? বেশ, যা কইলাম, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করিয়া ভাবিয়া দেখো।[১]

কূটকৌশলী মুজফ্ফর মিঞা ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পুনর্বার বিয়ে করার বিষয়ে নানা যুক্তি তুলে ধরার চেষ্টা করে। খাসমহলের কেরানির কাছে বহুবিবাহ বিষয়ক খোঁড়া যুক্তি প্রদর্শনের মধ্যেও তার কপট মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে–

> আপনাগো তো আর ঐ জল-জঙ্গলে থাকতে হয় না। কবিলা কী ইচ্ছা করিয়াই লইতে হয়? হালিয়া চাষাগুলার পেটে ভাত জোটে না। কিন্তু ঘরের বউ কেবল বিয়াই যাই চলছে। তায় সবই মাইয়া মাইয়া আর মাইয়া। ঐ দেশে বিয়া দেওনেরও তেমন মানুষ জোটে না, তখন আকাম কুকাম এড়ানোর লাইগা এরে তারে উদ্ধার করা ছাড়া উপায় থাকে না।[২]

জোতদার ও ভূস্বামীদের প্রবল প্রতাপ বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের একটি সাধারণ চিত্র। *যার সাথে যার* উপন্যাসে জলিল মিঞা নামে এমনই এক চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই যার সহজাত বৈশিষ্ট্য নিষ্ঠুরতা, চরিত্রহীনতা ও অসহায় মানুষের ওপর সর্বপ্রকারে নির্যাতন। তার পরিবারের আদি ইতিহাস কলঙ্কময়। গ্রামের একমাত্র বিলটিসহ নানা মানুষের সম্পদ হস্তগত করায় সে সিদ্ধহস্ত। বশংবদ মনু মিয়ার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১০
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

ওপর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম রাখে জলিল মিঞা। গ্রামের নিরীহ মানুষের রক্ত চুষে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে সে। তার বসতবাড়ির ঐশ্বর্যময়তার চিত্র নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন লেখক–

> মস্তবড় উঠানের চারদিকে চারটি টিনের ঘর। ঘিরে রেখেছে সীমা-সুমারহীন গাছ-গাছালির বাগান। দক্ষিণে তার আসল ঘর, উত্তরে কাছারী, পাশে মধুমিয়া ঘর, আর অন্যদিকে কাজকর্মের সময় ঠাঁই নেয় জন-মানুষ-কামলা। চাল দেওয়া দাওয়ার আরাম কেদারায় শুয়ে জলিল মিঞা রেডিও শোনে, কখনও এর তার সঙ্গে গল্পগুজব করে। হাঁক না দিতেই দু-তিনটে চাকর বাকর হুকুম তালিমের জন্য এসে জড়ো হয়।[১]

জলিল মিঞা নিজের বংশপরিচয় নিয়ে বেশ গর্বিত। কথাচ্ছলে নিমু হাওলাদারকে সে এটিও জানিয়ে দেয় যে, 'আমাদের মত সৈয়দ-কাজী বংশে সম্পর্ক করতে পারা সহজ বিষয় নয়।' তার পূর্বপুরুষরা মাত্র দু পুরুষ পূর্বে এ অঞ্চলে বাসস্থান গড়ে তুলেছিল। তার পূর্বপুরুষদের পরিচয় লেখকের ভাষায় ফুটে উঠেছে এভাবে–

> জলিল মিঞার প্রপিতামহের ব্যবসা বা পেশা ছিল ধর্মগুরুর। কেউ বলে এখানের এক শিষ্য বাড়িতে এসে সে আর নড়বার নাম করেনি। করবে কেন, তার খাদ্য চোষ্য লেহ্য পেয়র কোনো অভাব ছিল না শিষ্যদের কৃপায়। তাদের বৌ-ঝিরাও তাকে পুজা করত স্বয়ং ভগবান রূপে। শিষ্যদের কুমারী কন্যারা রজঃস্বলা হবার পর সেই গুরুর আশীর্বাদ না হলে তার সম্বন্ধ হত না।[২]

পরবর্তীকালে তার বংশধরেরা গুরুগিরির পরিবর্তে বিষয়-সম্পত্তির প্রতি অধিক মনোযোগী হয়। যুদ্ধ-পরবর্তী আকালের সময় পিতার সঙ্গে তার ভাইয়ের তুমুল বিবাদ চলে। বিবাদের সূত্র ধরে জলিল মিঞার পিতা তার ভাইকে বিলের পানিতে ডুবিয়ে মারে। কথিত আছে – 'তাদেরকে খুন করার রাতে প্রথমে আদর করে ধুতুরা বীজ আর শকুনের মাংস খাইয়ে পাগল করে তারপর হত্যা করে।' কিন্তু সেই দুর্গতির মধ্যেও মাগন ফকির নামে জলিল মিঞার এক চাচাত ভাই বেঁচে গিয়েছিল। সেই মাগন ফকিরকে আশ্রয় দিয়েছিল কদভানু। যার পরিণামে কদভানুর পরিবারও ধ্বংস হয়ে যায়।

---

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *যার সাথে যার*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৭

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

যার সাথে যার উপন্যাসের শোষক শ্রেণির প্রতিভূ জোতদার জলিল মিঞার ছেলেমেয়েদের অনেক বয়স হয়ে গেলেও গ্রামে এক স্ত্রীর পাশাপাশি সে শহরেও এক তরুণী স্ত্রী নিয়ে সংসার করছে। এখানেই শেষ নয়, রূপবতী কোনো যুবতীই তার লালসার আগুন থেকে নিষ্কৃতি পায় না। এভাবেই একসময় নিমু হাওলাদারের তন্বী তরুণী আয়েশার দিকে নজর পড়ে। নিমু হাওলাদারকে বিলের অংশীদারিত্ব দেবার লোভ দেখিয়ে সে মধু মিয়ার অপ্রকৃতিস্থ পুত্র গফুরের সঙ্গে আয়েশার বিয়ের প্রস্তাব দেয়, যদিও তার উদ্দেশ্য আয়েশাকে নিজেই ভোগ করা। বিলের অংশীদারিত্ব পেয়ে অভাব মোচনের লোভে প্রতিবেশী হাশেম মৃধাসহ গ্রামের আর দশজনের সুপরামর্শও অগ্রাহ্য করে জলিল মিঞার ফাঁদে পা দেয় নিমু হাওলাদার। মধু মিয়ার দাবি অনুযায়ী অনেক কষ্ট করে যৌতুক হিসেবে একটি হাতঘড়ি দিলেও কোট-প্যান্ট দিতে অপারগ হয় নিমু হাওলাদার, এজন্য বিয়ের আসর থেকেই রাগ দেখিয়ে উঠে যায় মধু মিয়া। যদিও নিমু হাওলাদারকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে পাশের গ্রামের হিঙ্গুল দফাদারের দলবলের কাছে বিলের অংশীদারিত্ব হস্তান্তর করে দেয় জলিল মিঞা। এদিকে বিয়ের পরপরই জলিল মিঞার উদগ্র কামনার শিকার হতে হয় আয়েশাকে। লেখকের বর্ণনায়–

> জলিল মিঞা তবু ক্ষান্ত হয়নি। তার সেই অদ্ভূত চোখ মুখের হাসি বাতির আলোয় কিছু উজ্জ্বল কিছু রহস্যময় করে সে বলেছে: এই-ই বাড়ির নিয়ম। প্রথম দাবি গুরুজনের। তবে ভাবছি, এর পরেও আর ঐ গফরাকে তোকে ছুঁতে দেবো না।
>
> জলিল মিঞার শরীরের চাপে হাঁস ফাঁস করেছে আয়েশা। তাকে দ্রুত-হাতে উলঙ্গ করে তার আলিঙ্গন আশ্লেষে, মর্দনে-নিপীড়নে, চুম্বনে-দংশনের আক্রোশে ভয় পেয়ে আর্তিতে চিৎকার করে উঠতে চেয়েছে আয়েশা। জলিল মিঞা তৎক্ষণাৎ তার মুখে হাত চেপে শাসিয়ে উঠেছে: চুপ! খামোশ! এ বাড়ির কোনো বৌ আমার সঙ্গে এরকম বেয়াদবির সাহস করেনি। এমন করলে তোর আর এ সংসারে কোনো কল্যাণ হবে না।[১]

এক পর্যায়ে নির্যাতিত আয়েশাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনে নিমু হাওলাদার। জলিল মিঞার অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য গ্রামের অনেকেই তাকে উৎসাহ দিলেও স্বভাবগত কারণেই নিজের বিপদ নিজেই সামলাতে মনস্থ করে নিমু হাওলাদার। মিঞা পরিবারের অত্যাচারের শিকার বৃদ্ধা কদভানুর কাছে আয়েশার ওপর জলিল মিঞার অত্যাচারের বিষয়ে জানতে চায় নিমু হাওলাদার, প্রথমে অনিচ্ছা দেখালেও

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

এক পর্যায়ে কদভানু মিঞাদের বংশপরম্পরায় অত্যাচার-নির্যাতনের অনেক কাহিনি খুলে বলে নিমু হাওলাদারকে। তার কাছেই নিমু হাওলাদার জানতে পারে, জলিল মিঞার এক জ্ঞাতি ভাই মাগন ফকিরও ঐ পরিবারের অত্যাচারের শিকার হয়ে পাগলের মত এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই মাগন ঠাকুরকে নিয়ে গ্রামে অনেক গালগল্প প্রচলিত আছে। নিমু হাওলাদারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অপরাধে জলিল মিঞার নির্দেশে বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে কদভানুকেও পুড়িয়ে মারে মধু মিয়া।

আবহমানকাল ধরেই বাংলার লোকজীবনে জমিদার, মহাজন, দালাল-ফড়িয়া ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য দেখা যায়। তাদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাধ্য কারো হয়নি। যারা এ দুঃশাসন মুখ বুজে সহ্য করেছে তাদের এই মুল্লুকে ঠাঁই হয়েছে; আর যারা পারেনি তাদের পড়তে হয়েছে নানা বিপাকে, পোহাতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। ভূস্বামীদের নির্দেশে তাদের সহযোগীদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কাউকে কাউকে হতে হয়েছে রাজ্য ছাড়া, কাউকে বিদায় নিতে হয়েছে পৃথিবী থেকেই। *নবান্ন* উপন্যাসের জমিদারের সহযোগী শ্রেণির একজন গগন শেখের পুত্র দয়াল চৌকিদার। তার দেখা নানা অত্যাচারের চিত্র ফুটে উঠেছে লেখকের বর্ণনায়:

> সময়মত খাজনা দিতে না পারায় কতোজনের ঘর পুড়েছে, উচ্ছেদ উৎখাত হয়ে গাঙে ভেসে কোথায় চলে গেছে, যার আর অন্য উদ্দেশ মেলেনি। মনে পড়েছে সেই গগন শেখের সঙ্গে দেখা এক বাড়ির চাষী কাছারীর দাবি মেটাতে না পেরে পাগলের মতো নিজ পরিবার-পরিজনদের কেটে নিজেও কেমন করে একটা আমগাছের ডালের সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়েছে। সবাই বলেছে, পাগল লোকটার মাথার ঠিক ছিল না, না ছিল কাজকর্মের পটুত্ব। কিন্তু কিশোর দয়ালের চোখ এড়ায়নি কেমন করে জ্বরজারি আর হাঁপানীর টান নিয়েও সে কেমন করে খরার ক্ষেতে পানি সেঁচেছে। যে পাগল, যে রুগ্ন অথবা নানান অজুহাত দেখিয়ে মালিকের খাজনা জোগাতে পারবে না তার এ মুলুকে কোনো ঠাঁই নেই। নায়েব মশাইর কড়া হুকুম গগন শেখ চতুর্গুণ জোর দিয়ে বেড়িয়েছে সবখানে। সেই আমলে কিশোর দয়ালের চোখে পড়ত, উঠানের কাছাকাছি গগন শেখকে দেখামাত্রই চাষীরা কী তাদের বৌ ঝিরা কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে কেঁপেছে।[১]

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *নবান্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

জমিদার, নায়েব, মহাজন ছাড়াও দালাল-ফড়িয়াদের দৌরাত্ম্যও গ্রামীণ জীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। কৃষিনির্ভর গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা ও নিরাপত্তাহীনতাকে পুঁজি করে তারা তাদের অমানবিক ব্যবসার জাল বিছায়। নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে সাধারণ মানুষদের। যুগে যুগে আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় নানা পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু দালাল ও ফড়িয়াদের দৌরাত্ম্য তাতে খুব একটা কমেনি। *নবান্ন* উপন্যাসেও এই শ্রেণির মানুষদের প্রতাপ চোখে পড়ে। লেখকের বর্ণনায়–

> আগের দিনের ঐ রাজা-নায়েবরা কাছারীতে বসে খাজনার টাকা গোণা ছাড়া অভ্যন্তরে তেমন কেউ একটা পা বাড়ায়নি। কেউর ঝি-বৌদের দরকার পড়লেও তারও একটা না একটা ব্যবস্থা হতো। গাঁ গ্রামের মানুষগুলি জনকে জনের ভালাইর ভেক ধরতো না বড় একটা কেউ। এখন তাদের সবাইকে ডেকে এনে নসিহত শোনাতে ব্যস্ত ঐসব গুরু মহাজনরা। এক এক ঘাটে ডিঙি বাঁধেন, যা কিছু চোখে পড়ে দু-হাতে লোটেন আর গলা উঁচিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে ওয়াজ করেন – চাষী ভাইসব দেশের উন্নতি নির্ভর করছে আপনাদের উপর। আরো, আরো বেশি ফসল ফলান। আগামী বছরে দেখতে চাই আপনাদের এই এলাকায় ফসল দু-গুণ হয়েছে।[১]

ফড়িয়াদের কারণে কৃষিজীবীরা তাদের মেহনতের ফল পায় না। দিনমান পরিশ্রমে গায়ের রক্ত পানি করে তারা যে ফসল উৎপাদন করে তা বিক্রি করে পরিবারের মুখে দু বেলা আহার জোগানোর মতো অর্থও জোগাড় করতে পারে না। ফলে দেখা যায়, তাদের শ্রমে-ঘামে উৎপাদিত ফসল কোটি মানুষের মুখে আহার জোগালেও দিনের পর দিন তাদের নিজেদের অবস্থা থেকে যায় মানবেতর; সে অবস্থার আর কোনো উন্নতি ঘটে না।

নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি অন্যায়-আচরণের আরেক নিদর্শন *নবান্ন* উপন্যাসের দয়াল চৌকিদারের সঙ্গে মোসলেমার বিবাহ প্রসঙ্গটি। দয়াল চৌকিদারের বাবা গগন শেখ ছিলেন জমিদারের পেয়াদা। মোসলেমারা ছিল হিন্দু পরিবারের। তার নাম ছিল পুণ্যশশী। কী এক কারণে পুণ্যশশীর বাবা নায়েব মশাইয়ের রোষানলে পড়লে তাদের হয়ে হম্বিতম্বি করতে গিয়ে পুণ্যশশীর প্রতি চোখ পড়ে গগন শেখের। তাই 'গগন শেখ একদিন তাদের বাড়ি চড়াও হয়ে জোর করেই তাকে ধরে নিয়ে এলো।' পুণ্যশশী কী পূর্ণিমার বয়স তখন এগারো কী বারো, দয়ালের পনেরো। তাছাড়া বিয়ের রাতে দয়ালের সঙ্গে আলাপকালে পুণ্যশশীর

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

উচ্চারিত কথামালায় বের হয়ে আসে শোষক শ্রেণির বঞ্চনার শিকার জনগোষ্ঠীর অসহায়ত্বের চাপা কষ্টের কথা–

> তোমার বাপ কেবল আমাকে টেনে এনেই ক্ষান্ত হবার নয়, সে সেই সঙ্গে অর্ধেক সম্পত্তিরও ভাগ চেয়ে এসেছে। এখন আর তাদের এমন কোনও সাধ্য নেই যে কিছু করে। আমার মায়া ছেড়ে হয়তো তারা মগের মুলুকের দিকেই ভেসে চলে যাবে। শুনেছি তো, এই করে ধীরে ধীরে আমরা এই এতো বড়ো দেশের এই প্রান্তে এসে ঠেকেছি। ... লোকালয় ছেড়ে দূরে চলে এসেও আমরা রাজ্য রাজারদাপট এড়িয়ে থাকতে পারছি না।[১]

আলমনগরের উপকথা উপন্যাসের নবাব বাড়ির এককালের বাবুর্চি মীর খাঁও এ শ্রেণির মানুষেরই প্রতিভূ। পিতার তেজারতির কারবারে যোগ দিয়ে নিজের অবস্থাকে আমূল পাল্টে ফেলে সে। শঠতা, অর্থগৃধ্নুতা ও নারীলিপ্সা তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। দরিদ্র কৃষক রতনের বোন কুলসুমের প্রতি তার কুদৃষ্টি পড়েছিলো। তাই মিথ্যা মামলায় কুলসুমের স্বামীকে জেলে পাঠিয়ে কুলসুমকে পাওয়ার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় 'হয়তো কোনো উপায়েই না পারিয়া সে এই পথে তাহাকে অপহরণ করিয়াছে।' নারী সম্ভোগ বিষয়ে মীর খাঁ-এর কুৎসিত মানসিকতার চিত্র ফুটে উঠে লেখকের বর্ণনায়–

> মেয়ে মানুষের দেহ মীর খাঁ বহু নাড়াচাড়া করিয়াছে, তাহার পয়সার লোভে বহু মেয়েই রাত্রির অন্ধকার তাহার শয্যায় উঠিয়া আসিয়াছে, কেহবা কিছুদিন বাস করিয়াছে ঝি হইয়া। তাহাদের কাহাকেও মীর খাঁর মনে ধরে নাই। বীর্যবান পুরুষ কী করিয়া এক নারীতে আসক্ত থাকিতে পারে, ভাবিয়া সে আপন মনেই বহু দিন ব্যঙ্গ করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছে। একবার যাহাকে সে ভোগ করে, পরে সে আর ফিরিয়াও তাকায় না।[২]

শোষণ আর বঞ্চনা যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে তখন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই রুখে দাঁড়ায় বঞ্চিত মানুষ। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া এসব মানুষ তখন যে কোনোভাবেই হোক নিজ অধিকার আদায়ে মরিয়া হয়ে ওঠে। স্মরণাতীতকাল ধরেই বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ভূ-স্বামী ও ভূমিহীন, ধনী ও নির্ধনের মধ্যে দ্বন্দ্বের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। সাধারণভাবে বংশমর্যাদা ও ভূ-সম্পদের বিচারেই সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস নির্ণায়িত হলেও পেশা, শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক যোগাযোগ ইত্যাদি আরো কিছু বিষয়ও এতে প্রভাব ফেলে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যায়, বাংলার কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জনপদে ব্রিটিশ শাসকদের চাপিয়ে দেয়া

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *আলমনগরের উপকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমির ওপর সাধারণ মানুষের অধিকার খর্ব হয় এবং জমিদার ও জোতদারের মতো অত্যাচারী শাসকশ্রেণির দৌরাত্ম্য বাড়ে। নিজেদের কায়েমি স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রাখতে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় তারা। ফলে গ্রামের মানুষ ক্রমে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে থাকে। দারিদ্র্য ও শোষণের কশাঘাতে বিপর্যস্ত মানুষ অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনে ক্রমেই প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ১৯২০-এর দশকে কৃষক প্রজা পার্টি ও নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির মতো কৃষকনির্ভর রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব এই প্রতিবাদী সত্তারই বহিঃপ্রকাশ। ১৯৪০-এর দশকের তেভাগা আন্দোলন কৃষকদের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামেরই এক তুঙ্গস্পর্শী রূপ। এর বাইরেও স্থানীয় পর্যায়ে কৃষকসহ সাধারণ মানুষ আরো অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তুলেছে, যেগুলো পেশীশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করার প্রয়াস নিয়েছে জমিদার-জোতদার-মহাজনসহ কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীগুলো। শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর উপন্যাসে শোষিত ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সংগ্রামীচেতনার নানাদিক উন্মোচনে আদর্শবাদী সমাজসচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন।

আলমনগরের উপকথা উপন্যাসে শোষিত মানুষের প্রতিবাদের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বের একদিকে আছে তোফেল আর রতনের মত শোষণ আর দারিদ্র্যের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষ, আর অন্যদিকে আছে মীর খাঁ-র মত নির্মম সামন্তপ্রভু। এ উপন্যাসে দেখা যায় দরিদ্র ও অসহায় মানুষের ওপর শোষক শ্রেণির একতরফা অত্যাচার ও লাঞ্ছনা চলতে থাকে। এটি যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন একদিন শোষিত জনগোষ্ঠী প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং তাদের প্রতিরোধের বহ্নিতে শোষক শ্রেণির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। আলমনগরের দরিদ্র কৃষক রতন এই প্রতিবাদী মানুষদেরই প্রতিনিধি। পরিবারের অসুস্থ সদস্যদের চিকিৎসার জন্য মীর খাঁর কাছে সাহায্য চায়। মীর খাঁ তাচ্ছিল্যভরে তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে রতন বলে, 'কিন্তু মনে রেখো খাঁ সাহেব, সাত গাঁয়ের মানুষকে লুটে তুমি বড় হয়েছো, মানুষকে দয়া মহব্বত করে তবু পাপ কাটাতে পারতে।' পরবর্তীকালে তার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে মীর খাঁ যখন তার বিধবা বোন কুলসুমের বিনিময়ে টাকা ধার দেয়ার ঘৃণ্য প্রস্তাব করে তখন উভয়ের মধ্যে বচসা তীব্রতর হয়, যার প্রতিক্রিয়ায় মীর খাঁ রতনের গায়ে হাত তোলে। রতনও তখন আর মুখ বুঁজে নির্যাতন সহ্য করে না। উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি–

কী, আমার গায়ে তুমি হাত তুললে! তুমি কী ভেবেছো তোমার খাতক বলে এতো অপমান সহ্য করে যাবো? কক্ষনো না। তেমার মতো কুত্তাকে কী করে শায়েস্তা করতে হয়, তা আজ দেখিয়ে দেবো – বলিয়া রতন মারমুখী হইয়া মীর খাঁর দিকে আগাইয়া গেল। তাহার চোখের সেই ভয়ানক দৃষ্টি দেখিয়া মীর খাঁ ভয় পাইয়া গেল। চেষ্টা করিল পলাইতে, কিন্তু রতন ততোক্ষণে তাহার গায়ের উপর ঝাপাইয়া পড়িয়া সাঁড়াশীর মতো দুই হাতে গলা চাপিয়া ধরিয়াছে।[১]

সমুদ্রবাসর উপন্যাসে মৎস্যশিকারিরা সমুদ্রগর্ভে জেগে উঠা নতুন চরের সন্ধানপ্রাপ্তির পর সে চরের দখল প্রসঙ্গে দলের সদস্যদের মধ্যে আলাপের সূত্রে সমুদ্র-উপকূলবাসী শোষিত জনগোষ্ঠীর সচেতন শ্রেণিচেতনার পরিচয় মেলে। দলের প্রধান সখানাথ চরের দখল নিতে ভয় পেলেও মনু মল্লিকের মতো তরুণ প্রজন্মের কেউ কেউ সামন্ত প্রভুদের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। তার প্রতিবাদী উক্তি: 'পলাইয়া তো এখন এইখানে আসিয়া ঠেকছি। এইবার ঠিক করছি আর ঐরকম পিছু হটন না, এইবার মুখামুখী ঘুরিয়া খাড়া হইতে হইবে।' (পৃ. ৩৪-৩৫)। এ উপন্যাসে দরিদ্র গ্রামবাসীকে একদিকে বিরূপ প্রকৃতির সঙ্গে; অন্যদিকে জোতদার, ফড়িয়া-দালাল ইত্যাদি শ্রেণির সাথে সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়। প্রকৃতির রুদ্ররোষকে উপেক্ষা করে চলা এসব অকুতোভয় মানুষই আবার মুষ্টিমেয় কিছু শোষকের প্রতাপের কাছে হার মানে। তবে শোষণ আর অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেলে অনেকেই আবার প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। মনু মল্লিকের মতো চান্দুর কণ্ঠেও প্রতিবাদী সুরের প্রতিধ্বনি শোনা যায়– 'প্রত্যেকদিনই তো যুদ্ধ করিতে হইতে আছে। জঙ্গলের পশুও শাসন করা যায়। কিন্তু অত্যাচার সহ্য করিয়া যাওয়ার কোনো অর্থ নাই।' (পৃ. ৪১)। অন্যত্র ক্ষীরসায়রের নারী বাসিন্দা করিমনকেও বলতে শোনা যায়– 'অবিচার সহ্য করিয়া যাওয়া কোনো কামের কথা না।' নতুন জাগা জঙ্গলাকীর্ণ জমিকে চাষযোগ্য করা এবং দিন-রাত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে চরের বাসিন্দারা ফসল উৎপাদন করে। কিন্তু ফসল ঘরে তোলার উৎসবলগ্নে প্রথমে ফড়িয়া-দালালদের দৌরাত্ম্য এবং পরবর্তীকালে রাতের আঁধারে সে ফসল ডাকাতি করে নিয়ে যায় শোষকশ্রেণির প্রতিভূ মুজফ্ফর মিঞার লোক। এরকম পরিস্থিতিতে সাধারণ জনমনে প্রচণ্ড ক্ষোভ দেখা যায়। তবে শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো ক্ষমতা এখনো তাদের তৈরি হয়নি। এ প্রসঙ্গে সিকুর মন্তব্য – 'কেবল গায়ের জোরে তাগো সঙ্গে লড়ন যাইবে না। যা-কিছু করতে হয় কৌশলে

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

করতে হইবে।' সিকুর মন্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে পেশিবলে তারা সবল হলেও সমাজকাঠামোর বেড়াজালে বন্দি এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দুর্বলতা অন্যত্র। তবে এ অন্যায়-অত্যাচার দীর্ঘদিন চলতে পারে না তারই ইঙ্গিত ফুটে উঠে সুজাত আলীর প্রতিবাদী কণ্ঠে – 'আমি তো দেখতে আছি যাগো আদম খাছলতই মন্দ তাগো লগে মানিয়া মানিয়া বেশিদূর যাওন যায় না। একটা সময় আসে যখন সেই সম্পর্ক আর টিকাইয়া রাখন যায় না।'

জায়জঙ্গল উপন্যাসেও দেখা যায় জোতদার-মহাজনদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের দ্বন্দ্ব। জোতদার-মহাজনদের অন্যায়-অত্যাচারে অতিষ্ঠ সব তালুকের প্রজাসাধারণের মধ্যে দেখা দেয় শ্রেণিচেতনা। তাদের মতে, এ উড়ে এসে জুড়ে বসা রক্তচোষা জোতদার-মহাজনদের জন্য 'জান দেওয়ার মধ্যে বাস্তবিক কোন ফায়দা নাই। জোঁকের মতোই তারা দিনের পর দিন কেবল মোটা হইতে আছে, আর আমাগো কপালে কী জুটতে আছে।' জলিল মিঞা ও বোরহান তালুকদার দুই মহাজনের মধ্যে বিরোধের সূত্রে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যেও। কাদের নামে এক শ্রমিকের কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয় প্রতিবাদের সুর –

> এখন জমানা বদলাইছে। ঐসব জলিল মিয়াগো জাল গোটানোর সময় হইছে। না, না, এখন আর কেবল বোরহান তালুকদারের স্বার্থের কথা নয়, সব খাটিয়া খাওয়া মানুষের স্বার্থের কথাটাই বড় হইয়া উঠছে।[১]

নবান্ন উপন্যাসেও দেখা যায় মহাজন-দালাল-ফড়িয়াদের বিরুদ্ধে অসহায় মানুষগুলো প্রকাশ্যে মুখ খুলতে না পারলেও তাদের বিরুদ্ধে প্রচুর ক্ষোভ জমা হয়েছে সাধারণ মানুষের মনে। সুযোগ পেলেই বাঁধভাঙা সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তারা। অনাদিকাল ধরে সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারের শিকার হতে হতে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে, অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে একসময় জেগে ওঠে নিপীড়িত জনগোষ্ঠী। তাদের মহাজাগরণের সেই মুহূর্তে কোনো অত্যাচারীই তাদের সামনে দাঁড়াতে পারে না – তা সে যতই প্রবল-পরাক্রান্ত হোক না কেন।

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *জায়জঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

গ্রামীণ নারীর সামাজিক অবস্থান ও নির্যাতনের চিত্র

আবহমানকাল থেকেই বাহুবল, উপার্জনের ক্ষমতা, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি দিয়ে নারীর ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আসছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ধ্বজাধারীরা। যুগে যুগে স্থান-কাল নির্বিশেষে পুরুষ কর্তৃক নারীদের শাসন করার এই চিত্র খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি। বাংলাদেশেও সামাজিক কাঠামোতে নারীর তুলনায় পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব রীতিমত অবিসংবাদিত। এদেশের লোকমানসে নারীর প্রতি বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেছেন জনৈক গবেষক –

> বাংলাদেশের গ্রামে প্রচলিত প্রবাদে নারীর চাইতে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত-প্রচারিত – যেমন, পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, সোনার আংটি বাঁকাচোরা হলেও ভাল। নতুন বধূকে সবাই এ আশীর্বাদ করে, যাতে সে শীঘ্র একটি পুত্রসন্তানের জননী হয়। আশীর্বাদসূচক প্রবাদে বলা হয় – 'তুমি সাত ছেলের মা হও'; কখনো বলা হয় না – তুমি একটি মেয়ের মা হও।' ... শৈশব থেকেই মেয়েরা জানে, সংসারে সবকিছুতে ছেলেদের গুরুত্ব অধিক। নারী-পুরুষের অসম-অবস্থানের পটভূমিতে বিবর্তিত হয়েছে বাংলার গ্রামসমাজ।[১]

নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিদ্যমান বৈষম্যের অনিবার্য বহিঃপ্রকাশ ঘটে নারী নির্যাতনের মাধ্যমে। গ্রামীণ সমাজে পরিবারের ভেতরে স্বামী, শ্বাশুড়ি কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যদের দ্বারা যেমন নির্যাতিত হতে দেখা যায় তেমনি সমাজের জোতদার-মহাজন বা প্রভাবশালীদের দ্বারাও নারী-নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। নারী যে সমাজের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অংশ, এটি শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর নিজের জীবন থেকেই অনুধাবন করেছেন। ছোটবেলায় লেখককে পড়াশোনার সুবিধার্থে বরিশাল শহরের নামকরা স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁর দুই ছোট বোন থাকতেন গ্রামে মায়ের কাছে। এ থেকে তাঁর প্রতি এক ধরনের ঈর্ষার জন্ম হয়েছিল দুই বোনের। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস *ঈষদাভাস*-এ লেখকের সহানুভূতিপূর্ণ উচ্চারণ–

> এখন মনে হয়, তাদের সবচেয়ে বড় দুঃখ ছিল মেয়ে হয়ে জন্মেছিল বলে। এই নিদারুণ সত্যটা আমার শৈশব–কৈশোরে একেবারেই ধরা পড়েনি, মায়ের জীবন, জাহানারার (লেখকের বড় বোন) বিদ্রোহ, পিতামহ প্রণয়িনীর অসহায়তা, পিতৃব্যের স্ত্রীর দুরন্ত রোগভোগের কষ্ট এবং নীরব ক্রন্দন, মামাতো বোন হাজেরা ও

[১] টি. স্কারলেট এপ্সটেইন ও রোজমেরি এ ওয়াটস (সম্পা.), দ্য এণ্ডলেস ডে: সাম কেস ম্যাটেরিয়ালস অন এশিয়ান রুরাল উইমেন, পারগামন প্রেস, ইউএসএ, গ্রেট বৃটেন কানাডা অস্ট্রেলিয়া ফ্রান্স ও জার্মানি: ১৯৮১, পৃ. ১৫-১৭, বাংলাদেশ অংশের রচয়িতা ঝর্ণা নাথ (মহীবুল আজিজ প্রণীত বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ: ১৯৪৭-১৯৭১, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০২, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ২০৩ থেকে গৃহীত)।

> আমেনার একেবারেই যেন এক-এক সংসার ধর্ম-কর্মে পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়া, জরিনারও (লেখকের ছোটবেলার প্রতিবেশিনী) আর কোনই উপস্থিতি-অবস্থিতি চোখে না পড়া – সবই যেন এক সূত্রে গাঁথা বলে মনে হয়। ঐ সমাজে এক-একটি মেয়েছেলেকে যেন উপড়ে নিয়ে ইচ্ছেমতো ব্যবহারই একমাত্র পৌরুষকর্ম।[১]

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাসে উপস্থাপিত নারী চরিত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে নারীর সামাজিক অবস্থান ও তাদের ওপর নানামুখী নির্যাতনের চিত্র উঠে আসে। পুরুষশাসিত এই সমাজে নারীর যেন কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই; পুরুষের ইচ্ছের ওপরই তাদের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ নির্ভর করে। *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কানু শিকদারের দাদা করমালীর কল্পনায় দেখা অসহায় নারীর প্রতিকৃতিই যেন ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে –

> আসলে আমার মাঝে মধ্যে কী মনে কয় জানো ঐ কাশবনের আড়ালে, ঔ দূরে দূরে গঞ্জ যেইখানে আঁকাইয়া-বাঁকাইয়া দূর দিক সীমানার মধ্যে মিলাইয়া গেছে, তার সব কিছুর মধ্যে দেখি একজন অসহায় কন্যার মুখ ক্যান জানিনা, সেই মুখখানি যেন উপবাসে কাতর, নিজ-যৌবনের ঐশ্বর্য লইয়া তার বিড়ম্বনারও শেষ নাই।[২]

করমালীর কল্পচোখে দেখা নারীর মতো এ উপন্যাসের নারীরাও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নানা অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার। এ উপন্যাসে সখিনাকে হোসেনের প্রতি অনুরক্ত মনে হলেও সমাজ-বাস্তবতার কথা ভেবে সে কখনো মনের চাহিদাকে গুরুত্ব দেয়নি। সংসার জীবনের শুরুতেই স্বামীর নির্যাতনের শিকার হয়ে তাকে প্রত্যাবর্তন করতে হয় পিতার সংসারে। অন্যদিকে আরেক মুখ্য নারীচরিত্র জোবেদার সংসার জীবনও সুখের ছিল না। শাশুড়ির গঞ্জনা এবং অন্য নারীতে আসক্ত স্বামীর নির্যাতন ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতো তার সংসার জীবন। স্বামীর সংসারে জোবেদার অস্তিত্বের যে চিত্র আমরা দেখতে পাই তা নিম্নরূপ –

> বিবাহের কিছুদিনের মধ্যেই সে জোবেদাকে বুঝাইয়া দিয়াছে কতকগুলি স্থূল কর্তব্য ছাড়া তাহার আর কোনো বিশেষ ভূমিকা নাই। তাহার প্রধান কর্তব্য শাশুড়ির সেবাযত্ন, সে ব্যবসা উপলক্ষেই বাহিরে থাকে না অন্য কোনো ঠাঁই সংসার আছে কি নাই সেসব কৌতূহলও তাহার অধিকারের বাইরে। শাশুড়িভাগ্য এমন যে শত চেষ্টা করিয়াও

[১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, *ঈষদাভাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
[২] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, *কাশবনের কন্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১-২১২

তাহার মন জোগান যায় না; সর্বক্ষণ গজগজ করিবার মত একটা না একটা বিষয় সে খুঁজিয়া বাহির করিবেই। সন্তানবতী না হওয়ায় তাহার নানারকম কটুক্তি-উপহাস আরো বাড়িয়া গিয়াছে।[১]

যে স্বপ্ন ও কল্পনা নিয়ে তরুণী জোবেদা স্বামীর সংসারে এসেছিল, বাস্তবে তার ভিন্ন অভিজ্ঞতা সে লাভ করল। এ বিরূপ অভিজ্ঞতার কারণে নারীজীবনকে তার অভিশপ্ত মনে হয়েছে –

সে (জোবেদার স্বামী) যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, আরো সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতে হয় জোবেদাকে। একদিকে তাহাকে খুশি রাখা, তাহার জন্তুর মত সকল খেয়াল-খুশি এবং সাধ-আহ্লাদ মিটাইয়া চলা, অন্যদিকে সেই সক্কালে শাশুড়ির মেজাজ আরো তীব্র হইয়া উঠিত। তাহার নানারকম বিদ্রুপ ও মন্তব্যের অশ্লীলতায় সে যেন পুকুরে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াও শান্তি পাইত না। মাঝেমধ্যে মনে হইত, মেয়ে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণের মত অভিশাপ বুঝি আর নাই।[২]

কিন্তু জোবেদা এ জীবন থেকে পরিত্রাণ চাইলেও সে নিরুপায়। কারণ মুক্তির জন্য যাদের ওপর নির্ভর করবে তারাও দায় এড়ানোর সুরে বলে, 'পরের বাড়িকে আপন করিয়া লওয়ার মধ্যেই তো কৃতিত্ব, নারীজন্মের সাফল্য। বেশী খামখেয়ালী কি তেজ দেখাইয়া কোনও কন্যাই কখনও কোনও সংসার সুখের করিতে পারে নাই।' (পৃ. ১৭৯)। সখিনার বিয়ে প্রসঙ্গে তার মায়ের আক্ষেপ থেকেও সংসারে তার গুরুত্বহীনতার কথা প্রতিফলিত হয় – 'আমরা মাইয়া মানুষ, অন্তঃপুরের বাসিন্দা। ইচ্ছামতন সবকিছু কি আর সাধ্যে কুলায়।' (পৃ. ৬২)। এই কঠিন প্রতিকূল সমাজব্যবস্থা সত্ত্বেও জোবেদার মনে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন উঁকি দিত। আর সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের আশায় সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে সে আবার ফিরে আসে কানু শিকদারের ঘরে। কিন্তু শিকদারের লোকলজ্জা, সমাজ-আচার এবং দোলাচলবৃত্তি জোবেদাকে ব্যথিত করে। এবং একপর্যায়ে জোবেদা আবার স্বামী-সংসারে ফিরে যায়। চিরায়ত বাঙালি নারীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিজের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-স্বপ্ন, ভালো লাগা-মন্দ লাগা সব বিসর্জন দিয়ে স্বামী-শাশুড়ির চাওয়া-পাওয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

চিরায়ত গ্রামীণ নারীর আরেক মূর্ত প্রতীক ছবদার মাঝির কন্যা মেহেরজান। মাঝি অনেক আশা স্বপ্ন নিয়ে বিয়ে দিয়েছিল মেয়েকে; 'কিন্তু পণের কড়ি জোগাইতে পারে নাই বলিয়া সেই মেয়ের সংসারও সুখের হয়

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

নাই। নানারকম অত্যাচারের কবলে পড়িয়া সে একদিন অগত্যা বাপের বাড়ি চলিয়া আসিয়াছে।' তাই অকালেই তার সংসার-জীবনের সমস্ত রং মুছে যায়। দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, ন্যায্যবিচারও আশা করা যায় না। শুধু তাই নয় সমাজ-সৃষ্ট কিছু বিধি-বিধানের কারণে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে লোভী অত্যাচারী স্বামী থেকে মুক্তির উপায়ও তাদের নেই।

সমুদ্রবাসর উপন্যাসে লাঠিয়াল সর্দার ইউসুফ সুজা এক রাতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তার প্রথম স্ত্রীর 'মাথা চৌকির কোনায়' আছড়িয়ে তাকে খুন করে। যদিও ইউসুফ সুজার বাবা সকলকে বলে যে, চৌকির কোনায় পড়ে গিয়ে হঠাৎ তার মৃত্যু হয়েছে। কৃষক নেতা মনু মল্লিক নিহত হলে তার সুন্দরী স্ত্রী জরিনার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পড়ে মুজফ্ফর মিঞার। ভালো মানুষের মুখোশের আড়ালে মুজফ্ফর মিঞার প্রকৃত চেহারাটি জরিনার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলে সে মুজফ্ফর মিঞাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। সময়ের পরিবর্তন ঘটলেও সমাজে মেয়েদের অবস্থানগত কোনো পরিবর্তন ঘটে না। লম্পট পুরুষরা মেয়েদেরকে কেবল ভোগের সামগ্রীই মনে করে। *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসে চান্দুর স্ত্রীর উক্তিতে গ্রামীণ নারীদের সামাজিক অবস্থানের চিত্র ফুটে উঠেছে এভাবে –'এক্কেবারে খোপে ভরিয়া রাখতে হয় শিয়ালের ডরে। শুনি এইখানে নাকি জোর করিয়া মাইয়া মানুষ ধরিয়া লইয়া যাওয়াটাই বহুকালের রেওয়াজ হইয়া রয়েছে।' (পৃ. ২৩৪)। এরকম জীবনব্যবস্থায় নারীজীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সোনা বৌ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে – 'আসলে এই মাইয়া মানুষ হইয়া জন্মানটাই একটা ঘোর অভিশাপ।' এই অভিশপ্ত জীবনের জন্য দায়ি পুরুষদের ইঙ্গিত করে করিমনের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় এক ঐতিহাসিক সত্য: 'এখন বুঝতে পারি কেন আগের কালে কোনও ঘরে সুন্দর মাইয়া জন্মাইলে ছোটকালেই তারে কুরূপ করিয়া ফেলাইত। এই যে মাইয়া ছেইলাগো মুরগীর লাহান খোপে খোপে ভরিয়া রাখার রীতি তার মূলেও এইসব শয়তান শিয়ালের দৌরাত্ম্য।' (পৃ. ২৩৬)

গ্রামীণ সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থা ও নারী নির্যাতনের এ চিত্রগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, অভাব-দারিদ্র্য, সামাজিক বিধি-বিধান প্রভৃতি কারণে গ্রামীণ নারীরা এই নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়। তাছাড়া বৈষম্যময় সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় বেড়ে ওঠা নারীরাও নিজেদের

স্বতন্ত্র অস্তিত্বই হারিয়ে ফেলে। গ্রামের কিছু অসৎ চরিত্রের লোক রয়েছে যারা তাদের মনস্কামনা চরিতার্থ করার জন্য নানা কূটকৌশলে প্রবৃত্ত হয়। *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসের কালু গাজী এ ধরনেরই এক মানুষ। সম্পর্কে চাচা হওয়া সত্ত্বেও সে ছবদার মাঝির স্বামী পরিত্যক্তা কন্যা মেহেরজানের প্রতি আকৃষ্ট হয় –

> কালু গাজী তারপর তেরছা দৃষ্টিতে মেহেরজানের দিকে তাকাইয়া চাহিল: হ, দেখছি তো আমিও তোমার সেই ল্যাংটা কাল হইতে, তবে এখন যে এমন ঐশ্বর্যে ভরিয়া উঠবা তা কখনো ভাবি নাই। দেখলা তো, একজন দুইজন জগৎজন। আমার সঙ্গেও একটা সমঝোতা করিয়া লইলে এমন কী আর ক্ষতিটা হইবে, এই তবধ কর, তবধ করিয়া দেখিও।[১]

সামাজিক বিধিনিষেধের ভয় আর যাবতীয় অসহায়ত্ব কাটিয়েও গ্রামীণ নারীদের কখনো কখনো দেখা যায় প্রতিবাদী হয়ে উঠতে। *জায়জঙ্গল* উপন্যাসে এরকমই এক সাহসী নারী চরিত্র জয়নাল শেখের স্ত্রী হালিমন। সন্তান ধারণে ব্যর্থ হয়ে হিঙ্গুল ফকিরের শরণাপন্ন হয় হালিমন। হিঙ্গুল ফকির চিকিৎসার নামে তার হীন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার চেষ্টা করলে প্রতিরোধ গড়ে তোলে হালিমন। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি –

> হালিমন নীচু গলায় তর্জন করিয়া বলিল: শুয়ারের বাচ্চাটা আমার গতরে হাত দিতে শুরু করছিলো। ... হালিমনের দৃষ্টিতে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তাহা জয়নাল শেখ কোনও দিন দেখে নাই। ...
>
> : আমি ভুল করি নাই – অন্যায় করি নাই। আমি সক্কলের মত বেহুঁশ হইয়া ছিলাম না। তার বদমতলব ঠিক পাইতেই উপায়ান্তর না দেখিয়া মাথার খোঁপার কাঁটা দিয়া তার এমন শিক্ষা দিছি যে তার বদমাইশী চিরকালের মতো শেষ হইয়া যাবার কথা।[২]

সমুদ্রবাসর উপন্যাসের বেদেকন্যাদের জীবিকার কারণে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হয়। সে সময় তাদেরকে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু বেদেকন্যারাও সাহসিকতার সঙ্গে সেসব অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের মোকাবিলা করতে পারে। চরিত্রহীন ইউসুফ সুজার হীন আচরণের বিরুদ্ধে এক বেদেনী কন্যার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর: 'পথ ছাড়িয়া দেও ভালো মানুষের পো। না হইলে ডাক-চিক্কইর দিলে সকলে লেজা-সড়কী লইয়া ছুটিয়া আসবে, কইয়া রাখলাম।' (পৃ. ৪৮)। তাছাড়া এ উপন্যাসে দেখা যায়,

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *সমুদ্রবাসর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০
[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *জায়জঙ্গল*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৫-১৬

সামন্ত শ্রেণির প্রতিভূ মুজফ্‌ফর মিঞা দরিদ্র মনু মল্লিকের স্ত্রী জরিনার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পড়লে ছলে-বলে-কৌশলে তাকে ফুসলানোর চেষ্টা করলে জরিনাও তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। তার প্রতিবাদের স্বরূপ:

> ঘরের খুঁটির একধারের লেজাটা হাতে লইয়া একটানে কপাটটা খুলিয়া ফেলিল জরিনা, মাথার আঁচলও যে সেই সঙ্গে বিস্রস্ত চুলের উপর দিয়া খসিয়া পড়িল সেইদিকে তাহার কিছুমাত্র খেয়াল রহিল না; দুই চোখে জ্বলন্ত আগুনের শিখা জ্বালাইয়া সে পা বাড়াইল বারান্দার দিকে। ... জরিনার মুখের দাঁত যেন কড়মড় করিয়া উঠিল। তোমারে ভালো করিয়াই চিনছি হাড়ে-হারামজাদার পুত। আমার স্বামীরে যদি কেউ গুম করিয়া থাকে, সে তুমি ছাড়া কেউ না। কুত্তার বাচ্চা এখন মিঠা কথা শুনাইতে আসছো। এখনো ফুসলানোর মতলব ছাড়ো নাই।[১]

গ্রামের অসহায় নারীদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে অনেকসময় অনেক দুশ্চরিত্র লোক তাদের লালসা চরিতার্থ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সবসময় তারা সফল হতে পারে না এমনই এক দুর্বৃত্তের কবলে পড়ে *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসের বেদেকন্যা চাঁপা। হাটে গানের আসর ও সাপের খেলা দেখিয়ে ফেরার পথে তাকে ফুঁসলানোর চেষ্টা করে এক বৃদ্ধ লম্পট। বুদ্ধিমতী চাঁপা প্রথমে নানা কথায় লোকটার মনে আশা জাগায়। কিন্তু পরে যখন বলে, তাকে ঘরে নিতে হলে বিয়ে করতে হবে, তখনই পিছিয়ে যায় লোকটা। চাঁপা তখন গালমন্দ করে এবং সাপের ভয় দেখিয়ে লোকটাকে বিদায় করে দেয়।

বিবাদ-বিসংবাদ ও সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি

গ্রামের মানুষের নিস্তরঙ্গ সহজ-সরল জীবনপ্রবাহে মাঝেমাঝেই নানা টানাপড়েন দেখা দেয়। পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, জমি-জিরাত নিয়ে আত্মীয়-প্রতিবেশীর সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা, মাতব্বর শ্রেণির মানুষদের নির্বিবেক শোষণ, এসব নিয়ে সৃষ্টি হয় নানা উত্তেজনাময় ঘটনার। শোষণ-বঞ্চনাময় প্রতিকূল সমাজ-পরিস্থিতির চিত্র দেখা যায় *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসের শিকদারের জীবনে। প্রচণ্ড মহামারির কবলে শিকদার বাবা-মা, আত্মীয়-পরিজন হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। 'আত্মীয়কুল যাহারা সেই মহামারীতে টিঁকিয়া গিয়াছিল, তাহারাও যতটা শিকদারের বিষয়-আশয় গ্রহণ করিল সেই অনুপাতে তাহার দিকে বিশেষ একটা মনোযোগ দেখাইল না।' (পৃ. ৫৯)। ফলে অসহায় শিকদারের জীবন হয়ে ওঠে দুঃখ-দুর্দশায় বিপর্যস্ত। অন্যদিকে বিষয়-সম্পত্তিগত দ্বন্দ্বের জের ধরে তার বন্ধু হোসেনের পিতা মুজফ্‌ফর কর্তৃক সখিনার পিতা

[১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, *সমুদ্রবাসর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

গঞ্জে আলীকে জোরপূর্বক তার ভিটা থেকে বিতাড়নও গ্রামীণ মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের একটি দৃষ্টান্ত। অনেক ক্ষেত্রে এধরনের বিবাদ-বিসংবাদে মীমাংসা করার পরিবর্তে একশ্রেণির মানুষ আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়ার কাজ করে। মুজফ্ফর ও গঞ্জে আলীর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটে।

জঙ্গলভূমিতে ঘর বাঁধা মানুষদের মধ্যেও স্বার্থের তাগিদে বিবাদ-বিসংবাদের ঘটনা ঘটতে দেখা যায় *জায়জঙ্গল* উপন্যাসে। হিংস্র প্রাণিকুলের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে করতে এখানকার মানুষদের মধ্যেও যেন গড়ে উঠেছে বৈরীভাব – 'বিবাদ এমনও চরম রূপ ধরিতে পারে যে জঙ্গলের পশু-পক্ষীরাও ভীত হইয়া তাহাদের সংস্রব হইতে দূরে পলাইয়া যায়। এইখানকার জল মৃত্যুর মত, ঐসব বিবাদ-কলহের পরিণামজনিত খুন-জখমেরও কোনো হিসাব-উদ্দেশ নাই।' (পৃ. ২০)। শুধু যে শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তা নয়, জোতদার-মহাজনদের মধ্যেও দেখা যায় দ্বন্দ্ব-বিরোধ। দুই মহাজন জলিল মিয়া ও বোরহান তালুকদারও পারস্পরিক সংঘাতে মেতে ওঠে। জলিল মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা করে বোরহান তালুকদার। দুই মহাজনের দ্বন্দ্বের সূত্রে শ্রমিকদের মধ্যেও দেখা দেয় প্রতিবাদের ঝড়। সমুদ্র-উপকূলবর্তী অন্তেবাসী মানুষদের মধ্যে বিবাদের আরেকটি কারণ চর দখল। অধিকাংশক্ষেত্রেই এ চর দখলকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের কিংবা কখনো কখনো ততোধিক পক্ষের মধ্যে মারামারি, খুনোখুনি হতে দেখা যায়। এ ধরনের সংঘর্ষে অংশগ্রহণের জন্য এ অঞ্চলে লাঠিয়ালবাহিনীর বেশ কদর ছিল। সাধারণত এসব লাঠিয়ালবাহিনী শোষকশ্রেণির পোষ্য হয়ে থাকে।

দরিদ্র গ্রামবাসী শত অভাব-অনটনের মধ্যেও পারস্পরিক বন্ধনকে দৃঢ় রাখতে চায়। *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসে দেখা যায়, দুই প্রধান চরিত্র হোসেন ও শিকদার পরস্পর বিপরীত স্বভাবের হলেও 'দুইজনের মনোভাব উভয়ের কাজেরই পরিপূরক', তাই তাদের মধ্যে রয়েছে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। এ কারণেই যেকোনো পরিস্থিতিতে একে অন্যকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিতে দেখা যায়। বাস্তববাদী হোসেন নিঃসঙ্গ জীবন থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় বিয়ে করে সংসারী হতে চায় এবং বন্ধু শিকদারকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে। বন্ধুর ঘর বাঁধার স্বপ্নকে সত্যি করার প্রয়াসে তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে সখিনাদের বাড়িতে যায় শিকদার। সখিনার পিতার কাছে তার অন্যত্র বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা শুনলেও বন্ধুর প্রতি সহানুভূতিবশত 'বিষয়টি

আবারও পরখ করিয়া' দেখতে প্রয়াসী হয় শিকদার, যদিও সে বিলক্ষণ জানত সামাজিক বিধিব্যবস্থা পুরোপুরিই প্রভাবশালীদের পক্ষে। বঞ্চনা ও শোষণের বাতাবরণ ভেদ করার কোনো ক্ষমতাই বস্তুত দুর্বল ও দরিদ্রদের নেই। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কেরায়া নৌকার মাঝি হয়ে অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমায় হোসেন, যাওয়ার আগে তার বাড়িঘরের দেখভাল করার দায়িত্ব ন্যস্ত করে যায় বন্ধু শিকদারের ওপর। নৌকা বাইতে গিয়ে ছবদার মাঝির সাথে পরিচয় ঘটে হোসেনের, সৃষ্টি হয় হৃদ্যতার। কেরায়া নৌকার মাঝি হিসেবে ছবদার মাঝির অভিজ্ঞতা ও তার আন্তরিক পরামর্শ হোসেনের পাথেয় হিসেবে কাজ করে। এক পর্যায়ে ছবদার মাঝি অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা-শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করে হোসেন এবং মৃতপ্রায় ছবদার মাঝিকে তাঁর গ্রামে পৌঁছে দেয়। কিন্তু হোসেনের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুবরণ করে ছবদার মাঝি। কৃতজ্ঞতার দায় নিয়ে ছবদার মাঝির স্ত্রী, নাবালক পুত্র ও স্বামী পরিত্যক্ত কন্যার পাশে দাঁড়ায় হোসেন। পরমাত্মীয়ের মতোই সহায়হীন পরিবারটিকে সাহায্য করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে হোসেন। এমনকি মেহেরজানের স্বামীর সঙ্গে বিবাদ মেটানোর বিষয়েও উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায়।

জায়জঙ্গল উপন্যাসে সুন্দরবনের জনবিরল, শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যাঞ্চলের অধিবাসী জয়নাল শেখের পারিবারিক বন্ধন, হার্দিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেমানুভূতি, স্নেহ-মমতার চিত্রে ভেসে ওঠে চিরন্তন গ্রামবাংলার হাজারও নরনারীর প্রতিচ্ছবি। জয়নাল শেখের বোনের প্রতি স্নেহ, ভালবাসা, হালিমন-সাজুর পারস্পরিক আন্তরিকতা, খুনশুটি এবং ভাবী অন্তঃসত্ত্বা হলে ননদের যত্ন-আত্তি, সাজুর বিয়ে নিয়ে ভাই-ভাবীর চিন্তা-উদ্বেগ ইত্যাদি নানা অনুষঙ্গ গ্রামীণ পারিবারিক জীবনের একটি চিত্র। এখানকার মানুষজনের মধ্যেও রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতা-সহমর্মিতার মনোভাব। অজ্ঞাতকুলশীল আহত মিন্নত আলীকে লালু খাঁ, জয়নাল শেখ, মিকু, তালেব সকলে মিলে উদ্ধার করে আনে এবং প্রাণান্তকর চেষ্টা করে তার চেতনা ফিরিয়ে আনে। লালু খাঁয়ের দেয়া লতা গুল্ম দিয়ে তৈরি করা একপ্রকার ঔষধ এবং হালিমন-সাজুর সেবা-শুশ্রূষার বদৌলতে মিন্নত আলী সুস্থ হয়ে ওঠে। গোলপাতা সংগ্রহ করতে গিয়ে লালু খাঁকে সাপে কাটলে জয়নাল, মিকু, তালেব তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। লালু খাঁয়ের ক্ষতস্থান থেকে মিকু যেভাবে বিষাক্ত রক্ত শুষে নেয় তাতে গভীর হৃদ্যতার পরিচয় প্রকাশ পায়। মিকু, তালেব, জয়নাল শেখ চিকিৎসার জন্য লালু খাঁকে গঞ্জের বড় ডাক্তারের কাছেও নিয়ে যায়। জয়নাল শেখের বোন সাজু মোকাম্মেল পেয়াদা কর্তৃক

অপহৃত হলে সকলের সমবেত চেষ্টার মাধ্যমে তাকে উদ্ধার করা হয়। বৈরী পরিবেশে হিংস্র পশুপাখির বৈরিতা তাদের মধ্যে আতঙ্কিত দশা তৈরি করলেও মানবিক গুণাবলি বা অনুভূতিগুলো একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। উপর্যুক্ত ঘটনাবলি তা-ই প্রমাণ করে।

সমুদ্রবাসর উপন্যাসে দেখা যায়, প্রকৃতির বিরূপতা আর দারিদ্র্যকে তারা জয় করতে চায় যূথবদ্ধ প্রতিজ্ঞায়। জেলেরা একই সঙ্গে নৌকার বহর নিয়ে নদীতে মাছ শিকার করতে যায়। মগ সম্প্রদায়ের সদস্যদেরও দেখা যায় তাদের উৎপাদিত বেসাতি নিয়ে দলবদ্ধভাবে হাটে যেতে ও ফিরে আসতে। বিরূপ প্রকৃতি ও মনুষ্যসৃষ্ট নানা প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে সমুদ্রগর্ভে জেগে ওঠা চরকে আবাদ ও বাসযোগ্য করা কেবল নিজের শক্তিতে সুজাত আলীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সমমনা গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিলে সঙ্ঘশক্তির জোরে এই আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করেছে সে। গ্রামবাসী চান্দুর স্মৃতিচারণে গ্রামের মানুষের এই সঙ্ঘশক্তির জয়গান শোনা যায় –

> ছোটকালে দেখছি একজনে ঘর উঠাইতে দশজনের যোগান দেওয়ায় কেমন তরতরাইয়া সব হইয়া যাইত। ঝড়ে উড়িয়া গেছে চাল, সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক হইতে দশ বিশজনের সাহায্যের হাত আউগাইয়া আসতে বিলম্ব হয় নাই।[১]

দুরারোগ্য ব্যাধিতে সিকুর একটি পা অচল হয়ে গেলে সেই পায়ের চিকিৎসার জন্য তাকে মগপল্লিতে ওঝার কাছে নিয়ে যায় সুজাত আলী। পরবর্তীকালে তাকে সদরে নিয়ে ডাক্তার দেখানোর পরিকল্পনাও করে সুজাত আলী। আবার সুজাত আলীর স্ত্রী সোনা সন্তানসম্ভবা হলে করিমন কর্তৃক সোনার দেখাশোনা, যত্ন করে তার চুলে তেল লাগিয়ে চুল বেঁধে দেওয়া এবং মনু মল্লিকের বিধবা স্ত্রী জরিনা আত্মহত্যা করতে গেলে চান্দুর স্ত্রী কর্তৃক তাকে বাঁচানো – এসব ঘটনা গ্রামবাসীর পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতিরই পরিচয় বহন করে। এর পাশাপাশি তাদের পারস্পরিক দায়িত্ববোধের পরিচয়ও পাওয়া যায় উপন্যাসের নানা অংশে। এ দায়িত্ববোধের কারণে মনু মল্লিকের বিধবা স্ত্রী জরিনার ব্যাপারে সুজাত আলী, চান্দু, করিমন প্রমুখের মধ্যে উদ্বেগ দেখা যায় এবং অবশেষে ক্ষীরসায়রে নুরু, তালেব আর বসুয়া বয়াতির সঙ্গে বিয়ে হয় যথাক্রমে আনু, ভানু ও জরিনার।

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

গ্রামীণ-জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, স্নেহ-মমতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসেও পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কাঞ্চন এক বৃদ্ধার বাড়িতে আশ্রিত ছিল। স্বামী-সন্তান-পুত্রবধূ-নাতনিকে হারিয়ে বৃদ্ধা একাকিনী হয়ে পড়েছে। কাঞ্চনেরও এ পৃথিবীতে আপনজন বলতে কেউ নেই। এ কারণে বৃদ্ধার স্নেহ মমতার বন্ধনে সে জড়িয়ে পড়ে। পাশের গ্রামের বৈষ্ণবীও কাঞ্চনকে অত্যধিক স্নেহ করত। নিজে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করলেও কাঞ্চনের জন্য বিভিন্ন খামার তৈরি করে আনত – মোরব্বা, আচার, চিড়া, মুড়ি, নাড়ু ইত্যাদি তৈরি করে কাঞ্চনের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিত। কাঞ্চন যখন মালার প্রতি অনুরক্ত হয়ে এক পর্যায়ে বাড়ি ছেড়ে বেদে-দলে যোগ দেয় তখন বৃদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবী, ভানু এরাও ব্যথিত হয়। এ সময় ব্যথিত বৃদ্ধার প্রতি বৈষ্ণবীর পাশাপাশি ভানু ও ভানুর পরিবারও সহমর্মিতা প্রকাশ করে। গ্রামের প্রতিটি মানুষ যেন একে অপরের ভাই-ভাই। সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে দাঁড়ায়। একই পরিবারের সদস্যের মত পারস্পরিক দায়িত্ববোধেরও পরিচয় দেয়। কাঞ্চনের বিয়ের ব্যাপারে তার সমবয়সী চাষি তাজু কাঞ্চনকে তাড়া দিয়ে বলে – 'কত আর ঘোরবা এমন করিয়া। এইবার সংসারি হও, ঘর-গিরস্থালীতে মন দাও।' (পৃ. ২৫)। *জায়জঙ্গল* উপন্যাসের বৈষ্ণবীও বিভিন্ন সময় বুড়িকে কাঞ্চনের বিয়ে নিয়ে তাগাদা দেয়। একে অপরের প্রতি দায়িত্ববোধের পাশাপাশি বিপদে আপদেও নিঃসঙ্কোচে গ্রামের মানুষরা এগিয়ে আসেন। বেদে দলের মদনের মিথ্যা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সর্দার কর্তৃক কাঞ্চন দল থেকে বিতাড়িত হয় এবং মদন তাকে বেদম প্রহার করে। আহত, রক্তাক্ত, ক্লান্ত কাঞ্চনকে এ অবস্থায় এক নদীর খেয়াঘাটে দেখতে পায় এক অন্ধভিখারী ও তার ১০/১২ বছরের মেয়ে টুনি। তারা কাঞ্চনের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। অন্ধ ভিখারী 'হাত দিয়া কাঞ্চনকে পরখ করিয়া দেখিয়া মেয়েকে কহিল: তুই যা মা টুনি, গাঁটরির মধ্যে ছেড়া জামা আছে, গাঙের পানি আন বাটি ভরিয়া, ধুইয়া মুছিয়া বান্ধিয়া দে।' (পৃ. ১৮৭)। তাছাড়া কাঞ্চনকে নিজের সামান্য পাউরুটির টুকরোটি দিয়ে দিতেও তার মধ্যে কার্পণ্য দেখা যায় না।

অভাব-অনটনে পর্যুদস্ত গ্রামের সাধারণ মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিতে কার্পণ্য করে না। *যার সাথে যার* উপন্যাসের নিমু হাওলাদার বিল থেকে ঝুড়িভর্তি মাছ নিয়ে এলে স্ত্রী জরিনা কিছু মাছ প্রতিবেশি হাশেম মৃধার গর্ভবতী স্ত্রীকে দিয়ে আসে। সাজু সৈজুদ্দি, যার সাথে হাশেম

মৃধার পরিচয় হয়েছিল 'গত সনে চরের জমিতে বর্গা দিতে' গিয়ে, সেই সৈজুদ্দির সাথে হাশেম মৃধার দেখা হলে সৈজুদ্দি রিলিফ থেকে পাওয়া কিছু আটা হাশেম মৃধাকে দিয়ে যায়। সৈজুদ্দি বলে- 'কপালগুণে আজ কিছু রিলিফের আটা পেয়েছি মৃধা। তোমার গামছাটা একটু বাড়িয়ে দাও, তোমাকেও দু-আঁজলা দিয়ে যাই।' (পৃ. ৭৭)

জায়জঙ্গল উপন্যাসে সুন্দরবনের জনবিরল, শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যাঞ্চলের অধিবাসী জয়নাল শেখের পারিবারিক বন্ধন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেমানুভূতি, স্নেহ-মমতার চিত্রে ভেসে ওঠে চিরন্তন গ্রামবাংলার হাজারও নরনারীর প্রতিচ্ছবি। জয়নাল শেখের বোনের প্রতি স্নেহ, ভালবাসা, হালিমন-সাজুর পারস্পরিক আন্তরিকতা, খুনশুটি এবং ভাবী অন্তঃসত্ত্বা হলে ননদের যত্ন-আত্তি, সাজুর বিয়ে নিয়ে ভাই-ভাবীর চিন্তা-উদ্বেগ ইত্যাদি নানা অনুষঙ্গ গ্রামীণ পারিবারিক জীবনের একটি স্বাভাবিক চিত্র। এখানকার মানুষজনের মধ্যেও রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতা-সহমর্মিতার মনোভাব। যদিও আপামর গ্রামবাংলার মত এ বনাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে নিজেদের অধিকার নিয়ে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র দেখা গেছে, তাদের মধ্যে বিপদে-আপদে একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসার দৃষ্টান্তও রয়েছে। অজ্ঞাতকুলশীল আহত মিন্নত আলীকে লালু খাঁ, জয়নাল শেখ, মিকু, তালেব সকলে মিলে উদ্ধার করে আনে এবং প্রাণান্তকর চেষ্টা করে তার চেতনা ফিরিয়ে আনে। লালু খাঁয়ের দেয়া লতা-গুল্ম দিয়ে তৈরি করা একপ্রকার ঔষধ এবং হালিমন-সাজুর সেবা-শুশ্রূষার বদৌলতে মিন্নত আলী সুস্থ হয়ে ওঠে। গোলপাতা সংগ্রহ করতে গিয়ে লালু খাঁকে সাপে কাটলে জয়নাল, মিকু, তালেব তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। লালু খাঁয়ের ক্ষতস্থান থেকে মিকু যেভাবে বিষাক্ত রক্ত শূষে নেয় তাতে গভীর হৃদ্যতার পরিচয় প্রকাশ পায়–

> ধারালো দা'য়ের মাথাটা আগুনে পোড়াইয়া টকটকে লাল করিয়া জয়নাল শেখ দংশনের স্থানটাকে লম্বালম্বিভাবে চিরিয়া দিল। সেইখান হইতে কালো কালো রক্তস্রোত শুষিয়া শুষিয়া শ্রান্ত হইয়া উঠির মিকু। লালু খাঁকে তবুও অসমর্থ হইয়া পড়িতে দেখিয়া তালেবও এই প্রক্রিয়ায় লাগিয়া গেল। মুখভরা রক্ত থু থু করিয়া ফেলয়া মিকু কৈফিয়তের মত বলিল: মাফ করো চাচা, জোঁকের চাইতেও বেশি রক্ত শুষিয়া লইতে আছে।[১]

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *জায়জঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

মিকু, তালেব, জয়নাল শেখ চিকিৎসার জন্য লালু খাঁকে গঞ্জের বড় ডাক্তারের কাছেও নিয়ে যায়। জয়নাল শেখের বোন সাজু মোকাম্মেল পেয়াদা কর্তৃক অপহৃত হলে সকলের সমবেত চেষ্টার মাধ্যমে তাকে উদ্ধার করা হয়। এ ধরনের নানা অনুষঙ্গের মাধ্যমে এই বনাঞ্চলের মানুষদের পারস্পরিক আন্তরিকতা ও সাহায্য সহযোগিতার চিত্র পাওয়া যায়। বৈরী পরিবেশে হিংস্র পশুপাখির বৈরিতা তাদের মধ্যে সঞ্চরণ করলেও মানবিক গুণাবলি বা অনুভূতিগুলো একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। উপর্যুক্ত ঘটনাবলি তা-ই প্রমাণ করে।

মাঝে মাঝে বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিলেও গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মন প্রকৃতির মতোই উদার। তাদের হৃদয়ের বন্ধনও অত্যন্ত দৃঢ়। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি রয়েছে বলেই পাড়া প্রতিবেশী একে অন্যের বাড়িতে এলে দেখা যায় অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আপ্যায়নের চেষ্টা করতে। *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসের হোসেন সখিনাদের বাড়িতে গেলে সখিনার মা পরম আত্মীয়ের মতো হোসেনকে বলে –'তুমি বসো বাজান, খাওয়া-দাওয়া করিয়া যাবা, সখিনার বাপেরও কামকায্য থেকিয়া আসার সময় হইলো। গরিবের ঘর, তবু দেখি কিছু ভালো-মন্দর কী জোগাড় করন যায়।' (পৃ. ৩৪)। সখিনার বাবা গঞ্জে আলীর চরিত্রেও অতিথিপরায়ণতার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। হোসেনকে সে বলে –

> পাগল না কী, এই ভর দুপুরে এতো কড়া রৌদ্র মাথায় লইয়া না খাইয়া যাবা এইটা কোনও কামের কথা! আসো, আসো – গঞ্জে আলী তাহার হাতে ঝুলান খালুই উঁচাইয়া দেখাইল: খোঁড়ল হাতাইয়া কত্তো বড় বড় কই মাছ পাইছি দেখো, খাইয়া-দাইয়া ধীরে সুস্থে যাইও।[১]

কেবল বাড়িতে নয়, পথে ঘাটে চায়ের দোকানে কিংবা মাঝিদের মধ্যেও অতিথিপরায়ণতা দেখা যায়। কেরায়া মাঝি হিসাবে নবাগত হোসেনকে ছবদার মাঝি কর্তৃক অপ্যায়নের চিত্রেও এ অঞ্চলের মানুষদের অতিথিবাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। –

> মুখে এক গ্রাস আহার তুলিয়া হোসেন বলিল: আহ, আপনার রান্নাটা বড় ভালো হইছে!
>
> মাঝিও খুশি হইল: সবই কপালগুণ! ভাগ্য! এইটা জোটে তো সেটা জোটে না। এতো তালাশ করলাম তবু কোনোখানেই কচুর লতি চোখে পড়লো না। পাশে সেইসব দিতে পারলে আরো মজা হইতো। ... হোসেন তাহার হাসিতে যোগ না দিয়া আবারও বলিল: নাহ, খুউব ভালো খাইলাম।[২]

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাশবনের কন্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

জলসিঁড়ি ঘাটে শিকদার হোসেনের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে গেলে সেখানে দেখা হয় নিজের এলাকার যুবক লতিফের সঙ্গে। লতিফ সমাদর করে শিকদারকে চায়ের দোকানে বসিয়ে 'এক বাটি চা, আর কয়েকটি বিস্কুট তাহার সামনে বাড়াইয়া' দিল এবং রাতটাও তার সঙ্গে কাটিয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। সে আমন্ত্রণ শিকদার উপেক্ষা করতে পারেনি, তাই রাতের বেলা অবার ফিরে আসে। এবং লতিফের আদর-আপ্যায়নে অত্যন্ত প্রীত বোধ করে সে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় – 'শিকদারের মনে হইল সেইরকম অন্ন-ব্যঞ্জন আর বহুকাল চোখেও দেখে নাই; আহারে বসিয়া তবু সে বলিল: এ কী কাণ্ড করছো তুমি, এতো সব আয়োজনের তো তেমন কোনও দরকার আছিলো না।' (পৃ. ১০০)

কাঞ্চনমালা উপন্যাসেও অতিথি আপ্যায়নের নানা দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। গ্রামের মানুষ যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী আপ্যায়নের চেষ্টা করে। অবস্থাপন্ন মানুষ যেমন, তেমনি হতদরিদ্ররাও অতিথি আপ্যায়নে পিছিয়ে থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, করিম খাঁর স্ত্রী কাঞ্চনকে আশ্রয়দাত্রী বৃদ্ধার বাড়িতে এলে বৃদ্ধা তাকে সামান্য পান দিয়ে হলেও আপ্যায়নের চেষ্টা করেছে। আবার কাঞ্চন বৈষ্ণবীর বাড়ি গেলে বৈষ্ণবী তাকে মুড়ি-নাড়ু খেতে দেয়। কাঞ্চনের আশ্রয়দাত্রীকেও বৈষ্ণবী পান-নাড়ু দিয়ে আপ্যায়ন করে। গ্রামের সাধারণ মানুষ অভাব-অনটনের মধ্যে দিনাতিপাত করলেও স্বভাবজাত আন্তরিকতা প্রদর্শনে পিছ পা হয় না। পাড়া প্রতিবেশী বাড়িতে এলে আর কিছু না পারুক, এক খিলি পান দিয়ে হলেও আপ্যায়নের চেষ্টা করে।

যার সাথে যার উপন্যাসে নিমু হাওলাদার প্রতিবেশী কদভানুর বাড়িতে গেলে কদভানু পান-সুপারি দিয়ে তাকে আপ্যায়ন করে। এর বেশি কিছু দিতে না পারায় আক্ষেপও করে। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি –

> কদভানু ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে ভেজা ত্যানায় জড়ানো এক টুকরো সাদা তামাকের পাতা ছিঁড়ে নেয়: তোমার সামনে ধরে দেবার মত মুড়ি-বাতাসাও ঘরে নেই বাপ। সব মাঙ্গা। চাল-চিনি ছোঁয়া যায় না, বাকি-বকেয়াও আর উসুল হয় না। এই ভাঙা কোমর নিয়ে আর আগের মত কাজকর্মেরও সাধ্য নেই, আর চলাফেরারও জোর পাই না।[১]

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *যার সাথে যার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

নিমু হাওলাদার মেয়ে আয়েশাকে দেখতে বেয়াই বাড়িতে গেলে তাকে আপ্যায়ন করা হয় 'এক খোরা আখের রসের শরবত, কিছু পান-সুপারি আর হুঁকা কল্কে' দিয়ে। শুধু তাই নয়, আত্মীয়ের বাড়িতে যেতেও সাধ্যমত কিছু সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার রীতিও দেখা যায়। নিমু হাওলাদার মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা বলতে জলিল মিঞার বাড়িতে যাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে যায় পাটালি গুড়, নকশা করা কাটা পিঠা, নারকেলের নাড়ু। এবং পরবর্তীকালে মেয়েকে দেখতে যাওয়ার সময়ও 'দস্তুরমত' যাওয়ার পরামর্শ দেয় স্ত্রী জরিনা – 'কিছু পিঠা বানিয়ে দেই, হাট থেকে আনো কিছু জিলাপি বাতাসা, পারো যদি কিছু মাছ-টাছও সঙ্গে নিয়ে গেলে ভাল হয়।' (পৃ. ৬৪)

নবান্ন উপন্যাসে দয়াল চৌকিদার ডাকপিয়ন সফদার আলীর জন্য ডাব কেটে আনতে বলে তার গৃহভৃত্যকে। তাছাড়া সফদার আলীকে ডাল-ভাত খেয়ে যাওয়ার প্রস্তাবও দেয়া হয়। অন্যদিকে দয়াল চৌকিদার জমিলাদের বাড়ি গেলে সে বাড়ির সদস্যদের আপ্যায়নের তোড়-জোড় থেকেও তাদের অতিথিপরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাড়িতে যেতে না যেতেই লেবু চিনির শরবত এনে দেয় জমিলার মেয়ে জ্যোৎস্না। গ্রামের একটি ঐতিহ্যবাহী প্রথা হচ্ছে বাড়িতে অতিথি এলে অতিথি আপ্যায়নে পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরা কিংবা গৃহপালিত হাঁস-মুরগি জবাই করা হয়। এ উপন্যাসে দয়াল চৌকিদারের জন্য 'পাশের বাড়িয়ালের কাসেমকে ডেকে ঝাঁকিজালটা নিয়ে পুকুরে কয়েকটা ক্ষেপ দিতে' বলতে দেখা যায় জমিলাকে।

গ্রামীণ উৎসব ও পালাপার্বণ

বাংলাদেশের গ্রামীণ উৎসব-অনুষ্ঠান বাঙালি ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী। বাংলার বিভিন্ন জনপদের মানুষ তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনে বিনোদন এবং বিভিন্ন সামাজিক কারণে এসব উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে। নানা গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব, জীবন-জীবিকা সংশ্লিষ্ট উৎসব এবং বিনোদনমূলক নানা অনুষ্ঠান আয়োজনের রীতি আছে গ্রামীণ জীবনে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃষি ও নদী। তাদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত হয় ক্ষেতে-খামারে ফসল উৎপাদন করে, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন করে এবং বাড়ির চারপাশে নানারকম ফল-ফলাদি, শাক-সব্জির চাষ করে, নদীতে মাছ ধরে, খেয়া

পারাপার করে। দুবেলা দুমুঠো খাবারের সংস্থানই যেন তাদের একমাত্র চাওয়া। জমিতে ফসলের চাষ করে তারা অপেক্ষা করে কখন ফসল ঘরে আসবে। কারণ এই ফসলপ্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে তাদের ভালো থাকা মন্দ থাকা। তাই ফসল রোপণ থেকে ফসল ঘরে তোলা পর্যন্ত পরিচর্যা করে অত্যন্ত দরদ ও আন্তরিকতার সঙ্গে। তাদের প্রাণ উজাড় করে দেয়া পরিশ্রমের বিনিময়ে আসে ফসল। আকাঙ্ক্ষিত ফসল পাওয়ার ক্ষেত্রে যেন কোনো বিঘ্ন না ঘটে সেইজন্য ফসল রোপণ ও কাটার সময়ও নানা আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন দেখা যায়। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাসে আবহমান বাংলার লোকাচার ও লোক-উৎসবের জীবনঘনিষ্ঠ চিত্র দেখা যায়। *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসে ধান রোপণ ও ধান কাটাকে কেন্দ্র করে ক্ষীরসায়রের অধিবাসীরা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। তাই বসুয়া বয়াতির গীত-গানের মাধ্যমে শুরু হয় জমিতে প্রথম লাঙল দেয়ার অনুষ্ঠান–

> ইতোমধ্যে লাঙল দিবার ক্ষেতের কাছে প্রায় সকলেই আসিয়া জড় হইয়াছে। বসুয়া বয়াতির দোতারায় বাজিয়া উঠিয়াছে গমগমাগম ধ্বনি। সুজাত আলীকে লাঙল ধরার জন্য অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহার উৎসাহ আরো বাড়িয়া গেল। ছোট এটু অনুষ্ঠান কিন্তু তাহার জন্য হৈ চৈ কম হইল না। চান্দুর ব্যবস্থায় মাচান হইতে জলযোগের সরঞ্জামও আসিয়া পৌঁছিতেছে। ইসহাক আর শামু গেল জোয়ালের কাছে, নুরুও দাঁড়াইল পিছনে, আর লাঙলের মুটাটা খাড়া করিয়া সুজাত আলীকে আহবান করিল চান্দু।[১]

প্রথম ধান কাটার সময়টাকেও গীত-গানের মাধ্যমে উৎসবমুখর করে তোলে গ্রামবাসী। 'চরের প্রথম ধান কাটা হইবে, উৎসাহে, আনন্দে, প্রত্যাশায় সকলে অল্প বিস্তর অধীর অস্থির (*কাশবনের কন্যা*)।' ধান কাটার ছোটখাট নানা কাজে ছেলে-বুড়ো সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু এই ব্যস্ততার মধ্যে বিরক্তি নেই, আছে নিখাদ আনন্দ। ফসল ঘরে আসার এ সময়কে 'খন্দের কাল' বলা হয়। খন্দের সময় গ্রামের পরিবেশে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। গ্রামের মাঠ-ঘাট-হাট সর্বত্রই জীবনের সাড়া পড়ে যায়, গ্রামের বাড়িগুলোতে একটি উৎসবের আমেজ তৈরি হয়। *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসে শিকদারের শৈশবও কেটেছিল উৎসবমুখর গৃহস্থ পরিবেশে। উপন্যাসে সে পরিবেশের বর্ণনা পাই এভাবে –

> একসময় বেশ জম-জমাট ছিল তাহাদের ঘর-গৃহস্থালি। খন্দের সময় রবরবা হইয়া উঠিত সব। উঠানের একধারে অহোরাত্রি ধান মাড়াই-মলাই হইত একপাল গরু জুড়িয়া, কামলা লাগানো হইত পায়ে দলিয়া ধান মাড়াইবার

[১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, *সমুদ্রবাসর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

জন্য। অন্য একধারে বড় বড় টেকধানে সিদ্ধ হইত ধান। আর তাহারই ফাঁকে অবসরে পুঁথি-পড়া ছাড়া কি ধাঁধাঁর আসর বসিত নিত্য নিত্য।[১]

নবান্ন উপন্যাসে দয়াল চৌকিদারের স্মৃতিচারণায়ও ফুটে উঠেছে গ্রামবাংলার মানুষদের নতুন ধান ঘরে তোলার আনন্দ উৎসব উদ্‌যাপনের নানা আয়োজনের চিত্র। লেখকের বর্ণনায়–

তখন একের জমিতে হাল দেবার সময় রীতিমত একটা উৎসব হতো, উৎসব হতো ধান বোনা আর ধান কাটার সময়ও। এখনো মনে আছে বাড়ির কামলাদের সঙ্গে আমিও গেছি ধানক্ষেতের পাশে। আমিও মাথায় বেঁধে নিয়েছি হাট থেকে কিনে আনা লাল গামছা, গলায় ছোট ঢোল। হাঁটু সমান কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে সারিন্দা- দোতারা কী গানের সঙ্গে তাল দেওয়া খুব সহজ ছিলো না। তালে তালে ধান বুনেছে এ বাড়ি সে বাড়ির লোক। উঠানের একধারে পেল্লায় টেকদান তৈরি করে ব্যবস্থা হয়েছে তাদের ভোজনের। নবান্নের সময় সেই উৎসবের যেন আর শেষ ছিলো না। ছোট হোক, বড় হোক, প্রত্যেকের বাড়ি লোকে জমজম। আশায় আনন্দে ছোটরা বড়রা, মেয়েরা তখন কেবল ঘর-দোর সাজিয়েছে। কেউ বসিয়েছে গান-গল্প অথবা পুঁথি পড়ার আসর, তাতে মনে হয় সব দুঃখ সত্ত্বেও মানুষের মনে হাসি-খুশিও ছিলো।[২]

সারা বছরের সাধনার ফল ঘরে তুলবার আনন্দে বিভোর *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসের নতুন জাগা চর 'ক্ষীরসায়রে'র অধিবাসীরা। যে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা শ্বাপদ-সংকুল এই জঙ্গলভূমিকে আবাদযোগ্য করেছিলো ফসলের মৌসুমে সে আনন্দ তাই বাঁধনহারা। তাদের সেই আনন্দঘন কর্মব্যস্ততার চিত্রে আবহমান বাংলার নবান্ন উৎসবের চিরায়ত পরিচয় ফুটে ওঠে–

এক ক্ষেতের ধান মলিয়া, চিটা উড়াইয়া, সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া না তুলিতে তুলিতেই অন্য ক্ষেতের ধান কাটারও কাজ চলিতেছিল অবিশ্রান্তভাবে। সারাদিন সেই ধান কাটা-বাছাই, সন্ধ্যায় তাহার পরিচর্যা। এমন কী অনেক রাত্রি অবধি কাজ করিতে করিতে যেন কূল পাওয়া যাইতেছিল না। বসুয়া বয়াতি সিকুর তৈরি দাড়ি-পাল্লায় সেই ধান সুর করিয়া মাপিয়া মাপিয়া সাজি ভরিতেছিল: একে এক, একে এক, একে এক আল্লা, দুইয়ে দুই দুই নেত্র, তিনে তিন তিনে তিন তিনে তিন তিনকাল–।[৩]

[১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, *কাশবনের কন্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
[২] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, *নবান্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
[৩] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, *সমুদ্রবাসর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

নবান্ন উৎসব ছাড়াও গ্রামীণ জীবনের আরেকটি বাস্তব অনুষঙ্গ হচ্ছে বাড়িতে বাড়িতে নানারকম উৎসবের আয়োজন। সাধারণত সচ্ছল পরিবার কিংবা গ্রামের মোড়ল মাতব্বরের বাড়ির দাওয়ায় পুঁথি-পাঠ, ছড়া, ধাঁধাঁর আয়োজন হতো, কিংবা কখনো কবিয়াল-বয়াতিদের আনিয়ে গীত-গানের আসর বসত। সারাদিনের কর্মচাঞ্চল্যের পর সন্ধ্যায় এসব আসরে জমায়েত হতো গ্রামের মানুষ। যার ফলে তাদের সারাদিনের পরিশ্রমের সমস্ত শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর হতো। তাছাড়া গ্রামের কারো বাড়িতে কোনো পারিবারিক উৎসবেও এসব আসরের আয়োজন চলত। তাই মনসব সর্দারকে দেখা যায় কবিয়াল শিকদারকে বড় মিঞার ছোট ছেলের মুখে-ভাত অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করতে। আবার কখনো কখনো বাড়ির ছাদ পেটানোর সময়ও শ্রমিকদের কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য কবিয়াল বয়াতিদের নিমন্ত্রণ করা হতো। মনসব সর্দারের উক্তিতে লেখক অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন এ অঞ্চলের নানা উৎসব আয়োজনের ঐতিহ্য। প্রাসঙ্গিক অংশ–

> আগামী পূর্ণিমায় বড়মিঞার বাড়িতে একটা পর্ব আছে, ছোট পোলার মুখে ভাত। সেই উপলক্ষ্যে বেশ উৎসব আয়োজন হইতে আছে, দেশে-বিদেশের অনেক অতিথি-মেহমান আসবে, জারী-সারির আসরের ব্যবস্থাও হইবে। আরও দশজনের সামনে প্রমাণ হইয়া যাউক, গীত-গানেও আমাগো এই মুল্লুক ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওনের মতো না। তোমারে রাজি হইতেই হইবে, কথা দাও।[১]

গ্রামীণ সংস্কৃতিতে বিবাহ-অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উৎসব। ধনী-দরিদ্র সকলে যার যার সাধ্যমত এ অনুষ্ঠানকে ঘটা করে উদ্‌যাপনের চেষ্টা করে। *যার সাথে যার* উপন্যাসের দরিদ্র কৃষক নিমু হাওলাদারের কন্যা আয়েশার বিয়ে অনুষ্ঠানের বর্ণনায় গ্রাম বাংলার সংস্কৃতি, রীতি-নীতির নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে। বিয়ে উপলক্ষ্যে দুই বাড়িতেই উপহার সামগ্রী লেনদেন হয়। নিমু হাওলাদার ও জরিনার কাজের ব্যস্ততা আরো বেড়ে যায়। এদিকে বিয়েকে কেন্দ্র করে গ্রামের মেয়েরা অযাচিতভাবে এসে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠলে জরিনা বেগম অগত্যা দুই হাঁড়ি 'শিন্নি' রেঁধে খাইয়ে দেয় তাদের। বিয়ের আগের রাতে কনের হাতে পরানো হয় মেহেদি। সেই মেহেদি লাগানোকে কেন্দ্র করে মেয়েরা মেতে উঠে আনন্দে। গানের তালে তালে তারা কন্যার হাতে মেহেদি পরায়। বিয়ের কনে আয়েশাকে নিয়ে মেতে ওঠা উৎসবের বর্ণনা লক্ষণীয়–

[১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, *কাশবনের কন্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

খাটালের এক ধারে একপাল ছেলেমেয়ের ভিড়ের মধ্যে আয়েশার হলুদ শাড়ি পরা ছোট শরীরটি চোখে পড়বারও কথা নয়। হাঁটুর উপরে তার মুখের থুতনি, চোখ পায়ের পাতার দিকে। মেহেদীর রঙে হাতে পায় নকশা আঁকা। খুব নিচু সুরে একজন দুজন মেয়ে গানও ধরেছে: লাল করমচা দোলে রে, রক্ত মেহেদীর হাতে রে/আজ এই কন্যা যায় যায় বরের বাসরে।[১]

বিয়ে বাড়ির কাজে পাড়া প্রতিবেশীরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। হাশেম মৃধার স্ত্রী এসে তাই জরিনা বেগমকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই বসে গেল 'শিন্নি' রান্না করতে – 'এমন দিনে কি মেয়ের মা'র কোনো কাজ করতে হয়। আমরা আছি কী করতে। বলতে বলতে বেড়ার ওধার থেকে এগিয়ে আসে হাশেম মৃধার বৌ: কই, জরিনা কই? আপনি সরেন তো চাচী। না হয় গায়-গতরে নেই-ই কিছু কিন্তু একেবারে মরেওতো যাইনি।' (পৃ. ৬২)। বিয়ের দিনে বরপক্ষের জন্য কী খাবার-দাবার আয়োজন করা হয়েছে সে ব্যাপারে তাড়া দেয় হাশেম মৃধার স্ত্রী – 'এই চাচী, এই জরিনা এখন কি এরকম হাত ছেড়ে বসে থাকলে চলবে? কী কী ব্যবস্থা করেছ শুনি।' (পৃ. ৬৩)। নিমু হাওলাদারের মা বলে – 'চালের রুটি, মুরগির সুরুয়া, আরো আছে রসে ভেজানো পিঠা, নারকেলের দুধ মেশানো আলওয়ান।' (পৃ. ৬৩)। বিয়েবাড়িতে খাবার পরিবেশন ছাড়াও কিছু আনুষ্ঠানিকতা বা রেওয়াজ চালু রয়েছে। যেমন, পয়সাবার। পয়সাবার সম্পর্কে ছেলে-মেয়ের দলকে নিমু হাওলাদারের মায়ের পরামর্শ–'এমন পরীর মত মেয়ে নিতে আসছে, পয়সা ছাড়া কাম হবে না। পয়সাও নয়, টাকা টাকা। এক এক করে সবাইকে কিছু কিছু দিবে। না দেওয়া পর্যন্ত আটকানো পথ ছাড়বি না।' (পৃ. ৬১)

অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত মগদেরও সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানে রয়েছে স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর। এরকমই একটি অনুষ্ঠান, *সমুদ্রবাসর উপন্যাসে* বর্ণিত লাঙ্গবরণের উৎসব-এর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে মগ সম্প্রদায়ের সদস্য শুকার জবানিতে–

লাঙ্গ, অথবা লিঙ্গিয়া অর্থ স্বামী অথবা স্ত্রী। লিঙ্গিয়া অর্থাৎ কোনও লাঙ্গোনিকা বা কুমারীর পাণিপ্রার্থী এইদিন প্রায় দুইমাস কাল নানা পর্ব-অনুষ্ঠানের পর চুঙ্গুতে মিলিত হয়। এতদিন সব আচারের সর্বেসর্বা ছিল রাউলি – এদের প্রথার পুরোহিত। কিন্তু সেদিনকার অনুষ্ঠান প্রায় সবই ওঝার হাতে। অনুষ্ঠানের জায়গায় নানারকম তন্ত্রমন্ত্রের

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *যার সাথে যার*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৫৯

সঙ্গে সে তিন তিনবার দুইটা কাঁঠাল পাতা ছুঁড়িয়া দিবে। একবারও যদি একটা চিৎ এবং আর একটা উবুড় হইয়া না পড়ে তবে আবারও সব অনুষ্ঠান গোড়া হইতে শুরু করা নিয়ম। সে রকম হইলে আবার উপবাসী কন্যাকে নোতুন করিয়া তাহার বক্ষবস্ত্র এবং খানি বানাইতে হয়, বরকে এমন মোরগ আনিয়া ওঝাকে দিতে হইবে যাহার পায়ের আঙুলের ফাঁক সমান সমান।[১]

পুণ্যাহ কিংবা চৈত্র সংক্রান্তির উৎসবে লাঠিখেলার প্রচলনের চিত্র পাওয়া যায় *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসে। সেই লাঠিখেলার উৎসবকে কেন্দ্র করে গ্রামের নারী পুরুষেরা আনন্দে মেতে উঠত। লেখকের ভাষায়–

সারা গায়ে তেল মাখিয়া রঙীন শিরোস্ত্রাণ আর শুধুমাত্র কটিবদ্ধ বসনে, বাহুতে বাজু, গলায় তাবিজ আর হাতে বল্লম লইয়া যখন ইউসুফ সুজা আর মতলব সর্দারের দলবল সেইসব উৎসবে যোগ দিতে যাইত, গাঙের দুই ধারে অজস্র মানুষ আসিয়া দাঁড়াইত কেবল তাহাদের দেখার জন্য। মতলব সর্দারের মত লাঠি খেলায়ও বড় ওস্তাদ ছিল না অন্য কেউ, স্বয়ং ইউসুফ সুজাও না। রাজ্যের মানুষ নানা দিক হইতে দেখিতে আসিত তাহাদের।[২]

সমুদ্রতীরবর্তী জনজীবনের নানা সামাজিক প্রথা ও সংস্কার *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসের নানা অংশে বিধৃত হয়েছে। এরকমই একটি আচার হচ্ছে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কুমির ব্রত। এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য – কুমির যাতে তাদের জীবনে কোনো অনিষ্টসাধন করতে না পারে তা নিশ্চিত করা। এ অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাই উপন্যাসটিতে–

অনুষ্ঠানটি সাধারণ এবং সামান্য হইলেও তাহার গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করেন না। বাঁশ এবং খড়-মাটি দিয়া একটা কুমির মূর্তি এমন করিয়া বানান হয় যে মনে হইবে গাঙ্গের গর্ত হইতে হামাগুড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়াছে শরবন ভাঙ্গিয়া তাহার আসন এবং অধিষ্ঠানের ঠাঁই কুলগুরুর অথবা দেবদেবীর তুলনায় ন্যূন নয়। যুবক ছেলেরা যেমন যত্ন করিয়া তাহার প্রতিমূর্তি গড়ে প্রশস্ত প্রাঙ্গণের এক ধারে তেমনই কিশোরীরাও নিজেদের কল্পনা এবং ধ্যান-ধারণামত সমস্ত রকম উপকরণ সাজাইয়া দেয় তাহার সম্মুখে।... সব ঘর হইতে গৃহবধূরা শাঁখ বাজাইয়া যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্রে কুমিরের মুখের পাশে সম্মুখে লইয়া আসে ভোগ-ব্যঞ্জন। যাহার যত সাধের জিনিস, এমন কি কয়েক জোড়া মোরগ-মুরগি একটি ছাগলও সেই উপলক্ষে উৎসর্গ করার নিয়ম। মুরগিগুলি ঝটপট করিলেও পেঁপেতলায় বাঁধা ছাগলটা পেঁপেতলার ছায়ায় শুইয়া নিশ্চিন্ত মনে ছেলেদের আনিয়া দেওয়া কাঁঠালপাতা চিবায়। উপরের গাছগাছালি কিংবা সব্জিক্ষেতের মাচায় অজস্র পাখ-পাখালিও হৈ চৈ শুরু করিয়া দেয়

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *সমুদ্রবাসর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

সেই সময়। একসময় মেয়েরা কুমিরের বিরাট হাঁ করা মুখের কাছে মাটিতে গলবস্ত্রভাবে বসিয়া মৃদুস্বরে গান করে। সে গানের বিষয়বস্তু কেবলমাত্র একটা প্রার্থনা: যে যাহা পারিয়াছে সর্বস্ব আনিয়া দিলাম তোমাকে। তোমাকেও জীবনের নিয়ামক বলিয়া প্রণাম করি। তুমি এই ভোগ গ্রহণ করিয়া খুশি হও। আশা করি তুমি আমাদের স্বামী পুত্রের কল্যাণ দেখিবে। যেন তোমার লাঙ্গুল নাড়াইয়া বড় বড় মাছ গুলিকেও তাহাদের জালের মধ্যে ফেলিয়া দিতে পার।

ভোগ প্রসাদ শেষ হইয়া গেলে পুরুষেরা সে মূর্তি কাঁধে তুলিয়া লইয়া গাঙ্গে নামাইয়া দেয়। নানারকম শুভধ্বনি এবং বাদ্য-বাজনা-গীতের মধ্যে স্রোতের টানে সে মূর্তি অদৃশ্য হইয়া যাইবামাত্র সকলে আর কালবিলম্ব না করিয়া গাঙ্গের ভাটায় ভাসিয়া পড়ে তাহাদের ডিঙির উপর পাল তুলিয়া।[১]

লোকবিশ্বাস

লোকবিশ্বাস ও সংস্কার সভ্যতারই সমবয়সী। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই এসব বিশ্বাস মানুষের জীবনধারাকে প্রভাবিত করে আসছে। কালের পরিক্রমায় মানুষের জীবন থেকে অনেক লোকবিশ্বাস দূরীভূত হলেও আধুনিক এই সময়েও মানবসমাজে, বিশেষত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক সংস্কারই রয়ে গেছে। এসব বিশ্বাস কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও কার্যকারণ সূত্র মানতে চায় না। আবার এর সবই যে কুসংস্কার সেটিও বলা যায় না। কারণ অনেক লোকবিশ্বাসের উৎপত্তি নিহিত রয়েছে মানুষের জীবনাভিজ্ঞতা ও জীবন-দর্শনের ভেতর। গবেষকের ভাষ্য–

> মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ। কিন্তু প্রকৃতির সকল শক্তির চেয়ে বলীয়ান নয়। আত্মশক্তি ও দৈবিক শক্তির অভাব জীবন-বিড়ম্বনার কারণ হয়। মানুষ এর প্রতিকার কামনা করে। জীবনকে সে ভালবাসে, জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তারই। পীড়িত, বিঘ্নিত, লাঞ্ছিত জীবন দুঃখ ভোগ করে। সে জীবন পদ্ধতি এমন, যেখানে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা ও ক্ষণে ক্ষণে বিপত্তির আশঙ্কা আছে, সেখানে তাকে পূর্বাহ্নে সচেতন হতে হয় এবং ফলাফল বিচারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সংশয়-সন্দিগ্ধ মনের এই দোলাচল অবস্থাতেই বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাব বেশি পড়ে।[২]

পল্লিবাংলার জনজীবনের বিশ্বস্ত রূপকার শামসুদ্দীন আবুল কালাম উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে বাংলার চিরন্তন লোকাচার ও বিশ্বাসকে নানাভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতা থেকে লোকবিশ্বাসের নানা দিক উপন্যাসের পটভূমিকায় তুলে ধরেছেন তিনি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আচার সর্বস্বতা, চরম নিয়তি-

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪
[২] ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, গতিধারা, ঢাকা ২০০১, পৃ. ২৪৪

নির্ভরতা ও নানারকম সংস্কারে অন্ধবিশ্বাস গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। *আলমনগরের উপকথা* উপন্যাসে সাধারণ মানুষের নিয়তি-নির্ভরতা ও সংস্কারপ্রিয়তার নানা পরিচয় পাই। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অমর উপন্যাস 'লালসালু'র মত *আলমনগরের উপকথা*-য়ও সাধারণ মানুষের জীবনে পীরতন্ত্র ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রভাব লক্ষণীয়। আলমনগর গ্রামে পীর তথা নবাব বংশের গোড়াপত্তনের সঙ্গেও লোককথা ও কিংবদন্তি জড়িত। এই গ্রামে একটি বিরাট দীঘি আছে, যার পাড়ে অসংখ্য তালগাছ থাকার কারণে এটির নাম তালদীঘি। নবাব বংশের গোড়াপত্তনকারী পীর হজরত জামালুদ্দীন বহু বছর আগে একদিন তালদীঘির পাড়ে নামাজ আদায় করেছিলেন। পরবর্তীতে সে স্থানটি তীর্থস্থানে রূপান্তরিত হয়। এ গ্রামে তাঁর আগমনের দিনটিকে স্মরণ করার জন্য প্রতি বছর সেখানে 'সালগীরা' উৎসব পালিত হয় এবং বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য মানুষ সেখানে এসে ভিড় করে। ঐ দীঘি ও এতদ্‌সংলগ্ন অঞ্চলকে ঘিরে প্রচলিত আছে নানা রকম লোককথা। লেখকের ভাষায়–

> লোকে বলে ঐ সব তালগাছে ব্রহ্ম দৈত্য আছে। উহাতে যে পদ্মফুল ফোটে তাহাও ঐ স্থানের বাসিন্দা জীনপরীদের মনোরঞ্জনের জন্য। তাঁহাদের কাহারও বসতি পদ্মপাতার উপরে, কাহারও জলের গভীরে। বিশেষ করিয়া পূর্ণিমার রাত্রিতেই নাকি তাঁহারা সেখানে উৎসবে মত্ত হন। সমস্ত উৎসব শেষে প্রত্যুষকালে পীরসাহেবের সেই স্থানে দাঁড়াইয়া নামাজ আদায় করিয়া অন্তর্হিত হন। পীরসাহেব কোনো কারণে কূপিত হইলে, ইহারাই তাঁহার হইয়া প্রতিশোধের মানসে সবখানে ছড়াইয়া পড়েন। তাঁহারাই আনেন ওলা উঠা, মহামারী, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ! অন্যথায় ইঁহারা শান্ত, শান্তিতে থাকিতেই ভালোবাসেন। কিন্তু যদি কেহ সে শান্তিতে ব্যাঘাত জন্মায়, তাহা হইলে, মানুষের সমাজের মধ্য হইতে সে চিরতরে অবলুপ্ত হইয়া যায়।[১]

বিভিন্ন সময় একাধিক গ্রামবাসী কীভাবে এই দীঘির পানিতে বা তার আশেপাশে রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তার বর্ণনাও দিয়েছেন লেখক। পীর-ফকিরকে কেউ অবহেলা বা অপমান করলে তার ওপর প্রাকৃতিকভাবেই শাস্তি নেমে আসে, কেউ এ শাস্তিকে এড়িয়ে যেতে পারে না – এ ধরনের কথা আবহমানকাল ধরে বাংলার গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে। এ উপন্যাসে পীর সাহেবের মাজারের দিকে থুথু ছুঁড়ে মারায় মফেজকে সারাজীবনের জন্য মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যেতে দেখা যায়। জনশ্রুতি আছে, তালদীঘিতে একসময় অনেক কুমির ছিল। সাবেক সামন্তপ্রভু অরাতিদমন দেব এসব কুমিরকে পূজা

[১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, *আলমনগরের উপকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

করতেন এবং কুমিরের ভোগে ছোট ছোট শিশুদের বলি দিতেন। কোনো প্রমাণ না থাকলেও, গ্রামবাংলার আরো অনেক জনশ্রুতির মত এগুলোতেও আলমনগরের সাধারণ মানুষ গভীরভাবে বিশ্বাস করে।

বাংলার গ্রামীণ জনপদে বিপুল সংখ্যক মানুষ এখনও কবিরাজ, ওঝা, ফকিরদের তুক-তাকে বিশ্বাস করে। এছাড়া তাদের প্রাত্যহিক জীবনে নানা বিষয়ে কিছু অন্ধ-বিশ্বাসকে অনুসরণ করে। যেমন : দিনের প্রথমে নৌকা নিয়ে নদীতে নামার সময় কিংবা অন্য সময় নদীকে সমীহ দেখানো। এ প্রসঙ্গে *কাশবনের কন্যা* উপন্যাস থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষণীয়– 'এখনও গাঙ্গে ভাসিয়া পড়িবার সময় এক আঁজলা জল মাথায় তুলিয়া সমীহ দেখায়, কোনও কিছু আহারের কালে কণামাত্রও আগে নিবেদন করে গাঙ্গের উদ্দেশ্যে।' (পৃ. ৭৩)। *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসেও আহার্য দ্রব্য নিজেরা গ্রহণ করার পাশাপাশি নদী বা সমুদ্রকে দেয়ার উল্লেখ আছে। এর মাধ্যমে সমুদ্রের কৃপাদৃষ্টি লাভ করা যেতে পারে বলে অনেকের ধারণা। যেমন, পৌত্র রতনের কাছে 'গাঙ্গের পানিতে অন্ন ফেলা'র কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সখানাথ বলে, 'দান লইলে প্রতিদানের কথাও ভাবতে হইবে না?' অন্যদের মতো সখানাথও বিশ্বাস করে, প্রকৃতির দানের বিপরীতে প্রতিদান না দিলে অমঙ্গল হয়। *জায়জঙ্গল* উপন্যাসে দেখা যায় বৈরী পরিবেশে বসবাস করতে করতে বন্য শ্বাপদদের সমীহ করতে শুরু করেছে এ অঞ্চলের মানুষ। আত্মরক্ষার তাগিদে ও সতর্কতার প্রয়োজনে তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে নানারকম লোকবিশ্বাস, সংস্কার ও পূজাচার। তাই 'মাঝেমধ্যে বনের জন্তু-জানোয়ারকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তাহাদের উদ্দেশে নানা উৎসর্গ, তাহাদের স্বনামে না ডাকিয়া দেব-দেবী কিংবা সম্মানিত উপাধি পদবী যুক্ত সম্ভ্রান্ত নাম দিয়া সসম্ভ্রম সমীহ প্রদর্শনও সাধারণ লোকাচারের অঙ্গ হইয়া গিয়াছে।' (পৃ. ২৫)। তাছাড়াও এসব ভয়ংকর প্রাণীকুলের নামে তারা নানা পূজার্চনাও করে। যেমন– 'দক্ষিণ রায়ের পুজা বাঘকে সন্তুষ্ট, মনসা দেবীর পূজা সর্পকুলের উদ্দেশে, ওলাবিবি ও শীতলা দেবীর পূজা মরণব্যাধির উদ্দেশে, কুমিরব্রত কুমির-কামটকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য।'

গ্রামীণ জীবনের বেশ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের পাশাপাশি এখানকার মানুষদের রয়েছে নিজস্ব সংস্কার ও বিশ্বাস। যেমন, গ্রাম বাংলার মেয়েরা স্বামীর নাম মুখে নেয় না। ঘরের চালে কাক ডাকলে

অমঙ্গল ঘটে, এমন একটি বিশ্বাসের কারণে *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসে কাঞ্চনের আশ্রয়দাত্রী বৃদ্ধার মনে আশঙ্কা দেখা দেয়। লেখকের বর্ণনায় –

> ঠিক এমনই সময় বুড়ির বাড়ির চালের উপর একটি কাক কা-কা করিয়া বিশ্রিভাবে ডাকিতেছিল।
>
> বুড়ি ঘরের দাওয়ায় শুইয়াছিল নীরবে; কাকের অমন ডাকাডাকি শুনিয়া তাহার মনটা কী এক অমঙ্গল আশঙ্কা যেন ছাৎ করিয়া উঠিল; সে কাৎ হইয়া কাকটাকে তাড়াইবার জন্য বকাবকি করিয়া উঠিল: মর্ মর্ দূর হ্! –।[১]

জায়জঙ্গল উপন্যাসের হালিমনও ঘরের চালে কাকের ডাকাডাকি শুনে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ে। ননদিনী সাজুকে উদ্দেশ্য করে চিন্তিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে সে বলে, 'বুড়াবুড়ীর মুখে শুনছি, যে ঘরের চালে কাক ডাকে সেই ঘরে খুব শিগ্গীরই একটা অমঙ্গল নামিয়া আসে (পৃ. ৪৪)।' এছাড়া গ্রামের মানুষের তাবিজ-কবচেও অগাধ বিশ্বাস। তারা মনে করে এসব তাবিজ সঙ্গে রাখলে রোগ-ব্যাধি, বিপদ-আপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসের ইউসুফ সুজার বক্তব্য এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় : 'ইউসুফ সুজা গলার তাবিজটা উঁচাইয়া বলিল : গয়না কেন হইবে। এর মধ্যে সৃষ্টিকর্তার নাম লেখামাত্র। ঐ পাড়ের মুজফ্ফর মিঞা আনিয়া দিছে সেই কোন দূরের কালী সুরীর মেলা থেকিয়া। তারে বলে কোন অমঙ্গল ছুঁতে পারে না।' (পৃ. ৪৯)। নানা রকম রোগ-ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে অনেকে সাগর মেলা নামক এক উৎসবেও যোগ দেয়। লেখকের ভাষায় সেই সাগর মেলার বর্ণনা–

> সেইখানের জলে চান করলে বাঁজা মাইয়া মানুষেরও গর্ভ হয়, যে পুরুষের ক্ষ্যামতা নাই সেও হয় বীর্যবান, সারিয়া যায় রোগ-ব্যাধি, আরও আরও কত কী। সেইখানে যে মেলা বসে আর নানান রঙের আনন্দ উৎসবের বন্যা বইয়া যায় তার না কী আর হিসাব নাই। কত দূর দূর মুলুক হইতে নানান জাতের মানুষ আসে। অবস্থা না কী এমন ঘটে যে নৌকা পাড়া লাগেনেরও আর ঠাঁই খুঁজিয়া পাওন যায় না।[২]

কাশবনের কন্যা উপন্যাসের জোবেদার শাশুড়িরও অন্ধবিশ্বাস ওঝা-ফকিরের উপর। তাই সন্তানহীনা পুত্রবধূ জোবেদাকে নিয়ে পীর, ফকির, ওঝা, দরবেশের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়। ওঝা-ফকিরের রীতিনীতি বিষয়ে জোবেদা কিছু বলতে চাইলেও শাশুড়ির কটাক্ষপূর্ণ উক্তি: 'অলুক্ষুণিয়া বেলেহাজ মাগী এইসব রীত-

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাঞ্চনমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২
[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম , *সমুদ্রবাসর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

প্রকৃতির তুই কী বুঝস? একটা লব্জ উচ্চারণ করলেও পাপে-তাপে তোর জিহ্বা খসিয়া পড়বে। সন্তান চাই, বংশ জিয়াইয়া রাখতে হইবে। আমি অন্য কিছু বুঝি না।' (পৃ. ১৭৭)

কাঞ্চনগ্রাম উপন্যাসেও আছে সমাজে বিরাজমান নানা সংস্কারের কথা। বাড়ির উপর কাক ডাকাডাকি করলে যে অমঙ্গল হয় সে প্রসঙ্গ ছাড়াও মঙ্গল-অমঙ্গলের নানা লক্ষণের কথা উপন্যাসের বিভিন্ন অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রামের মানুষ এসবে সহজেই বিশ্বাস করেন। যেমন, উপন্যাসের এক পর্যায়ে এক কুম্ভকারের উল্লেখ পাই, যে বিশ্বাস করে, ঘরের বৌ-ঝিরা পুরুষ মানুষদের তুকতাক করে বিছানায় শুইয়ে রাখতে চায়। এছাড়াও ঘরে লক্ষ্মী ধরে রাখার জন্য লক্ষ্মীর মতো এক ঝিয়ারীকে ঘরের দেয়ালের মধ্যে পুঁতে রাখার লোকশ্রুতিরও উল্লেখ পাই।

লোকচিকিৎসা

গ্রামীণ মানুষ অসুস্থ হলে ঝাড়ফুঁক, ফকির, ওঝা এবং ভেষজ জিনিসপত্র দিয়েই তাদের চিকিৎসা চলত। তাই শারীরিক সমস্যায় চিকিৎসকের পরিবর্তে ওঝা-ফকিরের দ্বারস্থ হতো। ওঝা-ফকিররা অসহায় মানুষদের অসহায়ত্ব ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নানা ছলনা ও প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড করে বেড়ায়। বশীকরণ, সন্তান-ধারণ, মামলা জেতা এবং শত্রুদের বিনাশ সম্পর্কেও এরা বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচলিত ছিল। মানুষের রোগব্যাধি দূর করার জন্য যে চিকিৎসা তারা দিয়ে থাকে তা অবৈজ্ঞানিক। বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা হিসেবে তারা দেয় মন্ত্রপড়া পানিপড়া, শাক-শিকড়ের গুড়া, তাবিজ-তকমা এবং কিছু টোটকা ঔষধপত্র। সন্তানবতী না হওয়ায় এরকমই এক ভণ্ড ফকিরের দ্বারস্থ হতে হয়েছিলো *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসের জোবেদাকেও। *জায়জঙ্গল* উপন্যাসের জয়নাল শেখ-হালিমন দম্পতির সন্তান না হওয়ায় তারাও হিঙ্গুল নামক এক ভণ্ড ফকিরের শরণাপন্ন হয়। হিঙ্গুল ফকিরের অদ্ভুত কার্যকলাপ, হুমকি-ধমকি বাড়ির সকলকে আড়ষ্ট করে তোলে। তার চেয়েও অদ্ভুত ছিল তার চিকিৎসা প্রক্রিয়া। চিকিৎসার নামে অর্থসম্পত্তি হাতিয়ে নেয়া এবং নিজেদের কু-মনোবৃত্তি চরিতার্থ করাই ছিল এদের মূল উদ্দেশ্য। তাদের চিকিৎসা পদ্ধতির বর্ণনা লেখকের ভাষায়–

> এই পাটাতনেরই এক ধারে ফকিরের জন্য ছ্যাঁচা মুলিবাঁশের এবং হোগলা চাটাইয়ের আড়াল দিয়া কটা সাময়িক ঘর বানানো হইয়াছিল। সেই ঘরের মধ্যে একটি রেড়ির তেলের বাতির সম্মুখে মস্তবড় একখানা কেতাব খুলিয়া

বসিয়াছিল ফকির। তাহাদের দেখিয়া চক্ষু বুজিয়া বিড়বিড় করিয়া কিছুক্ষণ মন্ত্র পড়িল, তারপর চাউলভরা কোরার মধ্যে কিছু ধূপকাঠি জ্বালাইয়া পুঁতিয়া দিল। ... ধূপের ধোঁয়াভরা ঘরের মধ্যে চক্ষু বুলাইয়া দেখিল ফকির। সেই পাতাগুলি হালিমনের নাকমুখ বুক তলপেট হইতে জানু পর্যন্ত বারংবার বুলাইয়া বিড়বিড় করিয়া মন্ত্রতন্ত্র আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে। ফাঁকে ফাঁকে একেকবার করিয়া শরীরের উপর এমন জোরে ফু দিতেছে যে হালিমনের গায়ের বসনও উড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে।[১]

এই জঙ্গলভূমির মানুষ ছিল সকল নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণা নেই। তাই তারা এসব ওঝা ফকিরের ঝাড়ফুঁকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ঝাড়ফুঁক ছাড়াও চিকিৎসা বা ঔষধ পথ্য হিসেবে তারা বন্য লতা-পাতা-গুল্ম ব্যবহার করত। অজ্ঞাতপরিচয় মিন্নত আলীকে আহত-অর্ধমৃত অবস্থায় খুঁজে পাওয়ার পর লালু খাঁ-এর নির্দেশে জয়নাল শেখ, তালেব, মিকু সবাই মিলে যেভাবে সুস্থ করে তুলেছিল তা দেখলেই তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। চৈতন্যহীন মিন্নত আলীর 'মাথার ঘায়ে প্রথমে লতিকচু এবং গাঁদাপাতার রস দিয়া রক্ত বন্ধ করার পর বাটা-মরিচের পুরু পুরু প্রলেপ লাগাইতে আগন্তুক যুবকের কণ্ঠ হইতে একটা ক্ষীণ আর্তনাদ ধ্বনি শোনা গেল এবং তাহার দেহটাও একদিকে মোচড়াইয়া নড়িয়া উঠিল।' (পৃ. ১১)। তাছাড়া উপন্যাসের চরিত্র অভিজ্ঞ লালু খাঁ এদেরকে শেখাতো নানা লতাপাতার ঔষধি গুণাগুণ– 'দেহের কাটা জায়গায় কচুডালের রস দিলে কেমন করিয়া রক্তপাত বন্ধ, এমনকি ব্যাথা পর্যন্ত দূর করা যায়, সর্দি-কাশি কি জ্বরে তুলসী কী নিম পাতার রস কী উপকার করে, আদা এবং কাঁচা হলুদের কী ব্যবহার, কোনটার সঙ্গে কী অনুপান মিশাইলে কী ফল হইবে তাহা সবই যেন লালু খাঁর নখ-দর্পণে ছিল।' (পৃ. ৫৭)। *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসে ছবদার মাঝির কন্যা মেহেরজান হাঁসের জন্য শামুক কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেললে 'হোসেন মেহেরজানকে অভয় দিয়া ক্ষতস্থানটি ধুইয়া দিল কেরোসিন তেলে; মুখে পান চিবাইয়া বাঁধিয়া দিল কচুর ডাঁটার বাকল দিয়া।' (পৃ. ১৬৪)। পল্লিবাংলার মানুষ এভাবে লোকাচারের ওপর ভিত্তি করে নিজেরাই নিজেদের চিকিৎসা করে থাকে। *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসে দেখা যায়, ক্ষীরসায়রে আবাদ করার সময় কুমিরের আক্রমণে আহত হয় সুজাত আলী। সে সময় নিজেই নিজের শুশ্রূষার দায়িত্ব হাতে তুলে নেয় সে। 'প্রথমে সমুদ্রের জলে ভাল

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *জায়জঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪

করিয়া ধুইয়া কিছু কচুপাতার রস ছড়াইয়া দিল ক্ষতস্থানগুলির উপর, তারপর বাটা মরিচের কয়েক থাবা তাহার উপর বসাইয়া আবারও কচুপাতায় ঢাকিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল সুজাত আলী।' (পৃ. ১৯৬)

কাঞ্চনমালা উপন্যাসে দেখা যায় গ্রামের মানুষ অসুখ-বিসুখ কিংবা বিপদে-আপদে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে কবিরাজ, ওঝা-ফকিরের কাছে দৌড়াতো। ঝাড়–ফুঁক ও তাবিজ-কবচের ওপর তাদের আস্থা ছিল অবিচল। এ উপন্যাসে এক গৃহস্থের স্ত্রীকে সাপে কাটলে গৃহস্থটি ডাক্তারের কাছে না গিয়ে গুনিন, ওঝা ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসার চেষ্টা করে। বেদে সর্দার মঙ্গল মাঝিও ধূপ জ্বালিয়ে নানারকম তন্ত্রমন্ত্র পড়েও অসহায় নারীটিকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়। কাঞ্চনের আশ্রয়দাত্রী বৃদ্ধাটিকেও দেখি তার 'বউ আর মেয়েকে লইয়া দূর গ্রামের ... এক আউলিয়া ফকিরের মাজারে' যাওয়ার পথে ঝড়ের ভেতর নৌকাডুবির কারণে আপনজনদের চিরতরে হারিয়ে ফেলতে। শুধু অসুখ বিসুখেই নয়, নানা বিষয়েই ওঝা-ফকিরের জাদুমন্ত্রের ওপর গ্রামের মানুষের বিশ্বাস অত্যধিক। গফুর মিয়ার বাড়িতে চুরি হলে বেদে দলের কালা ও ধলা কর্তৃক বাটি চালা দেওয়ার ঘটনা তাই প্রমাণ করে, যদিও এগুলো বেদেদের আয়-রোজগারের একরকম 'ধান্ধা' বলেই সাধারণ্যে প্রতীয়মান হয়।

সমুদ্রবাসর উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত নানারকম চিকিৎসাপদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে। এসব চিকিৎসার মধ্যে ওঝা-বৈদ্যের তাবিজ-কবচ ঝাড়-ফুঁক এবং বিভিন্ন গাছ-গাছড়া বা শেকড়-বাকড় দিয়ে নিজে নিজেই চিকিৎসা করার কথা উল্লেখ আছে। এ উপন্যাসে মগ-ওঝা কর্তৃক উপকূলের এক সাধারণ বাসিন্দা সিকু-র চিকিৎসার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন লেখক–

> একটা মাটির তাওয়ায় এক রাজ্যের সুঁচ আর ঝি-বৌদের খোঁপার কাঁটা পুড়াইয়া সিকুর প্রায় সমস্ত পা-টাই এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া দিল সে, সেই সঙ্গে কেবলই বুলাইল বন-জঙ্গলের বিষ পাতার ডাল। ... এক সময় সারা গায়ের উপর থুতু ছিটাইতে আদেশ করিল কাঁটা সুঁচগুলি খুলিয়া, আরও মাখাইয়া দিল কী সব ফলমূলের রস। প্রক্রিয়াটা চরমে উঠিল যখন সেই পায়ের উপর ছড়াইয়া দিল একগাদা চীনাজোঁক। বিড়বিড় করিয়া কী সব মন্ত্র-তন্ত্র পড়িয়া জোঁকগুলিকে সে বসাইয়া দিল পায়ের এইদিক সেই দিক বাছিয়া।... জোঁকগুলি মহা উৎসাহে কাঁটায়

ফোঁড়া ক্ষতগুলিকে চুমুক দিয়াও তৎক্ষণাৎ কুঁকড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইতেছে। ওঝা তাহার একটা হাতে তুলিয়া সকলকে দেখাইল পা হইতে নির্গত বিষের ক্রিয়ায় কী নিদারুণভাবে তাহাদের মৃত্যু ঘটিতেছে।[১]

তবে এসব ঝাড়ফুঁক থেকে রোগীরা যেটুকু উপকার পাচ্ছে বলে মনে করত তা মূলত তাদের অন্ধবিশ্বাসের কারণে একধরনের মানসিক প্রশান্তি। ওঝার চিকিৎসার পরদিন সুজাত আলী অবস্থা জানতে চাইলে সিকু বলে, 'সকালবেলা মনে হইছিলো পায়ের আঙ্গুলগুলো বোধ হয় একটু লড়ন-চড়ন করতে পারতে আছি।' যদিও সুজাত আলী বারংবার পরীক্ষা করেও তেমন কোনো বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করতে পারেনি। গ্রামীণ মানুষদের অনাধুনিক চিকিৎসা সেবা নেয়ার পেছনে তাদের অশিক্ষা, অজ্ঞতা, প্রাচীন বোধ-বিশ্বাস ছাড়াও অন্যতম আরেকটি কারণ হলো– প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষিত চিকিৎসকের অভাব। গ্রামের মানুষদের ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা নিতে হলে অনেক দূর রাস্তা পাড়ি দিয়ে শহরে আসতে হতো। তাছাড়া দরিদ্র-ছিন্নমূল মানুষগুলোর পক্ষে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করাও সম্ভবপর ছিল না। তাই সুজাত আলী আশা পোষণ করে যদি খরচপত্রের ব্যবস্থা করতে পারে তাহলে 'একদিন যেমন করিয়া পারি তোমারে লইয়া যামু ডাক্তারের কাছে।' সুজাত আলীর বক্তব্য থেকে তাদের অসহায়ত্বই প্রকাশ পায়।

গ্রামীণ হাট

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদগুলোতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের কেন্দ্র হিসেবে গ্রামের মানুষদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে হাট-বাজার। গ্রামের মানুষদের উৎপাদিত শস্য-পণ্য কেনা-বেচা ছাড়াও হাট গ্রামবাসীদের মিলন-মেলা হিসেবেও গুরুত্ব বহন করে। গ্রামে হাট বসে সপ্তাহে এক কিংবা দু'দিন। নির্দিষ্ট দিনে মানুষ হাটে জড়ো হয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনে এবং উৎপাদিত জিনিস বিক্রি করে। তাছাড়া গ্রামের পুরুষরা সারাদিন মাঠে কাজ করে বিকেলে হাটে এসে গল্প-গুজব করেও সময় কাটায়। কখনো কখনো হাটবারকে কেন্দ্র কারে নানা বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডেরও আয়োজন হয়ে থাকে। *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসেও দেখা যায়, হাটে বা গঞ্জে বিভিন্ন শ্রেণির ক্রেতা-বিক্রেতা এসে জড়ো হয়। 'একদিকে উপকূলভূমি বিস্তৃত জঙ্গল হইতে আসা কাঠ-লাকড়ি, আর নানাদিক হইতে হাল-হালুটির লোকেরা লইয়া আসে তাহাদের বেসাতি। ধান, চাউল, সুপারি, নারিকেল, এমনকি মাছের কারবারীরাও আসা-যাওয়া করে

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *সমুদ্রবাসর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

দূর-দূরান্ত হইতে।[১] জেলেরা প্রায় সারারাত মাছশিকার করে ভোরবেলায় সে মাছগুলো হাটে তুলে। মাছ বিক্রি করে যে অর্থ উপার্জন করে সেটি দিয়েই নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনে বাড়ি ফিরে যায়। তবে কখনো কখনো হাট-বাজারের ইজারাদার বা প্রভাবশালী কাউকে বিনামূল্যেও মাছ দিয়ে দিতে হয় তাদের। ধান চাষিদেরকেও ফড়িয়া-দালালের দৌরাত্ম্যের শিকার হতে হয়। এই মধ্যস্বত্বভোগীরা মহাজন বা পাইকারদের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে কম দামে ধান কিনে দেয় এবং নিজেরা মহাজনের কাছ থেকে কমিশন গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে কৃষকদের সচেতনতা সত্ত্বেও ফড়িয়া-মহাজনের খপ্পরে পড়ে যেতে হয়। সমুদ্রবাসর উপন্যাসের সুজাত আলীও মুজফ্ফর মিঞার হাত থেকে রেহাই পায়নি। প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষণীয়–

> কী পরিমাণ হিসাব করিয়া কও। আমার গাহেকও হাটে আছে, সে-ই উঠাইয়া লইয়া যাইবে। বাদবাকি যা আছে তারও ব্যবস্থা করিয়া দিতে আছি। তোমাগো আর কষ্ট করিয়া হাট পর্যন্ত টানিয়া আনতে হইবে না। ...চান্দুই খেয়াল করিল হঠাৎ পশরার চারদিকের কৌতূহলী ক্রেতার ভিড়টা কমিয়া গিয়াছে।[২]

হাটে আসা আরো নানাশ্রেণির মানুষের মধ্যে কুমাররা তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন তৈজসপত্র হাটে বিক্রি করে, মগ সম্প্রদায়ের সদস্যরা হাতে বোনা গামছা, লুঙ্গি এবং গুড় মেশানো তামাক, চুরুট, বিড়ি, রেশম পোকার গুটি থেকে সংগ্রহ করা সুতো দিয়ে তৈরি শাল, লুঙ্গি এবং থান কাপড় হাটে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। দূর-দূরান্ত থেকে অনেক ব্যাপারী এসে কিনে নিয়ে যায় এসব পণ্য। এ উপন্যাসে বর্ণিত বৈদ্যদের উপার্জনের উৎসও বস্তুত গ্রাম্যহাট। হাটভর্তি মানুষের সামনে বাকচাতুর্যের মাধ্যমে ঔষধ বিক্রি করে বৈদ্য সম্প্রদায়ের মানুষরা। মানুষকে আকৃষ্ট করতে তারা নানা ছল-চাতুরীরও আশ্রয় নেয়। লেখকের ভাষায়–

> বৈদ্য একটা তৈলের শিশি নানা রকম সরীসৃপে ভরা ভাণ্ড হইতে তৈল ভরিয়া সকলকে দেখাইল: এইসবও বিনা পয়সায় বিলাইয়া দেওয়ার আদেশ। কিন্তুক এই শিশি বিলাত হইতে আসে বলিয়া কেবল তার খরচ বাবদ সামান্য কিছু ছাড়া অন্য কোনো দাবি নাই। আমার পরম গুরু হজরতের মাজারে কয়েকটা লোবানের জন্য কিছু দিলে সুফল দ্বিগুণ হইবে।[৩]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

গ্রামের মানুষের মিলনকেন্দ্র হিসেবেও হাটের গুরুত্ব অপরিসীম। হাটকে উপলক্ষ্য করে নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে একত্র হয়। কেনাকাটার ফাঁকে ফাঁকে খোশগল্পে মেতে ওঠে। এছাড়াও হাটবারে বসে মেলা, যেটি সব বয়সের মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। মেলা উপলক্ষে গায়েন ও বয়াতিরা গানের আসর বসায়, সাপের খেলা দেখানোর জন্য আসে সাপুড়েরা। আর এভাবে নানা উৎসব আয়োজনে গ্রামীণ লোকজীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে হাট। *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই বেদে দলের সদস্যরা হাটে নাচ গান ও জাদু প্রদর্শন করে অর্থ উপার্জন করে। লেখকের ভাষ্যে – 'হাটে সাপের খেলা এবং চাঁপার নাচ দেখার জন্য যেন হাটশুদ্ধ যতেক লোক সব আসিয়া জড়ো হইয়াছে।' (পৃ. ৯৭)

হাটকে কেন্দ্র করে নদীপথেও ব্যস্ততা বেড়ে যায়। যেহেতু উপন্যাসে বর্ণিত গ্রামগুলো নদীতীরবর্তী; তাই দেখা যায়, নৌকাযোগে বিভিন্ন গ্রাম ও ঘাট থেকে লোকজনের সমাগম ঘটে। লেখকের বর্ণনায় সে চিত্র অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রস্ফূটিত হয়েছে –

> নদীতে অজস্র ডিঙি নৌকা। হাট প্রায় ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। বেচা-কেনা সওদা-পত্র করিয়া লোকজনেরা দিকবিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। চড়নদারেরা কেহ হিসাবে মুখর, কেহ বা পানি সেচিতেছে, কেহ বা দ্রুত হস্তে বাহিয়া চলিয়াছে। তাহাদের গতিবিধিতে গাঙের পানিতে যে আলোড়ন উঠিতেছিল তাহাতে এক ধারে লগি পুঁতিয়া বাঁধা তাহাদের নৌকাগুলি দুলিতেছে।[১]

বিশেষ করে হাটবারে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসে জমজমাট করে তোলে গ্রামের পরিবেশ। নিমু হাওলাদার বাড়িতে তৈরি গুড় বিক্রি করতে নিয়ে যায় হাটে। আর সে প্রসঙ্গেই হাটের চমৎকার বর্ণনা উপস্থাপন করেন লেখক–

> সপ্তাহের হাট তখন জমজমাট। এ গ্রাম সে গ্রামের চাষী মিয়া, বড় মিয়াদের ভিড়। পাশের খালে হরেকরকম ডিঙি। দূর দূর ঠাঁই থেকে এসেছে ব্যবসায়ী-ফড়িয়াদের নৌকো। গমগম করছে চতুর্দিক। একধারে বসেছে একদল গায়কের আসর। দোহারদের গলায় 'যার সঙ্গে যার প্রেম প্রীতি' ধুয়া হাটের সব কোলাহল ছাপিয়ে উঠতে চাইছে। হরেকরকম বেসাতির সংখ্যা শুমার নেই।[২]

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাঞ্চনমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *যার সাথে যার*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪

আবার ভাঙা হাটের চমৎকার বর্ণনাও পাই একটু পর–

> তখন হাট প্রায় ভাঙতে শুরু করেছে। সবখানেই কমে এসেছে খদ্দেরদের ভিড়। খালপাড়ের নৌকাগুলিও নোঙ্গর তুলে এদিক সেদিক ভেসে পড়েছে। এমনকি গুড়ের উপর ভন ভন করে ওড়া, পাগলপারা মক্ষীমাছিগুলিও আর তেমন নেই। ভেঙ্গে গেছে সেই গানের আসর, ভেঙ্গে গেছে কিন্তু তার ধুয়ার রেশ বাতাসে।[১]

গ্রাম্যহাট গ্রামীণ জনজীবনে কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করে তার মনোগ্রাহী বর্ণনা পাই *নবান্ন* উপন্যাসে। এখানে যে হাটটির কথা বলা হয়েছে সেটি কালের বিবর্তনে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে বিরাট আকার ধারণ করেছে। আশেপাশের কয়েক গ্রামের মানুষের নিত্যপ্রয়োজন মেটানোর মাধ্যমে হাটটি এখন তাদের জীবনের অপরিহার্য এক অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। লেখকের ভাষায়–

> সেই এককালের হাট এখন আরো বড়। একটুকু ঠাঁইর জন্য লোকজন এখন চতুর্দিকে উপচে পড়ছে। মানুষ আর নানারকম ডিঙ্গির ভিড়ে জায়গাটাকে মনে হয় একটা বড় আঁখের গুড়ের জালার মতো, মক্ষী-মাছির আবরণের তলায় আসল বেসাতিই আর নজরে পড়ে না।[২]

দেশ দুনিয়ার খবর রাখার উৎসও এই হাটই। এ কারণেই বিকিকিনির প্রয়োজন নেই যাদের, তারাও নিয়ম করে হাটে ঢুঁ মারে। হাটের নানা প্রান্তে ঘটে চলে টুকরো টুকরো নানা ঘটনা, লেখকের প্রাণবন্ত বর্ণনায় যা আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত করে তোলে–

> কোথাও কোথাও জোর-মজলিশ বসেছে টিন অথবা তালপাতায় ছাওয়া চালাঘরের নিচে। জাত ব্যবসায়ী আর দোকানীরা হৈ-চৈতে মুখর। ফড়িয়া টাউটরা কখনো নিজেরা, কখনো চর পাঠিয়ে সন্তর্পণ দৃষ্টি রাখছে সওদাপত্রের উপর। কোনও কোনও সময় ডিঙি এসে হাটের কাছাকাছি ভিড়বার আগেই অভ্যন্তর থেকে আনা মালামাল ফড়িয়াদের বড় বড় নৌকায় উঠে গেছে। যেসব মানুষ সামান্য বেসাতি নিয়ে বসেছে তারা একরকম অন্তেঃবাসী। কেবল তাদের উপরই ক্রেতাদের তম্বিতম্বার শেষ নেই। এক রকম লুকিয়েই নিয়ে আসে তারা তাদের সামান্য সংগ্রহ, ডিঙি ঢেকে, খালুই গামছায় জড়িয়ে, মাথার সাজি কলা কী কচুপাতার আঁটঘাঁট করে বেঁধে। সব হামলা এড়িয়ে যতো তাড়াতাড়ি পারে সব বেচে দিতে তারাও উদগ্রীব হয়। অনেকেরই বড়ো দোকানীদের মতো খাজনা দেবার সামর্থ্য নেই, তাদের মতো দরদাম হাঁকারও সাহস নেই।[৩]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *নবান্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

[৩] প্রাগুক্ত।

গ্রামীণ জীবনপ্রবাহের ক্রমবিবর্তন

সময়ের প্রবাহে নাগরিক সভ্যতার ছোঁয়ায় গ্রামজীবনের রুচি, সংস্কৃতি, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও বহমান ঐতিহ্যধারায় যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তা উপন্যাসের ঘটনাক্রমে বিভিন্ন পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এক সময় বাংলাদেশের সবকিছুই ছিল গ্রামনির্ভর। গ্রামের মানুষ তাদের দৈনন্দিন কাজে একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসত। কারো ঘর ছাওয়া কিংবা নতুন ঘর ওঠানো, ক্ষেতে হালচাষ, ধান কাটা, ডিঙি তৈরি অথবা মাছ ধরতে যাওয়া প্রতিটি কাজেই যেন উৎসবের আমেজ ছিল। গোটা গ্রামই যেন ছিল একটি বৃহত্তর পরিবার। একের বিপদে অন্যের এগিয়ে আসা, একের উৎসব আয়োজনে আরো দশজনের কাঁধ মেলানো, এসবই ছিল পল্লিবাংলার শাশ্বত রূপ। কিন্তু কালের বিবর্তনে গ্রামবাংলার সেই শাশ্বত রূপেও পরিবর্তন এসেছে। মানুষে মানুষে দূরত্ব বেড়েছে, পরস্পরের প্রতি নিখাদ আন্তরিকতা, অন্যের সুখ-দুঃখে নিঃসংকোচে এগিয়ে আসা এসবের মধ্যেও কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটেছে। প্রাসঙ্গিক অংশ স্মর্তব্য–

> শৈশবকালে দেখিয়াছে এইসব কাজে কখনই তেমন কোনও বেগ পাইতে হয় নাই। একজনের কাজে আগ বাড়াইয়া দশজন আসিয়া যোগ দিয়াছে। ঘর ছাওয়া অথবা নোতুন করিয়া বানান, পুকুর পরিষ্কার, ক্ষেতে হাল দেওয়া কিংবা ধান কাটা বাছাই, নৌকা ডিঙ্গি তৈরি, এমন কি মাছ ধরতে গাঙ্গে কি বিলে যাওয়া, চৈত্র-বৈশাখ ক্ষেতে-মাঠে নোতুন ওঠা পানির মধ্যে মশাল জ্বালাইয়া মাছের শিকার–কোনও কাজই এককভাবে অথবা উৎসবহীনভাবে সম্পন্ন হয় নাই।[১]

আবহমানকাল ধরে বাংলার পল্লিবাসী প্রান্তিক মানুষের জীবন এক চিরন্তন ছন্দে প্রবাহিত হচ্ছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নারী ও পুরুষ ঘরে-বাইরে তাদের নিজ নিজ কাজে মেতে থাকে। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাসে আবহমান গ্রামবাংলার এই জীবনচিত্রের পরিস্ফুটন দেখতে পাই। *সমুদ্রবাসর* উপন্যাসে দৈনন্দিন নানা কাজে গ্রামবাসীর জীবন নানা অনুষঙ্গ প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃতির মায়ায় বাঁধা এই মানুষগুলো প্রকৃতির দান গ্রহণ করে বেঁচে থাকে আর জীবনজীবিকার রসদও তারা সংগ্রহ করে প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকেই। করিমন ও সোনা বৌ-এর বাক্যালাপেও এটি প্রতীয়মান হয়। সোনা বৌ বলে, 'দেখেছো

[১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, *কাশবনের কন্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

সই, জীবন দিছে যিনি, আহার জোগায় তিনি, মাছের অভাব নাই, শাক সব্জীরও অভাব নাই।' উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের প্রাত্যহিক কর্মব্যস্ততায় ফুটে ওঠে গ্রামবাংলার এক চিরায়ত শাশ্বত রূপ–

> করিমনের যত কাজ ঘরে, তার অনেক বেশি বাহিরে। হাঁস-মুরগী আছে, আছে পায়রা-কবুতরগুলির খবরদারি। ... খালের ঘাটের কাছে সিকুর তৈরি বাঁশের চাঁই এর মধ্যেও নিত্যই কিছু না কিছু জুটিয়া যায়ই। সেই সকালে, অভ্যাসমত সন্ধ্যার সময় পাতিয়া রাখা বড়শীর সঙ্গে গাঙ্গের একটি বিরাটাকার মাছও পাওয়া গেল।[১]

> করিমনের সংসারের পরিধিই বা কতটুকু, কিন্তু তাহার ব্যস্ততার অন্ত নাই। হাঁস, মুরগির নানারকম তদারকত ছিলই, এখন শাক-সব্জি, তরিতরকারির ক্ষেত বা চারাগুলির দিকে তাহার মনোযোগ আরো বেশি। সুজাত আলী চরের আবাদে উৎসুক হইবার পর হইতে সে-ও অবিশ্রান্তভাবে বাড়িঘরের আশে-পাশে যতটুকু ঠাঁই ছিল, কেবলই নানারকম চাষাবাদ এবং শাক-সব্জির ফলনে মনোযোগী হইয়া উঠিয়াছিল।[২]

> চান্দুর বৌ জোবেদা এবং দুই বোন ভানু আর আনু ইতিমধ্যে সব কিছুই গুছাইয়া লইয়াছে। এতগুলি মানুষের জন্য রান্না-বান্না, মাচানের নিচে কাছাকাছি জমিনের উপর শাক-সব্জির বপন-রোপন তদারকির ফাঁকে ফাঁকে বড়শি পাতিয়া সমুদ্র হইতে শিলন-পাঙাশ টানিয়া উঠান, ডিম হইতে ফোটা হাঁস-মুরগির ছানাগুলিকে চিল-শকুনের খপ্পর হইতে রক্ষা করিবার খবরদারি ইত্যাদি।[৩]

গ্রামের মানুষের সকাল-সন্ধ্যা-রাত্রি কাটে এক নির্দিষ্ট ছন্দে। সকালে সূর্য ওঠার পরপরই সাধারণত গ্রামের মানুষের কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়। চাষিরা ক্ষেতে কাজ করতে কিংবা গরু ছাগল মাঠে চরাতে বের হয়ে পড়ে। গ্রামের মহিলারাও ব্যস্ত হয়ে পড়ে গৃহস্থালি নানা কাজে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র কাঞ্চনও গৃহস্থ ঘরের আশ্রিত ছেলে। এক বৃদ্ধা মহিলার আশ্রয়ে থাকে সে এবং তার ক্ষেত-বাগান দেখাশোনা করে; আবার গ্রামের কেউ কিছু করতে বললেও করে দেয়। বৃদ্ধাও এ কাজে পিছিয়ে থাকে না। *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসে এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা –

> বুড়ি সকালে উঠিয়া ঘরে-উঠানে এ কাজ সেকাজ করিয়াছে; বিশেষ করিয়া তাহার ঘরের প্রান্তে তরি-তরকারির ছোট ক্ষেতটুকুর পরিচর্যা করিয়াছে। অতঃপর সামান্য আহার্য প্রস্তুত করিয়াছে নিত্যকার মত। অবশ্য এ ব্যাপারে

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *সমুদ্রবাসর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

না ডাকিলেও কাছের এক বাড়ির একটি মেয়ে, ভানু, তাহাকে সাহায্য করিয়া গিয়াছে। প্রায়ই সে তাহা করে। পরে সে একখানা পাখা হাতে লইয়া বারান্দায় একখানা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে।[১]

অন্যত্র –

রাত্রির বিশ্রামের পর তখন আবার সারা গ্রাম জাগিয়া উঠিয়াছে। চাষিরা কেহ চাষে বাহির হইয়াছে, কেহ বা গত রাত্রে পাতা 'চাই' তুলিয়া মাছ লইয়া ফিরিতেছে।[২]

আবার বেলাশেষে –

বেলা তখন পড়িয়া গিয়াছে। দিনের গরম-গুমোট কাটিয়া সুন্দর গা জুড়াইয়া দেওয়া হাওয়া বহিতেছে। গ্রামে নৌকা চলাচল কমিয়া গেল। ইতস্তত ছাড়িয়া দেওয়া গরুগুলিকে তাহাদের মালিকেরা আসিয়া বাড়ি লইয়া গিয়াছে; গ্রামের এ-বাড়ি সে-বাড়ি হইতে উনানের ধোঁয়া পাকাইয়া পাকাইয়া আকাশে উঠিতেছিল।[৩]

সময়ের প্রবাহে প্রাত্যহিক জীবনে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনের স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে *কাশবনের কন্যা* উপন্যাসের বিভিন্ন পর্যায়ে। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সূচনালগ্ন থেকে শহুরে সভ্যতার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাবে গ্রামীণ জনজীবনের যে ব্যাপক পরিবর্তন, সেটি উপন্যাস-অন্তর্গত চরিত্রের জীবনাচরণ ও আলাপচারিতায় ফুটে উঠেছে নানাভাবে। যেমন, হোসেনের ভাবনালোকের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার শৈশব ও পরিণত বয়সে দেখা গ্রামের জনজীবনের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক। হোসেন তার শৈশবে দেখেছে, গ্রামের সব মানুষ যে কোনো কাজ – তা কারো পারিবারিক আর ব্যক্তিগত হলেও সবাই একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে করেছে। কিন্তু এক দশকের ব্যবধানে চিত্র অনেকটাই পাল্টে গেছে। ফলে জীবন-জীবিকা নির্বাহের উপায়-উপার্জনের পথও হয়ে পড়েছে বেশি কঠিন ও সমস্যাসংকুল। মাঝির পেশায় নবাগত হোসেনের সঙ্গে এ পেশায় অভিজ্ঞ বৃদ্ধ ছবদার মাঝির কথোপকথনে তা স্পষ্টতই প্রতীয়মান–

নৌকা বান্ধার জন্য এখন চর দখলের লাহান কাজিয়া বিবাদ লাগিয়া যায়। ... আমি যখন পয়লা এ ঘাটে আসি তখন এত নৌকা আদতেই আছিলো না, আর চড়নদারও অছিলো নানান গাঁও-গ্রামের বড় বড় মানুষ। তাগো কৃপায় কেবল কেরায়ার পয়সাটাই না, ভালো-মন্দ অনেক কিছু জুটিয়া যাইতো। নৌকা ছাড়ার আগে বাজার

[১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, *কাঞ্চনমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

করিয়া আনতেন তারাই, কিছু রান্না-বান্না হইতো, কিছু লইয়া যাইতো ঘর পরিবারের জন্য। সেসব ঘর বাড়িতেও হয় অনেক আদর-আস্তিক, নাহয় উপরি কামকার্য জুটিয়া যাইতো। এখন সেসব মানুষেরা আর তেমন এইসব দিকে আসা যাওয়া করে না। যে কয়জনই বা আসে যায় তারগো উপর যেন তামাম মুল্লুক কাউয়ার লাহান ঝাঁপাইয়া পড়ে। তারে আগাম কিছু না দিলে সে আমলেই নেয় না।[১]

এ অঞ্চলের জনপদগুলির সঙ্গে শিকদারের আশৈশব সম্পর্ক। পিতামহ করমালির সঙ্গে সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত। তার শৈশবে দেখা গ্রামের সঙ্গে পরিণত বয়সের দেখার পার্থক্য লেখকের ভাষায় নিম্নরূপ–

সেইসব গ্রামের পাশ দিয়া বহা গাঙ্গ কবে কোন যুগে মজিয়া গিয়াছে, চতুর্দিক কেবল খাল-বিল-জল, মধ্যে গাছ-গাছালিঘেরা পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রাম। কৈশোরকালে তাহার মধ্যকার অনেক ঘর-বাড়ি সুন্দর, বড় ভিন্ন রকমের মনে হইত: খড়ের চাল, মাটির দেয়াল, খিড়কী, কেঁওয়ার, এমনকি ভিতরে গঠনও ছিল অন্যরকম। কামদেবপুর, বৈশাখী, অভয়নীল, দেহলিদুয়ার, সুভিতপুর, নাচনিমহল, রূপারঝোর- প্রত্যেকটি গ্রামে বাহিরের সমস্ত ঔদ্ধত্যকে উপেক্ষা করিয়া যে জীবনযাত্রা চালু ছিল, তাহার মধ্যে করমালীকে অত্যন্ত আত্মস্থ মনে হইত। সকল গ্রামের মানুষ একসাথে যেভাবে বৈশাখী পূর্ণিমা অথবা চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় মাতিয়া উঠিত, তাহার মধ্যে করমালীও জড়াইয়া পড়িত। সে সম্বন্ধে নিজে বড় হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক রকম কানা-ঘুষা শুনিয়াছে শিকদার, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কোনও কিছু জানিবার সুযোগ হয় নাই। যখন কিছু বুঝিবার সময় হইল, ইতিমধ্যে বাহিরের সেইসব ঔদ্ধ্যত্যকে টিকাইয়া রাখার প্রয়াস করিতেছিল যাহারা, তাহারা এবং তাহাদের জীবন-যাপন ও সংস্কার-আচারকেও অন্য এক যুগ প্রচণ্ড গাঙ্গের স্রোতের মত একেবারে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।[২]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সংস্কৃতি রুচিবোধেরও পরিবর্তন হয়েছে। কবিয়াল শিকদারের সঙ্গে এক গ্রামের এক গৃহবধূর বাক্যালাপে তা প্রকাশ পায়–

এইদিকে গীত-বাদ্যের আসর বসে বলিয়া একটা কথা শুনছিলাম। মেয়েলোকটি একটুকাল অবাক হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল তাহার চোখে-মুখে; একটা হাত উঁচাইয়া সে গাঙ্গের দিকটা দেখাইয়া দিল: কবে কোথায় তার স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া গেছে। তাগো ঠাঁইও ভাঙ্গিয়া পড়ছে, আর সেইসব চলও নাই। তবে হয় বৈকি এখনও কিছু কিছু তেমন কোন একটা উপলক্ষ হইলে। কলের গান হয়, বাইশকোপের গান হয়। তার জন্যও আগ-আগাম বায়না-বন্দোবস্ত লাগে, যার জন্য আসর, তারগো অবস্থা বুঝিয়াই ব্যবস্থা হয়।[৩]

---

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাশবনের কন্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪

বয়াতিদের কলের গান বা বায়োস্কোপের প্রতি আগ্রহ, বিড়ির পাশাপাশি ফিল্টার সিগারেটের প্রচলন, খাবার, প্রসাধনী ইত্যাদিতেও ছোঁয়া লেগেছে পরিবর্তনের। *জায়জঙ্গল* উপন্যাসে দেখতে পাই–

> আগে গাঁও-গ্রামে দেখছি, ঝড় কী বন্যায় একজনের বাড়িঘর উড়িয়া-ভাসিয়া গেলে, দশজনে মিলিয়া আবার তার ঘর খাড়া করিয়া দিছে। মাছ ধরতে গিয়া বাড়ি আসিয়া পাড়া-প্রতিবেশীদের বিলাইয়া দিয়া সুখ পাইছে। চাষ কামেও একজন আরেকজনের ক্ষেতে গিয়া বদলা দিছে। একজনার বাগানের ফলই হোক কী পুষ্করণীর মাছই হোক, আনন্দ উৎসব করিয়া ভাগযোগ করিয়া লইছে। সেইসব সম্পর্ক গেল কই?[১]

শত শত বছর একে অন্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, পারস্পরিক সহমর্মিতা আর নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠার বদৌলতে গ্রামের মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক অচ্ছেদ্য বন্ধন। এ যেন মহাকর্ষ শক্তির মতোই বস্তুর সঙ্গে বস্তুকে অদৃশ্য এক বাঁধনে বেঁধে রেখেছে। এই চিরায়ত বন্ধনের শিল্পিত বর্ণনা পাই কাঞ্চনগ্রাম উপন্যাসে – 'পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রামে এক এক গোষ্ঠি মানুষের মধ্যে যেমন আছে স্নেহ-ভালোবাসার টান, তেমনই সুসম্মতভাবে জীবনধারণের তাগিদ।' বৃক্ষ, নদী, সবুজ প্রান্তর, শস্যক্ষেত সব কিছু মিলিয়ে পল্লিপ্রকৃতির যে অপরূপ বিস্তার তার মধ্যে আছে এক আবহমানের ছন্দ; যুগের পর যুগ ধরে একে অন্যের সঙ্গে এক অন্তর্লীন সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতার বন্ধনে তারা আবদ্ধ। জালাল মিঞার সংবেদনশীল উপলব্ধিতে একে প্রাণস্পন্দনের মতই মনে হয় যেন এই সম্পর্ক মানুষের দৃষ্টির অগোচর এবং বোধের অতীত। 'তাল-তমাল, অশোক-কিংশুক, বাঁশ-ঝাড়-বেতবন, বীথিবন্ধ নারিকেল–সুপারি' এসবকে রূপকথার একেকটি চরিত্র বলে তার মনে হয়। প্রকৃতির এসব উপাদান 'মাটি ও বসতির' সংযুক্তি রক্ষা করছে, এরকম উপলব্ধিও তার হয়। বলা বাহুল্য, এ উপলব্ধি প্রকৃতির প্রতি নিবিড় মমত্ব এবং পল্লিপ্রকৃতির প্রতি শর্তহীন ভালবাসা থেকেই উদ্ভূত। জালাল মিঞার মতো সাদাসিধে মানুষ, যারা বংশপরম্পরায় গ্রামবাংলার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে বেড়ে উঠেছেন– তাঁরা সবাই একই ধরনের অনুভূতি দ্বারাই তাড়িত হন। তথাকথিত আধুনিকতার সংস্পর্শে এসে গ্রামের এই শ্বাশত সৌন্দর্যের ক্রমশ মলিন হয়ে যাওয়া দেখে এসব মানুষ ব্যথিত হয় প্রতিনিয়ত। এ কারণেই পরিবর্তনের অনিবার্য স্রোত যখন গ্রামের চিরায়ত জীবনাচারে আঘাত করে, তখন অন্তঃকরণে রক্তক্ষরণ হয় জালাল মিঞার মত সাধারণ মানুষের। পল্লিগ্রামের অতীতকালের সুখ ও শান্তিময়

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *জায়জঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

নিরুপদ্রব জীবনের ছবি তাঁদের মানসপটে আঁকা আছে। যেমন জালাল মিঞার স্মৃতিচারণার প্রসঙ্গে লেখকের ভাষ্য–

> এক সময় সন্ধ্যার সেই গ্রামের অত্যন্ত উজ্জ্বল ও জীবন্ত রূপ দেখিয়াছে সে। বাড়িতে বাড়িতে নানা কলরব, সান্ধ্যাহারের আয়োজন, কোনও কোনও বাড়িতে নিয়মিত সঙ্গীত চর্চা, পথে বৃদ্ধ-প্রৌঢ়, যুবক-যুবতীদের দল, কখনও কোথাও যাত্রাভিনয় কি সঙ্গীতের আসর অথবা কথকতার আসর।[১]

যন্ত্রসভ্যতার দাপটে হারিয়ে যাওয়া সেই পল্লিবাংলার স্মৃতি জালাল মিঞার মতো মানুষদের আজও উদাস করে তোলে। গ্রামের মানুষের 'অন্য সুখের তালাশে' তার সাবেকি জীবনধারাকে পরিত্যাগ করার মধ্যে যে বিপদ আছে, সে ব্যাপারে তার আফসোস হয়। তবে পরিবর্তন যে অবশ্যম্ভাবী এবং কালের নিয়মে তা যে ঘটবেই সেটিও জালাল মিঞা অস্বীকার করে না। জালাল মিঞার মনোবেদনার আরেকটি কারণ পল্লি-প্রকৃতির পরিবর্তন। এজন্য খরা-বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, মানুষের সীমাহীন লোভই দায়ী। তাদের এই লোভের বলি হয়ে চলেছে গাছ-গাছালি, ফসলি জমি, তৃণপ্রান্তর সবই। জালাল মিঞার মতো প্রকৃতিপ্রেমী সাধারণ মানুষরা অসহায় হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে এই ধ্বংসলীলা, একে ঠেকানোর জন্য কিছু করার সাধ্য তাদের হয়নি।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে আরেকটি বড় পরিবর্তন ঘটেছে দেশভাগের ধারাবাহিকতাতেও। *কাঞ্চনগ্রাম* উপন্যাসের আবদুল মাস্টারের আদিভূমি পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় এলাকায়। সাম্প্রদায়িক বিষবাস্প থেকে প্রাণরক্ষার তাগিদে সপরিবারে এই বাংলায় আশ্রয় নিতে হয়েছে তার পরিবারকে। রাঢ়বঙ্গের পল্লিপ্রকৃতি এই বাংলার প্রকৃতির মতো সুজলা সুফলা না হলেও তারও আছে এক ধরনের ঊষর সৌন্দর্য, যার জন্য এখনও প্রাণ কাঁদে আবদুল আলীর। দেশভাগের পাশাপাশি জাগতিক আরো নানা কারণে পরিবর্তন ঘটে কাঞ্চনগ্রাম তথা গ্রামীণ জনপদের। এর মধ্যে মানুষের পেশা ও ধর্মগত পরিবর্তনের কথাও উল্লেখ করেছেন লেখক। গ্রামের একটি ডোম পরিবার কীভাবে খ্রিস্টান মিশনারীদের সাহায্যে ধর্ম পরিবর্তন করে অন্যত্র আবাস গেড়েছে তার উল্লেখ যেমন আছে, তেমনি আছে ঋষিপল্লির

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *জায়জঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

জনশূন্য হওয়ার কথাও। এছাড়া পেশা-পরিবর্তনও গ্রামীণ জনপদের সাম্প্রতিক একটি ধারা। লেখকের বর্ণনায়–

> যেই গ্রামের শোলার টুপি-টোপর প্রস্তুত করিয়া সনাতন ঋষিরা দূর শহরে পর্যন্ত চালান লইয়া ছুটাছুটি করিত, বিবাহ-উৎসব এবং পালা-পার্বণের অনেক আগে হইতেই যাহাদের নিকট নানা রকমের ফরমায়েশের শেষ থাকিত না, তাহাদেরও কাজকর্মে ভাঁটা পড়িতে শুরু করিয়াছিল। সেই ভাঁটা যেন আরও প্রকটভাবে চোখে পড়িত কামার-কুমার, সুতার-মিস্ত্রীদের গাঙ্গপাড়ের বসতির দিক হইতে; উঁচা সেই পাড়কে মনে হইত যুগ-যুগান্তরের ভাঙ্গা-ঘট-পটের ধ্বংসাবশেষের উপর তাহারাও যেন খুবই কায়-ক্লেশে আপন অস্তিত্ব বাঁচাইয়া রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদের প্রাঙ্গণে আর কুম্ভকারদের সেই নিপুণ শিল্পের চক্র ঘোরে না, কামারবাড়িতে লোহা-পিতলের বাসন-কোশন গড়াইয়া পিটাইয়া বানাইবার বংশগত বিদ্যা-ব্যবসাও মন্দায় পড়িতেছিল, রেশম-গুটির বৃত্তি লইয়া জীবিকা-অর্জনের কাজকর্মও তেমন চলিতেছিল না। সেই সব ঠাঁইর অনেক দৃশ্য, অনেক সাড়া-শব্দ প্রতিদিনের জীবনের অংশ হইয়া থাকিলেও, এক সময় যেন কর্পূরের মতই উবিয়া গেল।[১]

গ্রামের নিরক্ষর, দরিদ্র কৃষক হেদায়েতুল্লাহ যেন মাটির কাছাকাছি বসবাস করা পল্লিবাংলার ঘোরপ্যাঁচহীন, সহজ-সরল মানুষগুলোরই প্রতিভূ। এ কারণে তার মুখ দিয়ে এমন সব কথা উচ্চারিত হয় যা গ্রামের মানুষের জটিলতাহীন জীবনাকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি। এসব মানুষ অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতির জটিলতা বোঝে না, দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার মধ্যেই যেন তাদের সব স্বপ্নসাধ নিহিত। এ কারণেই মকবুল খাদেম যখন গ্রামের মসজিদের জন্য একটি 'ঘন্টা দেওয়া ঘড়ি'র বন্দোবস্ত করতে বলে তখন হেদায়েতুল্লাহ বলে–

> মরিয়া যাওনের পর কী কী হইবে তা শুনাইয়া তুমি ডর লাগাইয়া দেও, কাঁদাইয়া দেও, কিন্তু এখনও যে কাঁদতে আছি দুঃখে-দুর্দশায়, সংসার কষ্টে, তার হাত হইতে রক্ষার উপায় কী? পুরান অবস্থা-ব্যবস্থায় কেবল ভোগ জোটাইবার দাস আছিলাম। কোনও গণনাই আছিল না আমাদের, তবে নোতুন ব্যবস্থাতেই-বা কী হইলাম? এক রাজ-রাজত্ব বিদায় দিয়া আবার তারগো লাহানই সব বানাইয়া তুললে আমরা তো যে আন্ধারে আছিলাম তারই মধ্যে রইয়া গেলাম![২]

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাঞ্চনগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

অনেকেই মনে করেন, গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ মানুষ নিজেদের ভালোমন্দ বোঝে না, শতাব্দীপ্রাচীন অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের অন্ধকারে তারা ডুবে আছে। অথচ গ্রামের সব মানুষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও নিজেদের ভূত-ভবিষ্যতের ব্যাপারে অসচেতন নয়। হেদায়েতুল্লাহর মত অতি সাধারণ মানুষের মধ্যেও তাই লক্ষ করি তীক্ষ্ণ সমাজচেতনা, সামষ্টিক ভালোমন্দের ব্যাপারে প্রখর সংবেদনশীলতা। শুধু তাই নয়, আমাদের অনেক পশ্চাৎপদতার মূলেই যে আছে শিক্ষার অভাব সেটিও তার সংবেদনশীল দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায় না। প্রকৃতি ও পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের উদাসীনতা তাকে পীড়া দেয়। তাই সে বলে–

> একটা পথ দেখাইলেও মানুষেই তা নষ্ট করার জন্য ব্যস্ত হইয়া ওঠে। এই তো, এক জাগায় পারাপারের জন্য একটা সুপারি গাছের সাঁকো পাতিয়াছিলাম। এখন দেখি কে তারে উলটাইয়া ফেলিয়া দিছে। কাজ নাই কম্ম নাই, কেউ ধারে কাছে দিয়া হাঁটিয়া যাইতে আছে, খামোকা দিল একটা দা-এর কোপ কাছাকাছি গাছপালাগুলার উপরে। কোনও পথের ধারের গাছপালার উপর অত্যাচারের তো আর শেষই নাই। খালে-নালায় চাঁই পাতিয়া মাছ ধরমু, কিন্তু সেই পানিতে ময়লা ভাসিয়া যাইতে দেখলে তো সকল প্রবৃত্তিই উবিয়া যায়। কতো আর বিতং দিই? আমার তো মনে হয় সকল রকম ব্যবহার-বিবেচনার জন্য বাস্তবিকই শিক্ষার উপর জোর দেওনের দরকার আছে।[১]

একইভাবে, গ্রামের কৃষকসমাজের চিরন্তন দুর্দশার কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য শহর থেকে আগত নানা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে জালাল মিঞার যে উপলব্ধি সেটিও স্মর্তব্য–

> ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া কেবলই সেই উৎপাদন বৃদ্ধির তম্বিতম্বা। 'হেন ব্যবস্থা করা হইবে, তেন ব্যবস্থা করা হইবে।' ... কিন্তু যতই হিসাব কষিয়া দেখে কোনও অবস্থাতেই যেন চাষের অথবা চাষীর মূল অবস্থাগুলির কোনও পরিবর্তন ঘটিতেছে না। শহর হইতে অনেক ডাক-ডঙ্কা বাজাইয়া নতুন-নতুন কিসিমের কর্মকর্তা ব্যক্তিরা ওয়াজ-মাহফিলের মত শান-শওকত করিয়া হরেক প্রকারের নছিহত দিয়া যায়, কৃষিদ্রব্য উপযুক্ত রকম বাজারজাতকরণের জন্যও তাহারা বিভিন্ন উদ্যোগের কথা বলে, বীজ সার প্রভৃতির বিষয়ে, এমনকি কৃষিকার্যে ঋণ জোগাইবার প্রশ্নেও কত মছলা। কিন্তু জালাল মিঞা উৎসাহিত হয় না, প্রলুব্ধ বোধ করে না, কেন না লোভ

[১] প্রাগুক্ত,পৃ. ২০০

দেখাইবার ধরনেই তাহার আপত্তি। কেবলই মনে হয় যত না চাষী-কৃষকদের সহায়তায় আগ্রহ, তারও অধিক তাহাদেরই নিজেদের কোনও গরজ।[১]

এদেশের মানুষদের মধ্যে বিরাজমান সামাজিক বৈষম্য এবং প্রান্তিক মানুষের প্রতি অন্যায়-অনাচার জালাল মিঞার সংবেদনশীল দৃষ্টিতে এভাবে ধরা পড়েছে–

এখনই তুমি আসো নামিয়া আমার সঙ্গে গাঙ্গের ধারে, দেখবা গোপাল জালিয়ার হাত হইতে মাছ চালান হইয়া যাইতে আছে মধ্যস্বত্বভোগীদের খপ্পরে। ধান, চাউল, পাট, আম, কাঁঠাল-শাকসবজি যা-ই আমরা উৎপাদন করি তার সুফল দশজনরে দিতেও কোনও আপত্তি নাই, দেশেরে দিতেও আপত্তি নাই। দেখো গিয়া, এখনও কতো কারিগর খুঁজিয়া পাইবা ঘরে ঘরে, হাটে-মাঠে, হ, এখনও আছে। কেবল ন্যায্য মূল্য না, তাদের উপযুক্ত ইজ্জতের অবস্থা-ব্যবস্থা হইলে দেশে শান্তির অভাব হইতো না। ঐ যারা এতো রাজ্য-রাষ্ট্র ভাঙ্গে-গড়ে তাদের এইটুকুও কেন খেয়াল হয় না যে–মানুষ পথের বৈদেশিরে আস্তিক করিয়া ঘরের সেরা ফল-মূল ডাব খাইতে দিছে একদিন আইজ তারাই-বা এমন হাত গুটাইয়া লইছে কেন?[২]

এসব বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, গ্রামের মানুষদের বৃহত্তর অংশই নিজেদের ভালোমন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা রাখে। কোন পথে গেলে সমাজ ও পরিবেশের সুরক্ষা হবে, আর কোথায় নিহিত আছে সামষ্টিক কল্যাণ সে ব্যাপারেও কোনো ভুল ধারণায় তাঁরা ভোগে না। তবে মুষ্টিমেয় কিছু সুবিধাবাদীর কর্মকাণ্ডের জন্যই তাদের এসব শুভ-ইচ্ছা কাঙ্ক্ষিত ফল বয়ে আনতে পারে না। আবদুল আলী মাস্টার, জালাল মিঞা, জনার্দন কর্মকার, মকবুল খাদেম বা জয়নাল শেখের নানা সংলাপ ও আত্মকথনে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত হই আমরা। কখনও কখনও নানা দার্শনিক ভাবনায় উদ্বেল হয় তাদের হৃদয়। এসব ভাবনা বইয়ের পাতা থেকে নয়, বরং জীবনাভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত। গ্রামের সাধারণ মানুষ অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত এসব ভাবনা কখনও কখনও চমকে দেয় আমাদের। যেমন, জীবন-সংসার সম্বন্ধে জনার্দন কর্মকারের উপলব্ধি–

যে যতোই বলুক, মাটির সঙ্গে সংলগ্ন হইতে গেলে যেমন চাষবাসের কার্য বুঝিতে হয়, জীবনের সঙ্গে সংসারের সঙ্গে না জড়াইয়া কোনও মোক্ষলাভও বোধ করি সম্ভব হয় না। ভাবের ভুবন ছাড়িয়া মানুষ যখন মর্ত্যে নামিয়া

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

আসে, দৈনন্দিনের কোনও ঘটনাই সে সে আর ধূলা মনে করিয়া উড়াইয়া দেয় না, তার দেহ তার চিত্তের মধ্যে সব কিছু মিশিয়া মিলিয়া একাকার হইয়া যাইতে শুরু করে, সেই সময়ই তো তার ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ লাভ হইতে শুরু করে। কোনওটাই কোনওটা হইতে বিচ্ছিন্ন না। সব মিলাইয়া জীবন, এই জীবনই আবার সংসার, এই সংসারই আবার শত দুঃখ লইয়াও বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা, তার যথার্থ আনন্দ।[১]

একইভাবে মানবজীবন ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে জালাল মিঞার ভাবনা নিম্নরূপ–

ক্ষেতে কাম করতে করতে কত্তোবার মনে কইছে জীবন দিয়াই জীবন সাজিয়া ওঠে। তুমি যেইভাবেই দেখো, কোনও কিছুই বোধ করি এক্কেবারে হারাইয়া যায় না। তা না হইলে এক্কেবারে ধূলা হইতে উড়িয়া যায় যে কণা-অণুকণা, তারই মধ্য থেকিয়া আবারও জীবজন্ম হয় কেমন করিয়া? এক এক দুপহরে যখন রৌদে জ্বলিয়া যায় সবদিক, মনে কয় কোনও দিকে কোনও সাড়াশব্দ নাই, সেইসব কালেও অনেক স্বর সুর শব্দ কি কথাই কেবল না, আরও অনেক কিছুই যেন সত্য হইয়া দেখা দেয় চৌখের সামনে, কানেও শুনি কলরব, মনে কয় যেন হাত বাড়াইলে ছুইয়াও দেওন যায়! এই সময় আমি কেবলই মাথা নাড়িয়া নিজেরে বলি হয় জাগিয়াই স্বপ্ন দেখতে আছি, না হয় বয়সই হইয়া চলছে![২]

পল্লিবাংলার কুশলী রূপকার শামসুদ্দীন আবুল কালাম গ্রামের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের নানা খুঁটিনাটি, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার, সামাজিকতা ও নানা আচার-আনুষ্ঠানিকতার জীবনঘনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন উপন্যাসটির বিভিন্ন অংশে। এ উপন্যাসে কৃষিজীবী, শিক্ষক, কর্মকার, মসজিদের খাদেম প্রভৃতি বিচিত্র পেশার মানুষের জীবনকাহিনী বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে তাদের পোশাক-আশাক, সাজসজ্জা, খাবার-দাবারসহ নানা বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন লেখক। জনার্দন কর্মকারের খাবারের প্রসঙ্গে লেখকের বর্ণনা: 'আমন চাউলের ভাত মাগুর মাছ-কাঁচা কলার তরকারী, ঢেঁড়স-করলা ভাজি সর্ষেবাটা মিশাইয়া দুই তিন রকম ভর্তা, বড়া, ডাল, কাগজীলেবু, কাঁচা- লঙ্কা।' (পৃ. ১৩০)। রাঙ্গা ঠাকুরণের তামাক তৈরির প্রক্রিয়ার বর্ণনা পাই রতনের ভাষ্যে–

রাঙ্গা ঠাকুরন তোমার বানানিয়া কাঠের উপর মিহি মিহি টুকরা করিয়া কাটে অনেকক্ষণ ধরিয়া। তারো আগে বাছাই করে সেই পাতা ক্ষেত হইতে, রৌদ্রে শুকায়, কী কী রসে না জাউয়ে ভিজায়, আবার শুকায় আবার ভিজায়, সে কায্যের যেন আর শেষ নাই। তবে সে কাটাকুটিও শেষ না। সেই পর্ব শেষ হইলে তার সঙ্গে মিশায় রসের

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮

গুড়। এ হে, সে-ও কি কম তেলেসমাতের বিষয়! রাত্তিরের-জমা খেজুর-গাছের রস না। তারও রকমফের আছে। তবে দিনের বেলায় চোঁয়া রসও বিশেষ রকম জাল দিয়া মিশান যাইতে পারে। আরও একরকম গুড় হয় নারকেল গাছের আগা হইতে।[১]

গ্রামীণ জীবনে সমসাময়িক ঘটনার প্রভাব

সমাজে বসবাসকারী কোনো মানুষই রাজনীতি-বিযুক্ত নয়। সে যেখানেই অবস্থান করুক, সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা তাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাসে পল্লিবাংলায় বসবাসরত মানুষদের জীবনে দেশ-কাল-সমাজের ঘটমান নানা ঘটনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নিভৃত পল্লিতে বাস করার কারণে রাজনৈতিক উত্থান-পতনের প্রত্যক্ষ প্রভাব এসব মানুষের জীবনে তাৎক্ষণিকভাবে না পড়লেও, সময়ের প্রবাহে একসময় ঠিকই তাদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাসে যুদ্ধ, দাঙ্গা, মন্বন্তর, দেশভাগ, মুক্তিযুদ্ধ ও তার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যস্ত পরিস্থিতির নানা অনুষঙ্গ বিধৃত হয়েছে।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সালব্যাপী সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। এটি বিশ্বের এক বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ শাসনাধীন দেশ হিসেবে বাংলা তথা ভারতবর্ষের অবস্থান ছিল মিত্রশক্তির পক্ষে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপাল) প্রায় ৮৭ হাজার সৈনিক এই যুদ্ধে নিহত হন।[২] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির প্রভাবে গ্রামবাংলার দরিদ্র জনসাধারণের জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। এ যুদ্ধের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি মেলেনি গ্রামের সাধারণ দরিদ্র মানুষদেরও –

> দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ের অর্থনৈতিক মানচিত্রই প্রথম আঘাত করতে শুরু করেছিল এই দেশকে। দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি আর মুদ্রাস্ফীতি বাংলার কৃষিপ্রধান গ্রামগুলিকে জীর্ণ থেকে জীর্ণতর করে দিতে থাকে। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে বেকার সমস্যা। যুদ্ধ শুরু হতেই ব্রিটিশ শাসক মিত্রপক্ষের সৈনিকদের জন্য যুদ্ধের রসদ মজুত করবার প্রয়োজনে সংগ্রহ ও গুদামজাত করতে থাকে খাদ্য। মজুতদারদের তৎপরতা বাড়ে, বেড়ে যায় চোরা

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

[২] Commonwealth War Graves Commission Annual Report 2013-2014. Archived 4 November 2015 at the Wayback Machine., সূত্রঃ https://issuu.com/wargravescommission/docs/cwgc_annual_report_2013-14_lr_final

কারবার। রেশনিং ব্যবস্থা চলে যায় অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতে। কন্ট্রোলের নামে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজার থেকে উধাও করে দিয়ে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করেছিল কালোবাজারী ব্যবসায়ের দল। অথচ যুদ্ধের প্রয়োজনে খাদ্যশস্য রপ্তানি সমানেই চলতে থাকে। দেশের মানুষের দুর্দশায় চোখ বুঁজে থাকে বিদেশী সরকার। সেই সঙ্গে আসে মেদেনীপুরের ঝড় (অক্টোবর ১৯৪২) এবং দামোদরের বন্যা (১৯৪৩)। এই পরিস্থিতির শীর্ষবিন্দু হয়ে ওঠে ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর। সেই করাল দুর্ভাগ্য প্রধানত গ্রাস করেছিল বাংলার দরিদ্র গ্রামবাসীদের।[১]

জীবিকার সমস্যা ও নানাবৈষম্যের কারণে সাধারণ গ্রামবাসীদের জীবন নির্বাহ করাই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাতে গ্রামের সহজ সরল দরিদ্র মানুষগুলো নৈতিকভাবেও হয়ে পড়ে দুর্বল। অভাবের তাড়নায় তাদের মাধ্যে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটে। প্রাত্যহিক জীবনধারণের চাহিদা মেটানোর তাগিদে অথবা মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই অনৈতিক নানা কাজে জড়িয়ে পড়ে অনেকে।

বাংলার ইতিহাসে মন্বন্তর একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তেতাল্লিশের মন্বন্তর সংঘটিত হয় ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যায়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে। জাপান কর্তৃক বার্মা দখল (১৯৪২) ও কলকাতায় বোমাবর্ষণের (১৯৪২) পর বার্মা থেকে ভারতে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে সেখান থেকে নিঃস্ব অবস্থায় বিপুলসংখ্যক ভারতীয় ফিরে আসেন এ-অঞ্চলে। যুদ্ধপ্রস্তুতির অংশ হিসেবে প্রচুর বিদেশী সৈন্যের আগমন এবং সরবরাহ ব্যবস্থার দুর্বলতায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অতিরিক্ত খাদ্যসামগ্রী বাংলায় আনা কঠিন হয়ে পড়ে। খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কালোবাজারিরা এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে তৎপর হয়ে ওঠে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় এবং জনজীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। কেবল বাংলা অঞ্চলেই আনুমানিক ৩৫ লক্ষ মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ, যার অভিঘাত সুদীর্ঘ সময় ধরে অনুভূত হয়। শহরাঞ্চলে রেশনিং ব্যবস্থার কারণে মন্বন্তরের প্রভাব কিছুটা প্রশমিত হলেও বাংলার গ্রামাঞ্চলে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ মানবিক সংকট। খাদ্যাভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, দীর্ঘস্থায়ী আর্থ-

[১] 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ: বাঙালির জীবন, মনন ও সাহিত্য', *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ রজতজয়ন্তী বর্ষ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১১ মার্চ ২০০০, পৃ. ১১১

সামাজিক সংকট ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ছিল এই মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ ফল। গবেষকের ভাষায়, '...অবস্থা এমন চরমে উঠেছিল যে গৃহহীন মানুষ রিক্ত অবস্থায় শহরে রওনা হয়েছে। খাদ্যের অভাবে মাতাপিতা সন্তানকে, স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে। লঙ্গরখানা, আশ্রয়স্থান, এমার্জেন্সি হাসপাতাল খোলা হলেও মানুষ অনাহারে পথে পড়ে মারা গেছে।'[১]

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের *নবান্ন* উপন্যাসে দয়াল শেখের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের গ্রামীণ জীবনের সমাজব্যবস্থার এক বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। উঠে এসেছে এক মণ চালের দাম তিন-চার টাকা থেকে এক লাফে পঞ্চাশ টাকায় উঠে গেলে সাধারণ মানুষের আর্থিক বিপর্যয়ের কথাও। যুদ্ধজনিত অরাজকতার সুযোগ নিয়ে বিবেকহীন বণিকরা কীভাবে মুফতে পয়সা কামানোর সুযোগ করে নেয় তার প্রাঞ্জল বর্ণনাও আছে *নবান্ন* উপন্যাসে। লেখকের ভাষায়–

> ক. এমন সময়ে গাঙে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো কেবল বৈদেশের ব্যাপারীদের নৌকা। কেবল গাঙে? এইসব খাল ধরে তারা উপস্থিত হতে শুরু করলো অন্দরের হাটবাজারেও। যুদ্ধের জন্য রসদ চাই, চাল চাই, ডাল চাই – সব কিছুর উপরেই হাত দিতে শুরু করলো তারা। তখন এই রূপার ঝোরের সবকিছুই রূপার টাকার মতো আরো ঝকমক করে উঠেছে। এই রূপার ঝোরের মুখে তখন কতো ডিঙ্গার ভিড়! বৈদেশের ব্যাপারীরা যেন তার কাঁড়ি কাঁড়ি বোঝাই করে নিয়ে যেতে থাকলো। গাঙের ভাঙন তো আগেই শুরু হয়েছিলো, এবার বাকিটুকুও যেন তাদের সওদাগরীর লোভে একেবারে শূন্য হয়ে গেলো।[২]

> খ. তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতে কেমন করে হাহাকার পড়ে গেল সারা দেশে। লোভে পড়ে যারা চাল ডাল বেপারীদের হাতে তুলে দিয়েছে, তারা আর টাকা দিয়েও কেনার মতো পায় না কিছু হাট বাজারে। সব জিনিসের দাম এমন চড়েছে যে প্রায় সব চাষী মজুররাই তা আর কেনার মত ক্ষমতাও সংগ্রহ করতে পারছে না। সেই আকালের সময়ও বহু লোক তাদের ভিটে বেচে অথবা বন্ধকে হারিয়ে পুত্র পরিবারসহ কোথায় যে চলে গেল তা এখন আর কারোই জানা নেই।[৩]

---

[১] ড. ভাস্বতী চক্রবর্তী (লাহিড়ী), *সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোটগল্প (১৯৪০-৫০)*, ২০০৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২১

[২] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, *নবান্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২

[৩] প্রাগুক্ত।

বিভাগোত্তর সময়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষের কথাও উঠে এসেছে এ উপন্যাসে। লেখকের ভাষায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই 'দেশে আরেক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল হিন্দু আর মুসলমানের যুদ্ধ।' এই যুদ্ধে মানুষ আরো অসহায় হয়ে পড়লো। বিশ্বাস এবং ধর্মীয় রীতিনীতিতে পার্থক্য থাকলেও এতদিন জীবিকা নির্বাহের সূত্রে এক ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেই সম্পর্কেও ফাটল ধরাল। আর পরিণামে সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হয় এবং কাউকে কাউকে দেশ, ভিটেমাটি ছাড়াও হতে দেখা যায়। নিম্নবর্গের হিন্দু কাঠমিস্ত্রি বিজয়রত্ন নায়েব মশাইয়ের বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে অস্পৃশ্য বিবেচিত হলে কাজ ফেলে চলে আসে এবং এতে নায়েবের সঙ্গে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে এ ঘটনার জের ধরে বিজয়রত্নের পরিবারকে হেনস্থা করার উদ্দেশ্যে বিজয়রত্নের কন্যা পুণ্যশশীকে অপহরণ করে জোর করে বিয়ে দেয়া হয় গগন শেখের পুত্র দয়াল শেখের সঙ্গে। এখানেই শেষ নয়, ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে একদিন ঘরছাড়া হয় বিজয়রত্ন ও তার পুত্র কর্মরত্ন। লেখকের ভাষ্যে, 'হিন্দু-মুসলমানের বিবদমান সময়ে ঘরের বাইরের দাওয়ায় বাড়ির গাভীর মাথাটা ঝুলতে দেখে কর্মরত্ন একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে দেশ ছেড়ে কোথায় চলে গেল।' (পৃ. ২২)

বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবজনক অধ্যায় হলো ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, যার মাধ্যমে বাঙালির সুদীর্ঘকালের আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম চরম পরিণতি লাভ করে। বাংলার মাটি ও মানুষের বিশ্বস্ত কথাকার শামসুদ্দীন আবুল কালামের *কাঞ্চনগ্রাম* উপন্যাসে বাংলার মুক্তিসংগ্রামের কাহিনি নিপুণভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। উপন্যাসের ঘটনা বর্ণনায় নানাভাবে, নানা আঙ্গিকে উঠে এসেছে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের বিচ্ছিন্ন চিত্র। ঔপনিবেশিক পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণ, সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ ও বঞ্চনার অনুভূতি, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা – এসবেরই এক অনুপুঙ্খ চিত্র ফুটে উঠেছে উপন্যাসটিতে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি উত্থাপনের পর বাঙালির 'অধিকার আন্দোলন' ধীরে ধীরে 'স্বাধিকার আন্দোলনে' রূপ নেয়। কালক্রমে আগরতলা মামলা, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করতে পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি সাধারণ মানুষের জীবনেও প্রভাব ফেলেছিল। বছরের পর বছর বৈষম্যের শিকার হতে হতে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে ইস্পাতকঠিন ঐক্য, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য নেতৃত্বে তারা স্বাধীনতার

দাবিতে গর্জে উঠেছে। কাঞ্চনগ্রামের মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। তাদের ভাবনাপরম্পরায়, আলাপচারিতায় স্বাধীনতা সংগ্রামের এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়াটি নানাভাবে ছায়াপাত করেছে। যেমন, জালাল মিঞার সঙ্গে আলাপচারিতায় আবদুল আলী মাস্টারের উক্তি–

> কোনও ন্যায়-ন্যায্যকে চিরকাল দাবায়া রাখন যায় না। মনে কয় রাজ্যের মানুষ মাথা ঝাঁকা দিয়া নিজের হক দাবির জন্য খাড়া হইছে। এখনও কোনও হুমকির কাছে নতি স্বীকারের অর্থই হইল আবারও চিরকালের দাসত্বকে মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া যাওয়া। দেশের মানুষ আর তার জন্য রাজি না, তাই আপোষ-সমঝোতা যেইখানে ব্যর্থ হইয়া যায়, সেইখানে মুখোমুখি সংঘর্ষ আর বোধ করি এড়াইয়া যাওন চলে না।[১]

১৯৭১-এর ৭ মার্চের ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য গোটা জাতিকে প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু। মকবুল খাদেমের ভাষ্যে উঠে আসে এ প্রসঙ্গ: 'শোনলাম যে শেখ মজিবুর রহমান সাহেব ডাক দিছে ঘরে ঘরে দুর্গ তৈয়ার করিয়া তুলতে। যার হাতে যা কিছু আছে তা লইয়া তৈয়ার হইতে।' (পৃ. ২৬৪)

পঁচিশে মার্চের কালরাত্রিতে ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে রক্তলোলুপ পাকিস্তানি সেনারা পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পর যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে দেশের প্রতিটি ইঞ্চিতে। ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে যায় জাতি, আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ মৃত্যুনগরী ঢাকা ছেড়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নিভৃত গ্রামগুলো তখন হয়ে পড়ে শহরছাড়া মানুষের বড় আশ্রয়। কাঞ্চনগ্রামেও একইভাবে ভিড় জমায় শহর ছেড়ে আসা মানুষেরা। তাদের কেউ গ্রামেই আশ্রয় নেয়, আর কেউ বা চলে যায় খেয়াঘাট পেরিয়ে অন্য কোনো আশ্রয়ের খোঁজে। পলায়নপর এসব মানুষের বর্ণনা পাই উপন্যাসের একটি অংশে–

> সড়কের উপর দিয়া তখন বাস্তবিকই অজস্র লোকের ঢল নামিয়া আসিতেছিল পিছনের গাছ-গাছালি ঘেরা দেশাভ্যন্তরের মধ্য হইতে। বাল-কিশোর, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী। সকলেই ত্রস্তপদে খেয়াঘাটের দিকে, না হয় যে-যেইখানে কোনও বাহন সংগ্রহ করিতে পারিতেছিল তাহাতে উঠিয়া দিকবিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। কাহারও মুখে বিশেষ কথা নাই, কোনও একটা নিদারুণ আতঙ্কে তাহারা আর অতি সহজ কথাবার্তার প্রতিও মনোযোগ দিতে পারিতেছিল না।[২]

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *কাঞ্চনগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনামত দ্রুতই 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলায়' ব্যস্ত হয়ে পড়ল আপামর জনসাধারণ। কাঞ্চনগ্রামের স্বাধীনতাকামী মানুষকে সংগঠিত করার কাজে নেমে পড়ে আবদুল আলী মাস্টার ও তার বন্ধুরা। আবদুল আলী মাস্টারের বাড়িতে খালেদ, তারেক, সেন্টুসহ মুক্তিযোদ্ধাদের জরুরি বৈঠক হয়। সহযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করার জন্য খালেদ বলে–

> এই দেশের সাধারণ মানুষ তাদের অতি সাধারণ মূল্যবোধ লইয়া এক অভিনব ইতিহাস সৃষ্টি করবে। সাধারণের হইলেও তা হবে অসাধারণ, শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে অভূতপূর্ব, কেননা উপর-নিচের এমন ঐতিহাসিক সুযোগ ইতিহাসে সম্ভবত আর কখনো ঘটে নাই।[১]

পাকিস্তানি বাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মুখোমুখি সংঘর্ষের এক পর্যায়ে জয়নাল শেখের ভাই তোফাজ্জলের মৃত্যুর পর কাঞ্চনগ্রামের প্রতিরোধযুদ্ধ নতুন মাত্রা পায়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে পিছু হটে যায় হানাদারেরা। পাকিস্তানি বাহিনীর সহচর স্বাধীনতাবিরোধী জয়নাল শেখ পাকিস্তানি সৈন্যদের ফিরে আসার জন্য কাকুতি মিনতি করে, তবে প্রাথমিক এই সংঘর্ষে মুক্তিযোদ্ধাদেরই বিজয় হয়। পাকিস্তানি সৈন্য ও স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকারদের প্রতিশোধমূলক হামলার হুমকির মধ্যেই আবার জমায়েত হতে শুরু করে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ গ্রামবাসীরা। আসন্ন বিপদকে উপেক্ষা করেই এক ধরনের ইস্পাতকঠিন সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ হয় তারা। এমনই এক পরিস্থিতিতে, নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে মসজিদে সমবেত কাঞ্চনগ্রামের অধিবাসীদের একতার বিষয়টি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক –

> ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন দেহাতি মানুষ আসিয়াছিল সেই মসজিদ প্রাঙ্গণে; দিনরাত ক্ষেতে-মাঠে-গাঙ্গে খাটিয়া-খাওয়া মানুষ, যাহাদের মুখে কখনও কোনও বিশেষ উচ্চবাচ্য নাই কিন্তু সেই দেশের উপর যখনই কোনও বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে তাহারা যেন চতুর্দিকের মাটি এবং বনজঙ্গলের মধ্য হইতেই উদ্ভূদ হইয়াছে। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় যখন উড়িয়া গিয়াছে ঘরের চাল, সেইরকম মানুষেরাই একজনের প্রয়োজনে দশজন হইয়া আবারও সেই ঘর খাড়া করিয়া দিয়াছে; যদি কখনও কোথাও আগুন লাগিয়াছে তবে তাহারাই জীবন তুচ্ছ করিয়া নিভাইতে আগাইয়া গিয়াছে, কারাও বাড়িতে পুকুর ভাঙ্গা হইলে তাহারাও শ্রম দিতে কার্পণ্য করে নাই, ফসল উঠাইবার কাজেও বদলা দেওয়ার জন্যও যেন কোনও দৈবাশীর্বাদের মত তাহাদেরও মিলিয়া যাইত।[২]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৪-৫৭৫

উপন্যাসের শেষাংশে প্রবল পরাক্রান্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে লিপ্ত হয় খালেদের নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধারা। শত্রুর জন্য অস্ত্র হাতে অপেক্ষমান সেন্টুর বক্তব্যে যেন গোটা দেশের মুক্তিকামী মানুষের প্রাণের আর্তিই ফুটে ওঠে–

> আমিও কেউরে কোনওদিন হত্যা করার কথা কল্পনা করি নাই। এখন বুঝতে পারছি, জোর করিয়াই কেউ এই বাধ্যবাধকতার মধ্যে ঠেলিয়া দিছে। আমার দেশের মাটি, আমার মা-বুইনের ইজ্জত রক্ষার জন্য প্রাণ দিতেও আর আমার একটুও ডর নাই।[১]

সেন্টুর এ উক্তি মূলত আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌলচেতনার ইঙ্গিতবাহী। এ সংগ্রাম ছিল তার অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামও। আর অস্তিত্বরক্ষার এই চেতনা শ্রেণী-ধর্ম নির্বিশেষে সকল বাঙালিকে একাত্ম করে তুলেছিল। কুশলী কথাসাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'কাঞ্চনগ্রাম' উপন্যাসে সেই চিত্র এঁকেছেন তাঁর সংবেদনশীল কলমে।

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮১

চতুর্থ অধ্যায়

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে প্রতিফলিত গ্রামীণ জীবন

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ছোটগল্পও গ্রামীণ জীবন ও পট-পরিবেশের বাস্তব উপস্থাপনায় সমৃদ্ধ। উপন্যাসে যেমন, ঠিক তেমনি ছোটগল্পেও গ্রামীণ জীবনানুষঙ্গ বিশ্বস্ত অবয়বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। পল্লির ক্রমরূপান্তরশীল আর্থ-সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত এবং সাংস্কৃতিক বাতাবরণও তাঁর অন্তর্ভেদী পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে। বস্তুত পল্লিজীবনের বিচিত্র চিত্র ও চরিত্রকে শিল্পের রসে জারিত করে তিনি এমন নৈপুণ্যে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন, যাতে তাঁর ছোটগল্পগুলো হয়ে উঠেছে সমাজবাস্তবতার বিশ্বস্ত দলিল।

প্রকৃতি ও জীবন

একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী ব্যক্তির মানসিক গঠন ও আচরণে সে অঞ্চলের প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাব ব্যাপক। পরিবেশ থেকে উপকরণ আহরণ করেই মানুষ ক্রমশ বেড়ে ওঠে। এভাবে একদিকে সে যেমন তার পরিপার্শ্বকে প্রভাবিত করে, তেমনি তার পরিবেশ-পরিপার্শ্বও তার ওপর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব ফেলে। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতোই বাংলাদেশের মানুষের মানসগঠন এদেশের ভূ-প্রকৃতি দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত। পাহাড়, জঙ্গল, নদী ও সমুদ্রবেষ্টিত 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ এই বাংলা। মনোরম উদার মাঠ, সবুজ প্রান্তর, বহু বিচিত্র ফুল ফল লতাপাতায় সমৃদ্ধ এই দেশ। অসংখ্য নদী ও জলপথ, আকাশে মেঘের মেলা, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত-প্লাবন সবকিছু মিলিয়ে প্রকৃতি বাংলাকে করেছে এক অপূর্ব সৌন্দর্য ভাণ্ডার।'[১] বাংলার উদার শ্যামল প্রান্তর, নদী-খাল-বিল, শস্যক্ষেত্র, বৃক্ষরাজি এ সবই বাংলার মানুষের জীবনকে সাজিয়ে তুলেছে। এদেশের মানুষ প্রকৃতি-মাতার অবদানে যেমন ধন্য, তেমনি

[১] এম. এ. রহিম, '*বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*', দ্বিতীয় খণ্ড, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি (অনু.), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৫

কখনো কখনো বিরূপ প্রকৃতির ভয়াল থাবায় বিপর্যস্ত। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের গল্পের কাহিনি-কাঠামোয়ও প্রকৃতির উপস্থিতি বিচিত্র ও ব্যাপক।

তাঁর গল্পে পল্লিবাংলার সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি, উদার প্রান্তর, নদী-খালবিল-জলাশয় – এসবই বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। তাঁর অনেক গল্পেই সমুদ্র থেকে জেগে ওঠা দ্বীপে বসতিস্থাপনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। একদল অকুতোভয় মানুষ কীভাবে জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশে বিরূপ প্রকৃতির সাথে কঠোর সংগ্রাম করে টিকে থাকে তারই জীবনঘনিষ্ঠ বর্ণনা তুলে ধরেছেন তিনি। 'সরজমিন' (*পথ জানা নাই*) গল্পে এ অঞ্চলের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে লেখক বলেছেন–

> বাংলাদেশের সুদূর দক্ষিণের এক অংশ এ। সমুদ্রগর্ভ থেকে এর উদ্ভব। তার আগে তাথৈ তাথৈ পানি নাচত এখানে – আজকের এই বন্যার পানির চেয়েও ভীষণ। একদিন সেখানে চর জাগল। সেই চর ধীরে ধীরে এসে মিলিত হল এধারের ভূখণ্ডে। প্রকৃতির এ দান মানুষ কাজে লাগাল। তার নরম বুকে একদিন ফসলের সোনার শীষ মাথা দুলিয়ে নেচে উঠল – অকৃপণ চিত্তে সে ছাড়লো তার পীযূষধারা।[১]

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে প্রতিফলিত গ্রামীণ জীবন গ্রামীণ প্রকৃতিরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। গ্রামের দিগন্তবিস্তৃত ধানক্ষেত, নলখাগড়ার বন, কচুরিপানায় ভরা ঝিল – এসবের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। 'লালবাত্তি' (*পুঁই ডালিমের কাব্য*) গল্পে বাংলাদেশের এক নিভৃত গ্রামের চিত্র লেখক অঙ্কন করেছেন এভাবে–

> চতুর্দিকে খোলামেলা মাঠ, ধানপাটের ক্ষেত। একধারে নল-খাগড়া, কাশবন কচুরিপানায় ভরা একটা ঝিল। কয়েকটা খাল তার মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে এদিক-সেদিক মিলিয়ে গেছে। মাঝেমধ্যে সামান্য গাছপালা ঘেরা কয়েকটা উঁচু উঁচু বসতি। কোথাও বাঁশের আড়ার ওপর মেলে দেওয়া কাঁথা, কোথাও বা ঝি-বৌদের মেলে দেয়া নীল শাড়ি। কয়েকটা হাঁস চরছে একটা পুকুরে। এক চাষী বীজ বুনছে এক ক্ষেতে। এদিক-সেদিক ছিটিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে কয়েকটা গরুও। এক বাড়িয়ালের গাছের ডালে একটা ঘুঘু ডেকে ডেকে ভরে রেখেছিল চতুর্দিক।[২]

[১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, 'সরজমিন', *পথ জানা নাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০
[২] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, 'লালবাত্তি', *পুঁই ডালিমের কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

নদী-নালা-খাল-বিল-সমুদ্রের তীরে গড়ে ওঠা গ্রামগুলো সবুজ বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। এসব গ্রামে প্রকৃতি রঙে-রসে অপরূপ। ঋতুচক্রের আবর্তনে এই প্রকৃতি হয়ে ওঠে আরও বৈচিত্র্যময়। প্রকৃতির রূপের সঙ্গে গ্রামের মানুষদের জীবনও সাজে বিভিন্ন সাজে। বাংলার বিচিত্র-সুন্দর প্রকৃতি তার সৌন্দর্য ও সৌকর্য নিয়ে যুগে যুগে সমৃদ্ধ করেছে এদেশের মানুষের জীবন ও মননকে। শামসুদ্দীন আবুল কালামের গল্পগুলোতে পল্লিপ্রকৃতির এই রূপবদলের প্রসঙ্গ বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। গ্রীষ্মের খরতাপ, বর্ষায় বৃষ্টির ছন্দ, শরতের শান্ত-স্নিগ্ধ নদীতীর, হেমন্তে ধানকাটার উৎসব, শীতের হিম কুয়াশা কিংবা বসন্তের পুষ্পশোভিত দৃশ্যপট – সবকিছুই লেখক তুলে ধরেছেন নানা গল্পে। কর্মকোলাহলময় দিন আর জোনাক-জ্বলা, ঝিঁঝিঁ-ডাকা রাতের সৌন্দর্য সবকিছুই গল্পগুলোকে করে তুলেছে নান্দনিক আমেজে অপরূপ।

পল্লিবাংলা অপরূপ রূপে সজ্জিত হয় শীতের সকালে। সারারাত ধরে প্রকৃতির বুকে জমা শিশিরবিন্দু আর ঘন চাদরের মতো কুয়াশা গ্রামের পরিবেশকে করে তোলে মোহনীয়। শীতের এই অপরূপ সৌন্দর্যে স্নাত হয়ে জীবনের এক অপার্থিব আনন্দকে যেন উপলব্ধি করেন পল্লিবাংলার মানুষেরা। শীত-সকালের এই মিষ্টিমধুর অনুভূতির স্মৃতি ভেসে উঠে 'পৌষস্বপ্ন' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পের মকুর স্মৃতিচারণায়–

> রোজ সকালের বিচিত্র মধুর শীতে গায়ে আঁচল জড়াইয়া রোদ পোহানো, দল বাঁধিয়া ধানময় ক্ষেতে ক্ষেতে ছুটাছুটি তারপর বেলা পড়িয়া আসিলে রোদমাখা পুকুর পাড়ে বসিয়া খেজুর রসের 'সিন্নি' খাওয়া – সব মিলিয়া কী মধুর স্বচ্ছন্দ দিনগুলি।[১]

সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর পল্লির বিকেল আসে স্নিগ্ধ প্রশান্তি নিয়ে। এক ধরনের অলস সৌন্দর্য ভর করে প্রকৃতি আর মানুষের মধ্যে। কর্মক্লান্ত মানুষ আর প্রকৃতি মিলেমিশে গ্রামের বিকেলগুলোকে করে তোলে উপভোগ্য। 'কেরায়া নায়ের মাঝি' (*শাহেরবানু*) গল্পে পড়ন্ত বিকেলের যে প্রাণবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে মনে হয় গ্রামের মানুষের জীবন আর পল্লিপ্রকৃতি যেন একইসূত্রে গাঁথা –

> খাওয়া দাওয়া মোছা সারা হতেই বিকেল প্রায় শূন্য হয়ে আসে। দূরের অথৈ বিলের জল তীক্ষ্ণভাবে ঝলমলায়; কাঁঠাল-আম গাছের আড়ালে ঢাকা সূর্য পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদ-ছায়ার চঞ্চলতা রচনা করে বিস্তৃত উঠানে। গাছে

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, 'পৌষস্বপ্ন', *অনেক দিনের আশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

গাছে পাখি-পাখালির হিসাবনিকাশ, নীল আকাশের গায়ে সারবাঁধা বকের অভিযান আর গাঙ শালিখের ক্বচিৎ সরবতা যেন কলরব করে জানায় সন্ধ্যার আগমনী।[১]

পল্লির রাতও আপন সৌন্দর্যে ভাস্বর। আকাশে মেঘের সঙ্গে চাঁদের লুকোচুরি খেলা, ঝোপঝাড়ে জোনাকির ঝিকিমিকি, নদীর বুকে জলস্রোতের একটানা তিরতির শব্দ এক অপার্থিব সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে তোলে। 'কেরায়া নায়ের মাঝি' (*শাহেরবানু*) গল্পে জমিলার বিরহকাতর চিত্তে গ্রামীণ মধ্যরাত্রির যে চিত্র ফুটে ওঠে তাতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নিসর্গ-প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য–

রাত বাড়ে, ক্ষীণ একটু চাঁদ আকাশের ওপাশ থেকে যাত্রা শুরু করে। বিলের বুক থেকে একটা ঘুম-পাড়ানো হাওয়া অনেক পাতা ঝরার শব্দ তুলে বাড়ির ওপর দিয়ে বয়ে যায় ... দূর বিলের ওধারের জঙ্গলে কতোগুলি নিশাচর পাখি ডাকে, সারা বাতাস অবাধে তাদের কলরব ছড়ায়। সালেহাদের বাড়ির বাদাম গাছে অজস্র বাদুড় ডানা ঝাপটায়। আশেপাশে কোথাও ডাকে ডাহুক। কেমন একটা ব্যাকুল শূন্যতায় জমিলা অস্থির হয়ে ওঠে। বিলের ওপারের জঙ্গলে একপাল শেয়াল ডেকে ওঠে; সরসর করে কী একটা চলে যায় নিচে কেয়াবনের ঝোপে, গা ছমছম করে ওঠে জমিলার।[২]

ঋতুচক্রের ঘূর্ণনের সঙ্গে এদেশের পল্লিপ্রকৃতি যে বৈচিত্র্যময় রূপ ধারণ করে তার প্রাঞ্জল বর্ণনা লেখকের গল্পগুলোতে যুক্ত করেছে ভিন্নমাত্রিক আবহ। ষড়ঋতুর আবর্তনে এদেশের পল্লিপ্রকৃতি বৈচিত্র্যময় ঐশ্বর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। প্রকৃতির এই বিচিত্র রূপ পল্লিবাসীর জীবনে অবিরত প্রভাব ফেলে, তার মনন ও জীবনযাত্রায় সৃষ্টি করে বিচিত্র অভিঘাত। শামসুদ্দীন আবুল কালামের গল্পে বাংলার সাংবাৎসরিক এই বৈচিত্র্য আশ্চর্য মহিমায় মূর্ত। 'মজা গাঙের গান' (*মজা গাঙের গান*) গল্পে গ্রীষ্মের খরতাপে চৌচির ধানক্ষেত, মন-কেমন-করা ঘুঘুর ডাক, আর রৌদ্রের খরতাপে 'উনুনের শূন্য আর তেতে ওঠা পাত্রের মত কম্পমান জগত' – এসব টুকরো টুকরো দৃশ্যের কোলাজ গ্রীষ্মের বিরূপ প্রকৃতিকে মূর্ত করে তোলে পাঠকের সামনে –

বাইরে চৈত্রের রৌদ্র তখন দুনিয়া নিঝুম। কাকপাখীগুলোও গিয়ে লুকিয়েছে ছায়াভরা নিভৃতে। উঠানের বাইরে ভাঙাচোরা কলাগাছের ঝোপের আড়ালে বিস্তৃত ধানের মাঠও ফেটে চৌচির। কান পাতলে কোন দূর-দূরান্ত থেকে

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, 'কেরায়া নায়ের মাঝি', *শাহেরবানু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

ভেসে আসা একটা ঘুঘুর ডাক ছাড়া চতুর্দিকে আর কোন স্বর ছিলো না, শব্দ ছিলো না। উনুনের একটা শূন্য আর তেঁতে ওঠা পাত্রের মতোই সে জগতটা কাঁপছিলো।[১]

গ্রামবাংলার অবারিত সৌন্দর্য যে ঋতুতে মূর্ত হয়ে ওঠে তার নাম বর্ষা। দিনভর বৃষ্টির গানে, আকাশ কালো-করা মেঘের পদচারণায় কিংবা ঝড়ো হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দে নতুন এক রূপে সজ্জিত হয় বাংলার গ্রামগুলো। লেখক এই বর্ষাসিক্ত বাংলার অপরূপ চিত্রও অঙ্কন করেছেন শামসুদ্দীন আবুল কালাম। তাঁর গল্পে বর্ষার প্রমত্ত রূপের বদলে এক মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। 'নবমেঘভার' (*দুই হৃদয়ের তীর*) গল্পে মাজু মিঞার স্মৃতিচারণে বর্ষণমুখর পল্লিপ্রকৃতির ভিন্নধর্মী এক চিত্র পাওয়া যায়। জীবন-সংগ্রামে পরাস্ত মাজু মিঞার বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ের সঙ্গে বর্ষার মেঘভার যেন একাকার হয়ে ধরা দিয়েছে এ গল্পে। তাইতো বর্ষণমুখর একটি দিনে মাজু মিঞা বারবার ফিরে যান শৈশবে। পানিতে ভেসে যাওয়া প্রান্তরে নাক উঁচু করে ব্যাঙের একটানা ডেকে যাওয়া কিংবা 'পানির মুকুরে নিজের ছায়া দেখা তৃণলতার' উল্লেখ – এ সবই গল্পকারের পর্যবেক্ষণ-দক্ষতার পরিচায়ক। আবার বর্ষাপ্রকৃতির বিষণ্নতার সঙ্গে স্মৃতিভারাতুর মানবমনের অপরূপ সংযোগ সৃষ্টিতেও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন গল্পকার। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি–

> ... মনে পড়িলো, উঠানে পানি সরাইবার জন্য তাহার চাচা নালা কাটিয়া দিতেন আর সেই সকালের 'চাঁই'তে পাওয়া চিংড়িমাছ আনিয়া তাহার একপ্রান্তে ছাড়িয়া অন্যপ্রান্তে ধরিয়া মৎস্য শিকারের দুর্লভ আনন্দ পাইতো তাহার কাহিনী; পানিতে ভেজা মাটি, সতেজ সবুজ ঘাস, আর ঐ নোতুন পানি পায়ে হাতে, সারা দেহে মাখিয়া যে নোতুন জীবনী জাগিতো, তাহা যেন ততোধিক ভালো লাগা লইয়া আজ সকালে মাজু মাস্টারের জীবনে ফিরিয়া আসিলো।[২]

বর্ষণমুখর দিনে অলস সময় পার করতে হয় গ্রামের মানুষদের। কর্মহীন সময়গুলো পার করার জন্য নানারকম বিনোদনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে গ্রামের মানুষ। শামসুদ্দীন আবুল কালামের গল্পগুলো যে সময়পটে লেখা, সে সময়ে বর্ষার কর্মহীন সময়গুলো পুঁথিপাঠের আসর জমিয়ে পার করতো গ্রামের মানুষ। জল-কাদা ভেঙে কীভাবে পাড়া-পড়শি পুঁথিপাঠ শোনার জন্য ভিড় জমাতো, 'নবমেঘভার' *(দুই হৃদয়ের তীর)* গল্পে তারও অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন গল্পকার।

---

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, 'মজা গাঙের গান', *মজা গাঙের গান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬

[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, 'নবমেঘভার', *দুই হৃদয়ের তীর*, কোহিনুর লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৫, পৃ. ৯

'শীতের পূর্বসূরি হেমন্ত হচ্ছে পাকা ধানের ঋতু। মাঠে মাঠে ফসল তোলার ধুম পড়ে যায়। সায়ংকালে সূর্যের রক্তিম আভা নদীর শান্ত জলে পড়ে ঝিকমিক করে। প্রভাতে আসন্ন শীতের ধূসর কুয়াশার হালকা আস্তরণ পড়ে, মধুর শীতল বাতাস অঙ্গজুড়ে হিল্লোলিত হয়।'[১] সোনালি ধানের আহ্বানে আবর্তিত হয় কৃষকের ভাবনা। নতুন ধান কেবল কৃষকের ক্ষুধাই মেটায় না, তার ভবিষ্যৎকে স্বপ্নময় ও রঙিন করে তোলে। 'পৌষ' (*শাহেরবানু*) গল্পে কার্তিকের শুরু থেকে ধানের সবুজ চারার মধ্যে আগামীর স্বপ্নরঙিন ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করে দরিদ্র কৃষক তাজুর যে আনন্দ তা অসাধারণ ভঙ্গিমায় ভাষারূপ দিয়েছেন গল্পকার–'কার্তিক হইতে তাজু তাহার সর্বাপেক্ষা আগে বোনা জমিখানার আশে পাশে ঘুরিয়া সবুজ চারাকে রঙ বদলাইয়া কুঁড়িময় হইয়া উঠিতে দেখিয়াছে; কখনো বা আলগোছে দুই একটি ধান ছিঁড়িয়া পাকিল কিনা পরীক্ষা করিয়াছে; পাশে বসিয়া কল্পনায় বুনিয়াছে মন্বন্তরোত্তর জীবনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নজাল।' অবশেষে কৃষকের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ধান পাকে এবং সেই নতুন ধান ঘরে তোলা, মাড়াই, সিদ্ধ করা প্রভৃতি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ জীবনে কর্মচঞ্চল ও উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে। লেখকের বর্ণনায় হেমন্তকালের গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতির অপরূপ চিত্র প্রতীকায়িত হয়েছে–

> প্রকাণ্ড তিনমুখী উনুনে খেজুর রস আর ধানের হাঁড়ির একঘেয়ে শন শন শব্দ। তাহার এবং বেড়ার ওধার হইতে ভাসিয়া আসা কাঁঠাল কুঁড়ির গন্ধ গভীর কালো রাত্রির মধ্যে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি করিয়াছে! আকাশে ছোট একফালি চাঁদ। সারা গাঁ নিঝুম; কেবল দূরে মল্লিক বাড়ির দিক হইতে কালু বয়াতির কণ্ঠ শোনা যাইতেছে–হয়তো ধানমাড়াইকে উপলক্ষ্য করিয়া উহাদের উঠানে জারীগানের আসর জমিয়া উঠিয়াছে।[২]

হেমন্তের শেষে কুয়াশার চাদর গায়ে জড়িয়ে হিমশীতল অনুভূতি ছড়িয়ে শীতের আগমন ঘটে। পল্লিবাংলায় শীতের আমেজই আলাদা। শীতকালে গ্রামের প্রতি ঘর নবান্ন উৎসবে রঙিন হয়ে ওঠে। নতুন ধানের তৈরি পিঠে পুলি এবং খেজুর রসের পায়েস (সিন্নি) খাওয়ার ধুম পড়ে যায় ঘরে ঘরে। 'ভাঙন' (*শাহেরবানু*) গল্পে দেখা যায়, একটু ভিন্ন উপায়ে হলেও খেজুর রসের সিন্নি খাওয়ার আনন্দ থেকে বাদ যাচ্ছেনা গ্রামের দরিদ্র পরিবারগুলোও। এ গল্পের আনোয়ার কর্তৃক চুরি করে আনা খেজুরের রস, নারিকেল দিয়ে 'সিন্নি' রাঁধা

[১] আজহার ইসলাম, *চিরায়ত সাহিত্য ভাবনা*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৯ পৃ. ১২৭
[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, 'পৌষ', *শাহেরবানু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

এবং মধ্যরাতে পরিবারের সদস্যদের 'শীতে গুটিসুটি দিয়ে উনুন ঘিরে চাপাস্বরে গল্প, তারপর কাড়াকাড়ি ভাগাভাগি করে খাওয়া'র মধ্যেও গ্রামীণ জীবনে এ ঋতুর আবেদন প্রস্ফুটিত হয়।

গ্রামীণ নর-নারীর জীবনের এক উপভোগ্য সময় শৈশব। কারণ তারা গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতিকে উপভোগের সুযোগটি পায় এ সময়। তাদের শৈশবের চিত্র দেখলে মনে হয় জীবন কত সুন্দর, আনন্দময়, নির্ভেজাল। 'পৌষস্বপ্ন' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পের নারী চরিত্র 'মকু'র স্মৃতিতে ফুটে উঠে গ্রামীণ জীবনের আরেক দিক। লেখকের ভাষায়–

> শৈশবে এ ধান কুড়ানো উপলক্ষ করিয়া কতো প্রতিযোগিতা! খুব ভোরে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ের দল জোট বাঁধিয়া মাঠে মাঠে নামিয়া পড়িত। সপ্তাহ শেষে সেই সযত্ন সঞ্চয় হাটে বিক্রয় করিতে পাঠাইয়া সন্ধ্যার চুলাশালে উনুন ঘিরিয়া বসিয়া হাটুরেদের প্রতীক্ষা করিত। রাত্রি ঘনতর হইয়া আসিত উনুনের খেজুর রস ঘন হইবার সংগে সংগে হয়তো হাটুরেরা অনেক রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া দেখিত তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; তাহাদের সাদর ডাকাডাকিতে ঘুম কোথায় টুটিয়া যাইত। ফরমাস মতো চিরুণী, আয়না, আলতা, বালাল ডুরে শাড়ি লইয়া আনন্দ কলরবের অন্ত থাকিত না![১]

প্রকৃতিনির্ভরতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

গ্রামের মানুষ প্রকৃতিনির্ভর। এ প্রকৃতি কখনও উদার হস্তে তাদের আনুকূল্য দান করে, আবার কখনও বিপর্যস্ত ও সর্বস্বান্ত করে। বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোর অন্যতম। এদেশের পল্লি অঞ্চল, বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের বিপুল মানুষ প্রতিনিয়ত দুর্যোগের আশঙ্কার মধ্যে বাস করে। এসব দুর্যোগের মধ্যে বন্যা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, খরা, অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প, ভূমিধস, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি প্রধান। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করে এবং এই কৃষিকাজের ক্ষেত্রেও তারা অনেকটা প্রকৃতিনির্ভর। তাই প্রকৃতি যদি একটু বিরূপ হয় অর্থাৎ ঝড়, বৃষ্টি বা বন্যার প্রকোপে যদি তাদের ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন সৃষ্টিকর্তার কাছে ফরিয়াদ জানানো ছাড়া তাদের আর কোনো গতি থাকে না। 'বন্যা' (*পথ জানা নাই*) গল্পে গ্রামের অসহায় মানুষের নিয়তিনির্ভরতা প্রতিফলিত হয়েছে। মৌসুমী ঝড়ের 'দুরন্ত দমকা বাতাসে ঘরের বেড়া-চাল পর্যন্ত যখন কাঁপিয়া ওঠে তখন চাষীরা আকাশের দিকে হাত

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, 'পৌষস্বপ্ন', *অনেক দিনের আশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

তুলিয়া আরো জোরে আল্লা, আল্লা বলিয়া ফুকারিয়া ওঠে।'[১] এমতাবস্থায় সৃষ্টিকর্তার ওপর অগাধ বিশ্বাসে মোনাজাতের পর মুখে হাত বুলিয়ে যেন তারা স্পষ্ট দেখতে পায় 'পানি নামিয়া গিয়াছে, ঝড় শান্ত হইয়া মেঘদলভার হটাইয়া লইয়া গিয়াছে।'[২]

নদীতীরবর্তী মানুষদের জীবন-জীবিকার প্রধান অবলম্বন নদী। বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টি ও ঝড়ঝাপ্টার কারণে অনেক সময় নদীতে নৌকাচালনা কিংবা মাছ ধরতে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এসময় নদীনির্ভর মানুষগুলো অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে এবং সুদিনের জন্য অধীর আগ্রহে প্রহর গুনতে থাকে। 'মদনমাঝির গেলেপতার' (*পথ জানা নাই*) গল্পে প্রকৃতিনির্ভরতার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা দক্ষিণ বাংলার গ্রামজীবনের এক চিরায়ত বাস্তব চিত্র–

> তখন মৌসুমের কাল। কয়েকদিন ধরিয়া একটানা বৃষ্টি চলিয়াছে। দক্ষিণ হইতে কালো কালো মেঘ আসমান ব্যাপিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ধাইয়া আসে, নদী ফুলিয়া ওঠে, বাতাস খ্যাপার মতো হু হু করিয়া এলোমেলোভাবে বহিতে শুরু করে, আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে পশলার পর পশলা দেয়ই আসিয়া সমস্ত প্রকৃতিটাকে যেন একেবারে বদলাইয়া দিতে চাহে। এমনি দিনে গাঙে নাও লইয়া বাহির হওয়ায় বড় বিপদ।[৩]

কৃষিনির্ভর বাংলায় প্রকৃতি আর মানবজীবন একই সূত্রে বাঁধা। প্রকৃতি যখন প্রসন্ন থাকে তখন ফসলের ফলন ভালো হয়; জীবিকার নিশ্চয়তা পাওয়ায় মানুষের মনে বিরাজ করে শান্তি ও স্বস্তি। অন্যদিকে প্রকৃতির প্রতিকূলতা – বিশেষ করে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি – কৃষকের মুখের হাসি কেড়ে নেয়। শস্যের বিনষ্টি এবং ফসলহানির কারণে দেখা দেয় অশান্তি ও দুর্ভোগ। এভাবেই প্রকৃতি-নির্ভরতার এক অবিনাশী চক্রে বাঁধা পড়ে আছে পল্লিবাংলার সহজসরল মানুষগুলোর জীবন। 'মৌসুম' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে দেখা যায়, টানা বৃষ্টিহীনতার কারণে গ্রামের মানুষগুলোর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়েছে ঘর থেকে ঘরে। প্রকৃতির এই বিরূপতা লেখকের অনবদ্য ভাষাভঙ্গিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে–

> চৈত্র মাস শেষ হয়ে গেল, তবু একফোঁটা জল নেই। এখনো দক্ষিণা হাওয়া কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে মৃদু মর্মর তুলে ঝিরঝিরিয়ে যায়, উদ্দাম হয়ে মৌসুমী সংবাদ আনে না। সময় সময় এমনো হয় যে নারকেল গাছের পাতাটি পর্যন্ত

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, 'বন্যা', *পথ জানা নাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
[২] প্রাগুক্ত।
[৩] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, 'মদন মাঝির গেলেপতার', *পথ জানা নাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

নড়ে না। পত্রঝরা গাছগুলির দিকে তাকিয়ে মনে হয়, এতো তীব্র রৌদ্রে পুড়ে হঠাৎ বুঝি তার শুকনো ডালে আগুন ঝ'রে যাবে।[১]

দীর্ঘ এই অনাবৃষ্টি কৃষকদের মনে হতাশা জাগিয়ে তোলে, 'তাদের ঘরে ঘরে মনে মনে নামে দুর্ভাবনার অন্ধকার।' কেননা, বৃষ্টি না হলে ভাদ্র মাসের ফসল পাবে না তারা। প্রকৃতিনির্ভর অসহায় এসব মানুষ তাই পুজো, ব্রত আর পিরের দরগায় সিন্নি দেয়ার মাধ্যমে আসন্ন দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে।

আবহমানকাল থেকেই বাংলাদেশ নানাপ্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার। প্রায় প্রতি বছরই এদেশের বিভিন্ন এলাকায় বন্যার প্রাদুর্ভাব ঘটে। বন্যার প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। ফসল ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি, অর্থনৈতিক কাজকর্মের ব্যাঘাত, রোগের বিস্তার ও প্রাণহানিসহ নানা সমস্যার সৃষ্টি করে বন্যা। বন্যায় গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনে সৃষ্টি হয় দুর্বিষহ অবস্থার। 'বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে বাংলাদেশ গত শতাব্দী জুড়ে বিভিন্ন স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক বন্যার মুখোমুখি হয়। ১৯৫৪ সালের বন্যায় বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ২৬% প্লাবিত হয়। ... ১৯৫৫, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৮, ১৯৬৯, ১৯৭০ ...সালে আঘাতকৃত বন্যাগুলো স্বাভাবিক বন্যা হওয়া সত্ত্বেও সেসব বন্যা অস্বাভাবিক ক্ষতি সাধন করে।'[২] শামসুদ্দীন আবুল কালামের বিভিন্ন গল্পে প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে। 'বন্যা' (*পথ জানা নাই*) গল্পে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের এক গ্রামে বন্যার ভয়াবহ পরিস্থিতি এবং জনজীবনে তার নেতিবাচক প্রভাবের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এ-গল্পে দেখা যায়, বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে গ্রাম-মাঠ, জমির আল এমনকি নদী পারাপারের সাঁকোও। এ সময়কালে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়ার একমাত্র বাহন হয়ে ওঠে নৌকা। বন্যার পানিতে মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্যতম অবলম্বন ধানক্ষেতগুলোও তলিয়ে যায়। বিস্তীর্ণ জলের মধ্যে কেবলই দেখা যায় ধানগাছগুলোর শীর্ষভাগ, যা নিরন্ন মানুষগুলোর হতাশাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। লেখকের ভাষ্য–

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'মৌসুম', *অনেক দিনের আশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

[২] মো: আব্দুস সাত্তার ও মেহেরীন মুনজারীন রত্না, 'বাংলাদেশের দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা: ৯৬, জুন ২০১৬, পৃ. ২৩৪

> কোলায় ধানের চারার শীষগুলি আর দেখা যায় কি না যায়; থৈ থৈ পানির ঢেউয়ে আর শোঁ শোঁ বাতাসের দাপটে জীবন বাঁচাইবার শেষ চেষ্টাটিও যেন তাহাদের ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে।[১]

বাংলাদেশের নদীতীরবর্তী অঞ্চলের আরেক পরিচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ নদীভাঙন। 'জোর যার' *(শাহেরবানু)* গল্পে নদী ভাঙনের ফলে ঘর-বাড়ি, জমি-জমা হারিয়ে আশ্রয়হীন মানুষের অসহায়ত্বের চিত্র ফুটে উঠেছে। গ্রামের এককালের অবস্থাসম্পন্ন কৃষক রহম আলীর বাড়িটি নদীর তীরে অবস্থিত। সবসময়ই নদীভাঙনের আশঙ্কার মধ্যে থাকে রহম আলীর গোটা পরিবার। আশেপাশে কোনো আত্মীয়-স্বজনও নেই তার। তাছাড়া আকালের দিনে অভাবের সংসারে সকলেই নিজ নিজ ঘর সংসার সামলাতে ব্যস্ত। এ কারণে বসতবাড়িটি যদি নদীগর্ভে চলেই যায় তাহলে সন্তান-সন্ততি নিয়ে কোথায় আশ্রয় নেবে ভেবে পায় না রহম আলী। এমন অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে রহম আলীর মানসিক অবস্থা ফুটে ওঠে নিচের গল্পাংশে–

> এদিকে নদী ক্রমান্বয়ে আগাইয়া আসিতেছে। রাত্রে শুইয়া শুইয়াও তাহার ছলাৎছল জলকল্লোলে ধ্বংসের করতালি শুনিতে পায় রহম আলী। এক রাত্রেও ঘুমাইতে পারে না। চাপ চাপ মাটি ভাঙিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকের এক একখানা পঞ্জরাস্থি ও মন যেন ভাঙিয়া পড়ে। স্ত্রী, মরিয়ম, সাত বছরের ছোট ছেলেটি সকলেই তো সর্বদা তটস্থ। কোন সময় যে এক বিরাট চাপশুদ্ধ তাহারা ঘরবাড়ি সমেত নদীর গর্ভে লুপ্ত হইয়া যাইবে কে জানে![২]

অসহায়, খেটে খাওয়া এসব মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি যেন প্রায়শই নিষ্ঠুর এক খেলায় মেতে ওঠে। কখনো কখনো অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের বেঁচে থাকার স্বপ্নকে ফিকে করে দেয়। 'সরজমিন' (*পথ জানা নাই*) গল্পে প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার গ্রামীণ মানুষের দুর্ভোগের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। পুরো গল্পটি পত্রাকারে বর্ণিত। গ্রামে বন্যার দৃশ্য সরেজমিনে দেখতে এসেছে এক শহুরে জমিদার-নন্দন। তারপর মিতা নামের এক নারীর উদ্দেশে লেখা একটি চিঠিতে বন্যার নানা ঘটনা বর্ণনা করেছে সে। আর এর মাধ্যমেই প্রকৃতির চরম বিরূপতার শিকার মানুষের জীবনের চালচিত্র উদ্ভাসিত করেছেন গল্পকার। গল্প যতই অগ্রসর হয়, বন্যাপীড়িত নিরন্ন মানুষের জীবন সংগ্রামের কঠোর বাস্তবতা কথকের মনকে ততই আচ্ছন্ন করে, প্লাবিত করে বন্যার দুরন্ত জলের মতো। এই গল্পে বর্ণিত বন্যাপ্লাবিত গ্রামের অধিবাসীরা অধিকাংশই কৃষিজীবী। প্রাণান্ত পরিশ্রম করে স্বল্প জমিতে যেটুকু ফসল ফলায় তাই দিয়ে কোনরকমে

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'বন্যা', *পথ জানা নাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'জোর যার', *শাহেরবানু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

দিনাতিপাত করে তারা। কিন্তু 'যে জীবন ছিল তাও ভেস্তে গেছে বন্যায়'। বন্যাপ্লাবিত এ গ্রামের অধিবাসীদের দুর্দশা ও বন্যার স্বরূপ লেখকের ভাষায় চিত্রায়িত হয়েছে এভাবে–

> পানি থৈ থৈ করছে চতুর্দিক। বড়ো তাল-নারকেল গাছগুলিও কোমর সমান পানিতে ডুবে দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং পানি যে কতখানি তা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারবে। এই বিস্তীর্ণ এলাকার সব লোকেরা জায়গা নিয়েছে জেলা বোর্ডের উঁচু রাস্তাটার ওপরে; ঘরের চাল খুঁজে খুঁজে ভাসিয়ে এনে তারি ওপরে ছাউনি তুলেছে; বৃষ্টি হলে তার মধ্যে ঢোকে আবার থামলে বাইরে এসে ঝিমায়।[১]

প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র মানুষেরাই। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এসব মানুষই সীমাহীন দুরবস্থার শিকার হয়। প্রকৃতির বিরূপতা এবং দারিদ্র্যজনিত অসহায়ত্ব – উভয়ের মিশ্রণে তাঁদের জীবনে নেমে আসে অন্তহীন দুর্ভোগ।

পেশা ও জীবিকা

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। তবে গ্রামীণ মানুষের অন্যান্য পেশাও রয়েছে। এসব পেশার মধ্যে মাঝি, জেলে, দর্জি, সাপুড়ে, চাকুরিজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বসতি এলাকার পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে নানা কাজ বা পেশায় নিয়োজিত থাকে ব্যাপকসংখ্যক মানুষ। উপকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষরা নদী বা সমুদ্র-উপকূলবর্তী বন-জঙ্গলকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলে তাদের জীবিকা। শামসুদ্দীন আবুল কালামের গল্পে উপস্থাপিত গ্রামীণ মানুষরাও কৃষি ও কৃষির বাইরে নানা পেশায় যুক্ত। তাঁর গল্পে কৃষক, মাঝি, জেলে, পোস্টমাস্টার, কাঠুরে, বাওয়ালি, রাজমিস্ত্রি, কারুশিল্পী ইত্যাদি নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের যাপিত জীবনসংগ্রামের নানা চিত্র স্থান পেয়েছে।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের সরজমিন (*পথ জানা নাই*), ইতিকথা (*শাহেরবানু*), পৌষ (*শাহেরবানু*), শেষপ্রহর (*শাহেরবানু*), মূলধন (*শাহেরবানু*), আসা যাওয়ার কথা (*অনেক দিনের আশা*) প্রভৃতি গল্পে কৃষিজীবী মানুষের জীবনচিত্র স্থান পেয়েছে, যেগুলোতে কৃষকের দারিদ্র্যপীড়িত, শোষণ-বঞ্চনাময়

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'সরজমিন', *পথ জানা নাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮

জীবনকাহিনিই বেশি চিত্রায়িত হয়েছে। 'সরজমিন' গল্পে এক অজপাড়া গাঁয়ের চিত্র বর্ণিত হয়েছে, যেটিকে লেখক বলেছেন 'এতই নগণ্য যে হয়তো মানচিত্রেও নেই'। সে গ্রামের অধিবাসীরা কৃষিজীবী। স্বল্প জমিতে প্রাণান্ত পরিশ্রমে যে পরিমাণ ফসল তারা ফলায় তাতে তাদের জীবন কোনোরকমে কেটে যায়। এ গ্রামের কৃষকদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে লেখক বলেছেন–

> সে কী জীবন! জীবিত থাকা যাকে আমরা বলি সে লক্ষণ তো কারো মাঝে দেখলুম না। এ যেন বোঝা; কোনোমতে এরা টেনে চলেছে। মাঝে মাঝে যখন পারে না, থেমে পড়ে মূঢ়ের মতো, এদিক ওদিক তাকায়। সে চোখ গরুর মতো। অসহায়, স্পষ্ট কোনো ভাষা নেই, কিন্তু বেদনাটা উচ্চারিত।[১]

গ্রামের দরিদ্র কৃষক রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ধান ফলায়। সেই ধান বিক্রি করে কোনোমতে আধপেটা খেয়ে দিনাতিপাত করে; অথচ সমাজের তথাকথিত উঁচুশ্রেণির মানুষ কৃষকদের কঠোর শ্রমে উৎপন্ন ধান নিয়ে করে বিলাসিতা। 'সরজমিন' গল্পে এ বিষয়টিও তুলে ধরেছেন লেখক। যে কৃষকদের রক্ত পানি করা পরিশ্রমের ফসল 'কালিজিরা ধানের চাল না হলে আমাদের ডাইনিং টেবিল পোলাওয়ের গন্ধে ভুরভুর করে না' 'বালাম, রূপশালী, কনকভোগ আর বাকতুশী-র যে চাল ছাড়া আমাদের খাওয়া হয় না' তা এদেরই পরিশ্রমলব্ধ। অথচ দিনান্ত পরিশ্রম করে তাদের কপালে দুবেলা দুমুঠো ভাত জোটে না। 'ইতিকথা' (*শাহেরবানু*) গল্পে নতুন ফসলের জন্য প্রান্তিক কৃষক হোসেনের যুগপৎ আকাঙ্ক্ষা ও আশঙ্কা লেখকের ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। যে ফসলের অপেক্ষায় তারা অধীর আগ্রহে থাকে সে ফসলের ফলন ভালো না হলে তাদের দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। কারণ এই ফসলকে নিয়ে তাদের অনেক স্বপ্ন। সারা বছর তারা অপেক্ষা করে নতুন ধান ঘরে এলে সে ধান বিক্রি করে ধার-কর্জ শোধ করবে, নিত্য প্রয়োজনীয় নানান চাহিদা এবং পরিবার-পরিজনের শখ-আহ্লাদও মেটাবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাষিদের এই অপেক্ষার পরিণতি সুখকর হয় না। হোসেনের জীবনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কারণ তার জমিতে এবার ফসল ভালো হয়নি। অধিক বৃষ্টির ফলে তার 'বিলেন জমি'তে পানি জমে থাকায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। উৎপাদিত ফসলের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে নির্ণীত হয় কৃষকদের জীবনযাত্রা। ফলে আশানুরূপ ফলন না হওয়ায় হোসেনের জীবনে দেখা দেয় চরম দারিদ্র্য; যার পরিণতিতে ঘটে দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি এবং জীবনের সমূহ অশান্তি।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

'পৌষ' গল্পের তাজুর অবস্থাও হোসেনের মতো। এই গল্পের শুরুতে লেখকের কাব্যিক বর্ণনায়ও প্রতিফলিত হয়েছে কৃষকদের দুরবস্থার চিত্র – 'চাষী জীবনের সেরা সময় পৌষমাস; বুকে আসে অনেক শ্বাস, পায় অনেক আশা পূরণের আশ্বাস।' কিন্তু সেসব মিথ্যা হয়ে যেতেও সময় লাগে না। হোসেনের মতো তাজুর ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটল না। অপেক্ষাকৃত আগে বোনা ধানক্ষেতে সবুজ চারা গজানো থেকে ধান পাকা পর্যন্ত পুরো সময়টা তাজু অত্যন্ত দরদ দিয়ে ক্ষেতের যত্ন করেছে এবং অপেক্ষা করেছে নতুন ধান কবে ঘরে আসবে। আর এই ধানে দুর্দিনের অবসান ঘটবে। কিন্তু বাস্তবতা তার উল্টো। ধান কেটে ধান মাড়াই করে পরিমাপ করে তাজুর মন দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কারণ এই স্বল্প পরিমাণ ফসলে দুঃখ-দুর্দশা কাটিয়ে ওঠার আশা ক্ষীণ। এতদিন গ্রামের সমবায় কৃষিঋণ সমিতির ঋণের টাকায় বৃদ্ধা মাকে নিয়ে কায়ক্লেশে ফ্যান-ভাত খেয়ে কোনোমতে দিনাতিপাত করেছে। ধান বিক্রির টাকায় তা শোধ দিতেই হবে। তাছাড়া গ্রামের সামন্তশ্রেণির প্রতিভূ হলধর চক্রবর্তীর কাছ থেকে ধার নেওয়া টাকা সুদে আসলে শোধ দেওয়ার তাড়াও পাচ্ছে বারবার। তাই এখন ধান বিক্রির সামান্য টাকায় কীভাবে সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করবে; ধার শোধ, খাজনা, খাওয়া-পরা এসব সম্পন্ন করবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিশেহারা তাজু।

কৃষক যতই পরিশ্রম করুক, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে তার মুক্তি মেলে না। তাদের দুর্দশাময় জীবনযাপনের কারণ কিছুটা অনুধাবন করা যায় 'মূলধন' (*শাহেরবানু*) গল্পে কৃষক সমাজের আরেক প্রতিভূ দরিদ্র কৃষক মেনাজের জীবন-চিত্রায়ণসূত্রে। ভাগ্যহত দরিদ্র চাষি মেনাজ একরকম ভূমিহীন কৃষক। সে পরের ক্ষেতে বর্গা খেটে জীবিকার্জন করে। মেনাজের মতো দরিদ্র কৃষকরা দিনান্ত পরিশ্রম করেও তাদের ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে পারে না। তারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে কখনো বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে, আবার কখনো মানবসৃষ্ট নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। কখনও বন্যা, কখনো অনাবৃষ্টি, আর কখনো বা মন্বন্তর-মহামারিতে পর্যুদস্ত হয় মেনাজের মতো মানুষদের জীবন। এ যেন "জলে কুমির ডাঙায় বাঘ" প্রবাদেরই বাস্তব প্রতিফলন। লেখকের ভাষায়–

হয় প্রচণ্ড বন্যা ধানের খাড়া খাড়া সোনালি শীষগুলো মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে যায়, অথবা ক্ষেত থেকে ঘরে না উঠতেই মামলা-মোকদ্দমা জমিদারের খাজনা প্রভৃতির শেষে হাতে জমা থাকে অতি অল্পই।[১]

নিরন্তর অভাব-অনটনের মধ্যেই গ্রামের কৃষকদের জীবন কাটে; তারপরও অদম্য জীবনীশক্তিকে সঙ্গী করে এগিয়ে চলে তারা। 'শেষপ্রহর' (*শাহেরবানু*) গল্পের হোসেন নিজের 'কয়েক কুড়া' জমিতে চাষবাস করে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই দিনাতিপাত করছিল। কিন্তু বিয়ের পর পরিবারে জনসংখ্যাবৃদ্ধি, যুদ্ধ, মন্বন্তর প্রভৃতির প্রভাবে তার জীবনে নেমে আসে অভাবের কালো ছায়া। স্ত্রী, আত্মীয়-পরিজনও এক পর্যায়ে দূরে সরে যায়। নির্জন ঘরে পরিত্যক্ত অবস্থায় অসহ্য রোগযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে হোসেন।

গ্রামবাংলায় ঋতুভিত্তিক কিছু পেশা দেখা যায়, যার মধ্যে ফসল কাটার সময় ভিন্ন গ্রাম বা লোকালয় থেকে আসা মজুর অন্যতম। এরা বদলা, মুনিষ, গাবুর ইত্যাদি নামে পরিচিত। সাধারণত দৈনিক মজুরির বিনিময়ে ফসল কাটা, ধান মাড়াই ইত্যাদি কাজে সাহায্য করে তারা এবং ধানকাটার মৌসুম শেষে ফিরে যায় নিজ নিজ ঠিকানায়। আবার কখনো সারাবছর একই এলাকায় বা একই বাড়িতে কাজ করে। এমন মুনিষও দেখা যায়, যারা মাঝেমধ্যে নিজ এলাকায় গিয়ে পরিবার পরিজনের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আসে। 'আসা যাওয়ার কথা' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সাদেক এরকমই একজন মুনিষ। গ্রামের অবস্থাপন্ন গৃহস্থ কাসেম খাঁর বাড়িতে 'খাওয়া পরা বাদে দশ কাঠি ধানের বিনিময়ে' মুনিষের কাজ নেয় সাদেক। তার পিতারও ছিল এই পেশা। বংশানুক্রমিক এই পেশার প্রতি অনীহা সত্ত্বেও অভাবের তাড়নায় পিতার পথই অবলম্বন করতে হয় তাকে।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবিকা মূলত বংশানুক্রমিক। জেলের সন্তান বংশানুক্রমিকভাবে জেলে আর কৃষকের সন্তান কৃষকই হয়, যদিও বিদ্যার্জনের মাধ্যমে এ-ধারায় পরিবর্তনও আনতে পারে সাধারণ মানুষ। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়ে শহরের উদ্দেশে পা বাড়াবার নজিরও কম নেই। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের গ্রামভিত্তিক গল্পগুলোতে অধিকাংশ চরিত্র কৃষিজীবী হলেও কিছু ভিন্নধর্মী পেশারও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

[১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম 'মূলধন', *শাহেরবানু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫

গ্রামের এক দরিদ্র পোস্টমাস্টার মাজু মিয়ার জীবনের করুণ পরিণতির চিত্র ফুটে উঠেছে 'নবমেঘভার' (*দুই হৃদয়ের তীর*) গল্পে। স্বল্প বেতনভুক মাজু মিয়ার জীবনে স্বপ্ন আর উচ্চাশা ছিলো অনেক, কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে সেসব স্বপ্নের কোনোটিই পূরণ হয়নি; বরং দারিদ্র্যের কশাঘাতে চোখের সামনে সেসব স্বপ্নের নির্মম মৃত্যুতে স্তব্ধ হয়েছে সে। কৃতিত্বের সঙ্গে মেট্রিক পাশ করে পিতার অকাল মৃত্যুতে সংসারের জোয়াল কাঁধে তুলে নিয়ে সামান্য বেতনের পোস্টমাস্টার হতে হয়েছে মাজু মিয়াকে; যে একসময় কবিতা লিখত আর জীবনে বড় কিছু হবার স্বপ্ন দেখত। স্থানীয় এক অবস্থাপন্ন পরিবারে বিয়ে করেও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পায়নি মাজু মিয়া, বরং দিনে দিনে সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে। কারণ ধনী পিতার কন্যা মনিরা দরিদ্র পোস্টমাস্টারের সংসারে কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। ফলে অহর্নিশ কলহ বিবাদ লেগে থাকে দুজনের মধ্যে। একটি কন্যাসন্তানের জন্মও তাদের অসুখী সংসারে সুখের প্রদীপ জ্বালাতে পারেনি। অনেক উৎসাহ আর উদ্যম নিয়ে সংসারী হওয়ার চেষ্টা করে মাজু মিয়া, কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের গল্পে সুন্দরবন-সন্নিহিত অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও জনমানুষের জীবনচিত্রও অঙ্কিত হয়েছে বিশেষভাবে। সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে জীবনধারণ করেন এ অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক মানুষ যাদের মধ্যে কাঠুরে, বাওয়ালি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 'হঠাৎ' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পের মফেজ আলীর পেশা কাঠের কারবার। সুন্দরবন থেকে কাঠ কেটে এনে নিকটবর্তী জনপদে বিক্রি করে সে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রত্তনকে এই কাজের জন্য মাসিক চল্লিশ টাকা মজুরিতে নিয়োগ করতে দেখা যায় মফেজ আলীকে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে মৎস্যজীবী মানুষের সংখ্যাও প্রচুর। মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে সংসার চালায় তারা। 'শাহেরবানু' (*শাহেরবানু*) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মাজেদকে দেখা যায় গ্রামের খাল-বিল থেকে মাছ ধরে শহরে নিয়ে বিক্রির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করতে। 'কেরায়া নায়ের মাঝি' (*শাহেরবানু*) গল্পে দরিদ্র মাঝি আজহারের জীবনসংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে। কেবল নৌকা বেয়ে পরিবার চালানো যায় না বলে বাড়তি কাজ হিসেবে মাছধরা ও কৃষিকাজেও নিয়োজিত হয় আজহার। কিন্তু শত চেষ্টাতেও পরিবারের সদস্যদের মুখে দু মুঠো খাবার জোগাতে ব্যর্থ আজহার অসুস্থ অবস্থাতেই চেষ্টা করে নৌকা বাইতে আর তা করতে গিয়েই করুণ মৃত্যু ঘটে তার।

বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে অনৈতিক নানা পেশাও প্রচলিত রয়েছে যদিও দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেঁচে থাকার তাগিদে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার শেষ অবলম্বন হিসেবে অনেকে বেছে নেয় এ ধরনের পেশা। এ ধরনের পেশার মধ্যে চুরি-ডাকাতি অন্যতম। এর মধ্যে একটি বড় অংশই ছিঁচকে চোর বা সিঁদেল চোর। আশপাশের বাগানের নারিকেল-সুপারি, ফল-ফলাদি চুরি করে বা সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকে চুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে তারা। চুরি করা দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে সংসারের চাহিদা মেটায় তারা। রাতের বেলা চুরি করলেও দিনের বেলা সাধারণ মানুষের সাথে স্বাভাবিকভাবেই তারা মেলামেশা করে। 'ইতিকথা' (*শাহেরবানু*) গল্পে এরকমই এক চোর – 'সবার পরিচিত করিম চোর'-এর উল্লেখ রয়েছে। লেখকের ভাষায় তার চৌর্যবৃত্তির বর্ণনা–

> রোজ রাতে গ্রামের বুক চিরে প্রবহমান খালে তার ছোট ডিঙিখানা সন্তর্পণে নিশীথের অভিসারে বেরোয়। কোথায় যায় কী করে অন্ধকারে জানা না গেলেও, ভোরের বেলা আশেপাশের গ্রামের বাগানের মালিকেরা দেখে তাদের বাগানের নারকেল, সুপুরি সাফ হয়ে গেছে; আর ক্বচিৎ কেউ কখনও দেখে ফেলে যে, বন্দরের দিক থেকে করিম নিশ্চিন্ত মনে নৌকো নিয়ে বাড়ি ফিরছে। নৌকোর মধ্যে হোগলা পাতায় ঢাকা হরেক রকম সওদা। [১]

অনেক সময় দেখা যায়, অসাধু উপায়ে উপার্জন করে স্বচ্ছল জীবনযাপনও করে কেউ কেউ। 'ইতিকথা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হোসেনের স্ত্রী তাকে প্রলুব্ধ করে চৌর্যবৃত্তিতে আত্মনিয়োগ করতে। তার মতে – 'আজকালকার এমন দিনে নীতি ধর্মের শিকল পরে ভালোমানুষী করা যে আত্মহত্যারই শামিল।'[২] তাই এক পর্যায়ে দেখা যায়, স্ত্রী কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে হোসেনের মতো সহজসরল ভালোমানুষও চৌর্যবৃত্তিকে বেছে নেয় জীবনধারণের অবলম্বন হিসেবে।

নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তীব্র বাসনায় যারা এসব অনৈতিক পেশা অবলম্বন করে তাদের মধ্যে সমাজের বিত্তবানদের প্রতি ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতেও দেখা যায়। তারা মনে করে ধনীরা দরিদ্রদের সাহায্য-সহযোগিতা করে না বলেই দরিদ্ররা বাধ্য হয়ে নানা নীতি বহির্ভূত পেশা বেছে নেয়। এ প্রসঙ্গে

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'ইতিকথা', *শাহেরবানু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

করিম আর হোসেনের কথোপকথন স্মর্তব্য, যেখানে হোসেনের কাছে চৌর্যবৃত্তির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে করিম –

> আতাহার মুন্সীর ঘরে কত চাউল আছে তা জানো? এক সের চাউলও তার কাছে ধার পাওয়া যায় না। যাবা আজ আমার সঙ্গে তার কিছু নামাইয়া আনতে?
>
> : ডাকাতি? চমকে উঠল হোসেন।
>
> : না না, ডাকাতি কেন, সিঁদ কাটিয়া কিছু নামাইয়া আনমু। মুন্সীর ঘরের পিছন দিকেই গোলা, কী করতে হইবে না হইবে সব আমি ঠিক করইয়া রাখছি। [১]

'মদনমাঝির গেলেপতার' (*পথ জানা নাই*) গল্পে মদন একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত এবং তার জীবনাখ্যানই প্রতিফলিত হয়েছে এই গল্পে। মদন মাঝি নৌপথে ডাকাতি করে। তার নাম শুনলে যাত্রীরা ভয়ে 'খরগোশের মতই কাঁপে', তা 'পারতপক্ষে ঐ দশ পঁচিশখানা গাঁয়ের পাশের প্রায় মাইল দশেক গাঙ এলাকায় কোনো নাও চলে না।' কিন্তু মদন মাঝির দুর্ধর্ষ ডাকাতির কথা শুনে সবাই শিউরে উঠলেও তার হৃদয় ছিল কোমল। গরিব মানুষের প্রতি সে ছিল অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। 'যাহাদের আছে তাহাদের লুট করাই তাহার পেশা এবং নেশা। সেই লুট করা অর্থে-সম্পদে উপকথার রবিন হুডের মতো বহু গরীবকে সে বাঁচাইয়া রাখে।' (পৃ. ৮১)। এ কারণে মদন মাঝির নৃশংসতার কথা জানলেও দরিদ্র মানুষরা কখনও তাকে শত্রু ভাবতো না। আবার তাকে লোকে ভালোওবাসতো না – 'ভয়ে ভক্তিতে সামনে পড়িয়া কাঁদিয়াছে, কিন্তু অন্তরে ঠাঁই দেয় নাই।' 'অনেক দিনের আশা' গল্পের আয়নদ্দিও চৌর্যবৃত্তিতে নিয়োজিত। মন্বন্তরের প্রভাবে উপায়ান্তর না দেখে চৌর্যবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে সে। সমাজের ধিক্কার সত্ত্বেও এই পেশাকে পাল্টানোর কোনো উপায় খুঁজে পায় না সে। এ অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী শুধু একটি নির্দিষ্ট পেশার ওপরই নির্ভর করত না। জীবিকার প্রয়োজনে তারা একাধিক কাজে নিযুক্ত থাকত। যেমন: কৃষিকাজের পাশাপাশি গবাদিপশু লালনপালন, মাছ ধরা, ফল ফলাদি আহরণ। আম, নারিকেল, সুপারি, বাঁশ, তাল, খেজুর প্রভৃতির বপন-রোপণ ও পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকত কৃষকেরা।

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

'বন্যা' (*পথ জানা নাই*) গল্পে মধুর জীবনচিত্র বর্ণনার মধ্য দিয়ে গ্রামজীবনের নানা অনুষঙ্গ ফুটে উঠেছে। মধুর পরিবার কৃষিনির্ভর। তাদের জীবিকার মূল অবলম্বন 'খন্দে'র ধান বিক্রি। এছাড়াও নারিকেল, সুপারি বিক্রি, গরু, ছাগল, হাঁসমুরগি পালন করে কিংবা বর্ষা মৌসুমে খালেবিলে, কোলায় মাছ ধরে, শাপলা-শালুক তুলে তাদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত হতো। মধুর বাড়ির পরিবেশ-প্রতিবেশ এবং তাদের প্রাত্যহিক গৃহকর্মের মধ্যে চিরাচরিত গ্রামীণ জীবনের স্বরূপ ফুটে উঠেছে এভাবে–

> দক্ষিণ পোতার ঘর। উত্তরে মুখ। পিছনে চুলাশাল। খেজুর পাতায় ছাওয়া বেড়া দিয়া বাহির হইতে পৃথক করিয়া হাউলি করা। মধু গিয়া যেখানে দাঁড়াইলো, তা ভাতের ফ্যান, ভাঙা হাঁড়ি-কুড়ি আর আনাজের খোসা ফেলিবার জায়গা। বাপ সেই কোন্ সকালে বলিয়াছিলো, উত্তরবাড়ির 'খিল' হইতে গরুর জন্য ঘাস কাটিয়া আনিতে; সে গজগজ করিয়া যায় নাই; তাহারই দৃষ্টি এড়াইবার সন্তর্পণতায় উঁকি দিয়া চাহিয়া দেখিলো, হাজী একধারে বসিয়া হাঁসের ছানাগুলিকে শামুক কাটিয়া খাওয়াইতেছে।[১]

গ্রামের মানুষের জীবন বৈচিত্র্যময়, সুখে-দুঃখে পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। সারাদিন পুরুষরা মাঠেঘাটে এবং নারীরা উঠোনে বা ঘরে কাজকর্ম করে সন্ধ্যার পর সবাই মিলে গল্পগুজব করে, একে অপরের সঙ্গে সুখদুঃখের কথা বিনিময় করে শ্রান্তি দূর করে। বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময় রান্নাঘরের সামনে উন্মুক্ত দাওয়ায় বা উঠোনের কোণে 'চুলাশাল' তৈরি করা হয়। সন্ধ্যার পর সেই চুলায় রান্নাবান্না এবং কখনো কখনো খাওয়াদাওয়ার পাটও চুকানো হয়। বিশেষ করে শীতকালে এ দৃশ্য বেশি দেখা যায়। আনন্দমুখর পরিবেশে চুলাশাল ঘিরে সবাই গালগল্পে মেতে ওঠে। এরকমই একটি পরিবেশের চিত্র 'আসা যাওয়ার কথা' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে ফুটে উঠেছে–

> শীতের রাত। রান্নাঘরের সামনে উঠোনের যে জায়গাটুকু ঘিরে 'চুলাশাল' তৈরি করা হয়েছে সেখানে চুলোর কাছে বসে সবাই গল্প করছিল; কাসেম খাঁ, তার মা, বোন এবং দুজন মুনিষ খানিক আগে খাওয়া দাওয়া সেরে সবে আগুনে হাত পা একটু গরম করে নিচ্ছে।[২]

'জীবনের শুভ অর্থ' *(পথ জানা নাই)* গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র লোকনাথের শৈশবের স্মৃতিচারণায় ভেসে ওঠে গ্রামীণ জীবনের শাশ্বত রূপ –'সেই ছোট বয়সে, ছোট্ট ছিপে খালের পাড়ে বসে মাছ ধরার দিনগুলি,

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'বন্যা', *পথ জানা নাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'আসা যাওয়ার কথা', *অনেক দিনের আশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

উঠানকোণে চুলাশালের উনুন ঘিরে – নোতুন ধান, খেজুর রস আর কাঁঠাল কুঁড়ির বিচিত্র গন্ধ পরিবেশে মায়ের মুখে গল্প শোনার রাত।[১]

অভাব ও দারিদ্র্য

অভাব ও দারিদ্র্য বাংলার গ্রামজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কৃষিনির্ভর গ্রামীণ মানুষের জীবনজীবিকা কৃষির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে কৃষি উৎপাদনে সামান্য সমস্যাও তাদের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা, শোষকদের অত্যাচার – এসবের প্রভাবও পল্লিবাংলার অভাব-দারিদ্র্যকে প্রকট করে তোলে। গ্রামবাংলার হতশ্রীদশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করতে গিয়ে মানবদরদী কথাকার শামসুদ্দীন আবুল কালামও তাঁর 'শাহেরবানু', 'ইতিকথা', 'শেষপ্রহর', 'কেরায়া নায়ের মাঝি', 'মুক্তি', 'নব মেঘভার', 'সরজমিন', 'হঠাৎ', 'লালবাত্তি' প্রভৃতি গল্পে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধরত মানুষের বিশ্বস্ত চিত্র অঙ্কন করেছেন। সর্বগ্রাসী অভাবের কারণে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়সহ মানবতার চরমতম অবমাননার নানা চিত্র আমরা পাই শামসুদ্দীন আবুল কালামের গল্পে। পারস্পরিক সহমর্মিতা, আন্তরিকতা এবং বিপদের মুখে অন্যকে সাহায্য করার মানসিকতা গ্রামবাংলার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অভাব ও দারিদ্র্যের ছোবলে সহজাত এসব গুণাবলিকে বিসর্জন দিয়ে আত্মপরতার সাধনায় মগ্ন হতে হয় সাধারণ গ্রামবাসীকে। দারিদ্র্যের ফলস্বরূপ মূল্যবোধের অবক্ষয়, দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপড়েন এবং বিচ্ছেদ, অসামাজিক কার্যকলাপের বিস্তার এবং সামাজিক সম্পর্কের জটিলতা প্রভৃতি বিষয়গুলো উঠে এসেছে তাঁর গল্পে। দারিদ্র্যমুক্তির আশায় সহায়সম্বলহীন গ্রামবাসীকে দেখা যায় শহরের পানে ছুটতে, কিন্তু সেখানেও কি আছে ভরসা? অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, নাগরিক জীবনের ক্লেদ-পঙ্কিল পরিবেশে তাদের স্বপ্ন ভেঙে যায়। অগত্যা দিনবদলের স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিয়ে পুনরায় গ্রামের পথে পা বাড়ায় তারা – কিন্তু সেখানেও তাদের জন্য অপেক্ষা করে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা। এভাবে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির দীর্ঘ ও মর্মান্তিক ব্যবধান গ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলোকে নিরন্তর দগ্ধ করে।

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'জীবনের শুভ অর্থ', *পথ জানা নাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

'শাহেরবানু' (*শাহেরবানু*) গল্পে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মাজেদ ভালবাসে শাহেরবানু নামের একটি মেয়েকে। দরিদ্র মাজেদ গ্রামের নদী-নালা-খাল-বিল থেকে মাছ ধরে সেগুলো শহরের বাজারে বিক্রি করে যা পায় তা দিয়ে সংসার চালায়। মাছ বিক্রির টাকায় সাংসারিক ব্যয়নির্বাহ তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে; একটি চাহিদা পূর্ণ হলে আরেকটি চাহিদা অপূর্ণই থেকে যায়। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম পুরুষ মাজেদ তার ভালোবাসার মানুষ শাহেরবানুকে একটি শাড়ি উপহার দিতে চায়; কিন্তু কাছারির খাজনা পরিশোধের দায় থাকায় সেই আন্তরিক ইচ্ছা পূরণে ব্যর্থ হয় সে। তাই মাছের হাঁড়ি কাঁধে নিয়ে শহরের উদ্দেশে পথ চলতে চলতে মাজেদ হিসাব করতে থাকে পাঁচ কুড়ি কই মাছ বিক্রি করলে কত টাকা পাওয়া যাবে। ওদিকে কাছারির বকেয়া খাজনা পরিশোধের বিষয়টিও তাকে উদ্বিগ্ন করে রাখে। খাজনা পরিশোধ নাকি প্রেয়সীকে শাড়ি উপহার – এমন এক উভয় সংকটে পড়ে মাজেদের মনের শান্তি উধাও হয়ে যায়। এইসব চিন্তা করতে করতে এক পর্যায়ে সে বাজারে হাশেম মোল্লার মুদি দোকানে এসে পৌঁছায়। দেখে, মোল্লার অনুপস্থিতিতে তার আট বছরের মেয়ে দোকানে বসে আছে। মেয়েটি তৃষ্ণার্ত মাজেদের জন্য পানি আনতে গেলে হাশেম মোল্লার দোকানের ক্যাশবাক্সের দিকে দৃষ্টি যায় মাজেদের। আর তখনই তার মনে হয়, এই টাকার বাক্সটি হস্তগত করতে পারলেই নিমেষে তার সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে। মাজেদের মনের মধ্যে তখন যে ভাবনাগুলো খেলা করে যায় সেগুলো এরকম–

> টাকা! শাহেরবানুকে একান্ত আপন করিয়া লইতে বিলম্ব হইবে না, তাহাকে হারাইবার দুশ্চিন্তা থাকিবে না, দারিদ্র্য ঘুচিবে, ধার-কর্জ শোধ করিয়া বন্ধক জমি ছাড়াইতে পারিবে, কাছারির পেয়াদা নালিশের ভয় দেখাইবে না, সম্পদ আসিবে, চাই কি হাশেমের মতো এই একটা দোকান – জাজ্বল্যমান ভবিষ্যৎ যেন তাহার চোখ ঝলসাইয়া দিল।[১]

অভাবের তাড়নায় জর্জরিত ও দিশেহারা মাজেদের মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় হয়। অভাবই তাকে বাধ্য করে চৌর্যবৃত্তিতে নিয়োজিত হতে। শুধু চৌর্যবৃত্তিই নয়, তার এই অপরাধের কথা যাতে প্রকাশ না হয় সেজন্য উপায়ান্তর না দেখে মাজেদ যে ঘটনা ঘটায় সেটি দারিদ্র্যের কশাঘাতে বিপর্যস্ত মানবেতর জীবনের একটি মর্মান্তিক উদাহরণ। দোকানের বাটখারাটি দিয়ে শিশুটির মাথায় আঘাত করার পর ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচার তাগিদে একটি পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। আর সেখানেই শিশুটির পিতার কোঁচের আঘাতে

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'শাহেরবানু', *শাহেরবানু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

জীবন দিতে হয় তাকে। নির্মম নিয়তির ইচ্ছায় মাজেদের মত সাধারণ মানুষের জীবনতৃষ্ণা কীভাবে নির্বাপিত হয় তারই একটি সকরুণ বর্ণনা রয়েছে গল্পটির শেষ অংশে–

> যে চক্ষু এই কিছুক্ষণ আগেও শাহেরবানুর স্বপ্ন দেখিয়াছে তাহার একটা কোটরাগত এবং অন্যটা একটা কোঁচের ফলার মাথায় বসিয়া যেন মাজেদেরই নিস্পন্দ দেহটার দিকে জিজ্ঞাসার মত তাকাইয়া ছিল; এবং তাহারই গা বহিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত চুয়াইয়া পড়িতেছিল। কাঁদিতেছিল কি?[১]

'ইতিকথা' (*শাহেরবানু*) গল্পেও অভাবজনিত কারণে দাম্পত্য কলহ এবং নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এই গল্পের হোসেন সহজ-সরল নির্বিরোধ চরিত্র। সংসারে তার দৈন্যদশা। অথচ নিশাচর করিম, ডাকাত মদন মাঝি, আতাহার মুন্সী, জবান খাঁ-দের জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অন্ত নেই। দারিদ্র্য-জর্জরিত সংসারের টানাপড়েনে ক্লিষ্ট হোসেনের স্ত্রী জরিনাও একসময় স্বামী হোসেনকে চৌর্যবৃত্তিতে প্ররোচিত করে। কেননা, জরিনা মনে করে, 'ভালমানুষীতে মরণ ছাড়া গতি নাই।' জরিনার প্ররোচনায় চৌর্যবৃত্তি শুরু করলেও অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকে হোসেন। তার বিবেক ও নীতিবোধ তাকে প্রতিনিয়ত তাড়িত করে। আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত হোসেনকে সাহস যোগায় তার স্ত্রী জরিনা। চুরির মত গর্হিত অপরাধকেও এক ধরনের বৈধতা প্রদানের চেষ্টা থেকে জরিনা বলে –'চোর কে না? শুধু করিমের নাম কেন? গু খায় সব মাছে, নাম পড়ে পাঙাসের। গ্রামের মাতব্বরেরা কী করে?' (পৃ. ২৩)। এক পর্যায়ে হোসেনেরও ভাবনালোকে পরিবর্তন আসে। তারও মনে হয়, 'কীই বা পুণ্য-পাপ! অসৎ নয় কে?' আর ন্যায়-অন্যায়ের এসব জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে নিজের আহত বিবেককে শান্ত রাখার চেষ্টা করে হোসেন।

'কেরায়া নায়ের মাঝি' (*শাহেরবানু*) গল্পে দরিদ্র কেরায়া মাঝি আজহার। স্ত্রী জমিলা এবং দুই পুত্র ও এক কন্যা নিয়ে তার দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন। নৌ-পারাপার ছাড়াও 'ধুলোট কৃষির সময় সকাল সন্ধ্যা খাটুনি, একা একা জোঁকের কামড় খেয়ে বর্গাক্ষেতে বীজ বুনোনো, চাই বুনে মাছ ধরা, হাটে বিক্রি করা' ইত্যাদি নানা কাজ করে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করে আজহার। তার সন্তানেরাও খাল-বিল থেকে শাপলা তুলে সেগুলো হাটে বিক্রি করে। কিন্তু তাতেও অভাব মেটে না; দারিদ্র্যের ব্যাপ্তি আরও বেড়ে যায়। গল্পের এক পর্যায়ে

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

দেখা যায়, আজহারের ছোট ছেলে কাশেম অবস্থাসম্পন্ন মুন্সীবাড়ির শসার মাচা থেকে একটি ছোট শসা ছিঁড়েছে বলে তাকে প্রহার করে সে বাড়ির ছোট মিয়া। এ ঘটনায় সংসারের ঘানি টানতে টানতে ক্লান্ত-বিপর্যস্ত জমিলার খেদোক্তি–

> পোলাগো খাওয়াইতে পারবা না, হেরা এরডা ওরডা যাইয়া ধরবে, এর দুয়ারে চাইবে ফ্যান, ওর দুয়ারে খুদ। কেউ কিছু না দিলে খাওনিয়া জিনিস পাইলে খাইবে আবার হেইয়ার উপরে যদি খায় অন্যায় মাইর, তউ তুমি কিছু কইতে পারবা না? ... কয়দিন ধইরা পেটে ভাত পড়ে না খেয়াল আছে? ... কিছু কইতে পারবা না, খাইতেও দেতে পারবা না, তয় জন্ম দেছেলা ক্যা?[১]

এমতাবস্থায় জ্বর, আমাশয়ে ভোগা অসুস্থ শরীর নিয়েই আজাহার মাঝি কেরায়া বাইতে বেরিয়ে পড়ে সন্তানদের জন্য চাল-ডালের সংস্থান করতে। কিন্তু প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে নৌকাতেই তার মৃত্যু হয়।

'পৌষ' (*শাহেরবানু*) গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে দরিদ্র তাজুর মর্মন্তুদ জীবনচিত্র। ফসলের উৎপাদন ভালো না হওয়ায় অনাগত ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় তার মন ভারাক্রান্ত। তদুপরি হলধর চক্রবর্তীর সুদের টাকা শোধের তাগাদাও তাকে বিচলিত করে। তাই তাজু হিসেব কষতে থাকে – ধান বিক্রির টাকায় হলধর চক্রবর্তীর কর্জ শোধ করবে, নাকি সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করবে! গল্পের শেষে দেখা যায়, অভাবের যাঁতাকলে পিষ্ট তাজু উচিত-অনুচিতের বোধ হারিয়ে হলধর চক্রবর্তীর সহচর হাকিমের গলা চেপে ধরে নিজের অব্যক্ত ক্রোধ প্রশমনের চেষ্টা করে। পরিণতিতে তার শেষ সম্বল ভিটেমাটি হারাতে হতে পারে এটা জেনেও বুকের মধ্যে জমে থাকা পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রকাশে পিছপা হয় না তাজু।

'শেষ প্রহর' (*শাহেরবানু*) গল্পে দেখা যায়, দরিদ্র কৃষক হোসেন বিয়ে করে 'চোর' নামে খ্যাত আজহারের কন্যা রাবেয়াকে। বিয়ের কিছুদিন যেতে না যেতেই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে তার অভাব আরো বেড়ে যায়। সর্বগ্রাসী অভাবের করাল ছোবলে হোসেনের সুখ-শান্তি উধাও হয়ে যায়। অভাবের বিধ্বংসী ও বিনাশী থাবায় হোসেনের নীতি-নৈতিকতায় ধস নামে। পারিবারিক দ্বন্দ্ব কলহ এবং স্ত্রীর প্ররোচনায় হোসেন

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'কেরায়া নায়ের মাঝি', *শাহেরবানু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩

নিজেও এক পর্যায়ে যোগ দেয় চৌর্যবৃত্তিতে। অবশেষে অভাব-অনটন ও দাম্পত্য কলহের জের ধরে হোসেনের স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়। পরিবার-পরিজন হারিয়ে এক পর্যায়ে হোসেন অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং নিঃসঙ্গ জীবনে সেবা-শুশ্রূষার অভাবে মৃত্যুবরণ করে।

'মুক্তি' (*শাহেরবানু*) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র চেরাগ আলী। হতদরিদ্র চেরাগ আলী ঝোঁকের মাথায় জায়গাজমি বিক্রি করে দূরদেশ থেকে বিয়ে করে আনে সুন্দরী জয়তুনকে। একপর্যায়ে তাদের কোল জুড়ে আসে সন্তান। এরই মধ্যে শুরু হল আকাল। অভাবের সংসারে অর্ধাহার-অনাহারে থেকে চেরাগ আলী আর জয়তুনের দিশেহারা অবস্থা; পরিণামে শুরু হয় প্রাত্যহিক দাম্পত্য কলহ। এই কলহ একপর্যায়ে হাতাহাতি-মারামারিতে রূপান্তরিত হয়। সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যেহেতু মূলত গৃহকর্তার আয়-উপার্জনের ওপর নির্ভর করে, সেহেতু সংসারের অভাব অনটনের দায়ভারও বর্তায় গৃহকর্তা চেরাগ আলীর ওপর। স্ত্রীর গঞ্জনা হয়ে দাঁড়ায় তার নিত্যসঙ্গী। অভাবের সংসারে সন্তানের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে না পারার আক্ষেপও সর্বক্ষণ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এমতাবস্থায় দাম্পত্য ও পারিবারিক অশান্তি তীব্র রূপ ধারণ করে একমাত্র সন্তানের অকাল মৃত্যুতে। এই মৃত্যুর জন্য চেরাগ আলীর দারিদ্র্যকেই দায়ী করে জয়তুন। সন্তানের বিয়োগব্যথায় পাগলপ্রায় হয়ে যায় সে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনে কোনোপ্রকার সুখ বা শান্তিই পায় না চেরাগ আলী। অবশেষে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ চেরাগ মিলিটারির দালাল চৈতন দাসের কাছে ৫০ টাকার বিনিময়ে জয়তুনকে বিক্রি করে দেয়। সে মনে করে, এবার বুঝি উদ্ধার পাওয়া যাবে বিষময় এই সংসারজীবন থেকে, মৃত্যু থেকে পাওয়া যাবে নিষ্কৃতি। দারিদ্র্যের যূপকাষ্ঠে এভাবেই বলি হয় চেরাগ আলীর বিবেক ও মূল্যবোধ।

'জোর যার' (*শাহেরবানু*) গল্পেও দারিদ্র্যের কারণে সাধারণ মানুষের স্বপ্নসাধ গুড়িয়ে যাওয়ার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। রহম আলী এক সময়ের সঙ্গতিসম্পন্ন চাষি হলেও বর্তমানে চরম দারিদ্র্যে নিপতিত। তার কন্যা মরিয়মকে গৃহিণী করে ঘরে তুলতে চায় প্রতিবেশী কাজেম আলী। তবে কাজেম আলীর ঘরে বৌ আছে এবং স্বভাবেও সে দুশ্চরিত্র। এমনকি সে 'কুৎসিত ব্যাধি'তে আক্রান্ত বলেও জনশ্রুতি আছে। এ কারণে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে রহম আলী। কিন্তু নিঃসন্তান কাজেম আলীর বিশ্বাস, মরিয়মের মাধ্যমেই

নিঃসন্তান দশা ঘুচবে তার। এজন্যই তাকে স্ত্রী করে ঘরে আনতে মরিয়া সে। এদিকে মরিয়মের বাল্যবন্ধু চালচুলোহীন ফজু মিঞাও মরিয়মকে জীবনসঙ্গিনী করে পেতে চায়। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে তার ঘরে মেয়েকে পাঠাতেও নারাজ রহম আলী। শত প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়েও ফজুর আশা, মরিয়মকে পাশে পেলে হয়তো দারিদ্র্য নামের প্রতিকূলতাকে জয় করতে পারবে সে–

> তোমাকে আমার চাইই মরিয়ম। জানি আমি অতি দরিদ্র, আমার ঘরে তোমাকে নেবার মতো অবস্থা আমার নাই, জানি আমার জীবিকারও কোনো সংস্থান নাই, কিন্তু তুমি যদি আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াও, তবে এই নিষ্ঠুর উদাসীন পৃথিবীকে আমি ভয় করিব না। ভয় করিব না দুঃখের শত সহস্র ছোবলকেও ।[১]

যদিও গল্পের পরিণতিতে দেখা যায়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙনে মা-বাবাসহ সর্বস্ব হারায় মরিয়ম। দুর্যোগের আগে দেখা এক স্বপ্নে দুই প্রেমাকাঙ্ক্ষী কাজেম আলী আর ফজুর মধ্যে ফজুকেই বেছে নেয় মরিয়ম। কিন্তু স্বপ্ন ভাঙতেই নিদারুণ বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় তাকে। তখন আর স্বপ্নের মানুষ ফজুকে নয়, বরং নির্ভরতার প্রতীক কাজেম আলীকেই স্বামী হিসেবে বেছে নেয় মরিয়ম।

'নবমেঘভার' *(দুই হৃদয়ের তীর)*' গল্পের আখ্যানভাগে ফুটে উঠেছে দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামীণ মানুষের জীবনচিত্র। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মাজু মিঞা দরিদ্র সৎ পোস্টমাস্টার। অথচ ছাত্রজীবনে মেধার স্বাক্ষর রেখেছিল মাজু মিঞা। মুসলিম চাষি সমাজে প্রথম 'মেট্রিক পাস' দেওয়া ছেলে সে। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তাকে পড়াশোনার ইতি টানতে হয় পরিবারের ভরণপোষণের প্রয়োজনে। অনেক চেষ্টায় পোস্টমাস্টারের চাকুরি জোগাড় করে দূর গ্রাম দেলদুয়ারে বসবাস শুরু করে সে। শিক্ষিত ছেলে, চাকরি বাকরি এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হবে না ভেবে স্থানীয় এক সচ্ছল ব্যক্তি তার কন্যা মনিরার সঙ্গে বিয়ে দেন মাজু মিঞার। মনিরা ছিল বিলাসী জীবনাচারের প্রতি প্রলুব্ধ। প্রথম কিছুদিন ভালোভাবে কাটলেও মাজু মিঞার আর্থিক দৈন্য এবং মনিরার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে ব্যর্থ হওয়ায় শুরু হয় পারিবারিক কলহ। দিনের পর দিন স্ত্রীর তীব্র বিষোদগার চলে সৎ সহজ-সরল মাজু মাস্টারের ওপর। এক পর্যায়ে স্ত্রী মনিরা সংসার ছেড়ে চলে গেলে সংসারক্ষেত্র থেকে চিরকালের জন্য নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায় জীবনসংগ্রামে পরাস্ত মাজু মিঞা।

---

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'জোর যার', *শাহেরবানু*. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

'সরজমিন' (*পথ জানা নাই*) গল্পে দারিদ্র্য-জর্জরিত লালু খাঁ ও তার পরিবারের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। দরিদ্র বর্গাচাষি লালু খাঁর পরিবারের সদস্যদের কখনো ক্ষুধার অন্ন তো দূরে থাক, শাক-লতাপাতাও জোটে না। অভাবের সংসারে লালুকে জীবনসংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছে তার স্ত্রী জোবেদা। লালুকে গঞ্জনা না দিয়ে নিজেই সামলে নিত ক্ষুধার জ্বালায় ক্রন্দনরত শিশুকে। একদিন ছোট মেয়েটিকে ভাতের থালা সামনে নিয়ে কাঁদতে দেখে এর কারণ জোবেদার কাছে না পেয়ে রাতে ছোট ছেলেটির কাছে জানতে পারে – জোবেদা কীভাবে প্রতিদিন ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে ছোট মেয়েটিকে পানির সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে খাইয়ে শান্ত করে। এরই মধ্যে হঠাৎ চালের দাম বেড়ে গেলে চরম কষ্টে নিপতিত হয় পরিবারটি। ওদিকে অসুস্থ হয়ে পড়ে লালু। এতদিন জোবেদা সন্তানদের শাক-পাতা খাইয়ে কোনরকম দিনাতিপাত করছিলো। কিন্তু 'শেষে একদিন আর জোবেদাকে দেখা গেল না। খুঁজে খুঁজে বিলের জলে পাওয়া গেল তার ভেসে ওঠা লাশ। হাতে এক গোছা কলমীশাক শক্ত করে ধরা'। শুধু জোবেদা নয়, একে এক প্রাণ হারায় তার পরিবারের অন্য সদস্যরাও। তীব্র অন্তর্যন্ত্রণায় দগ্ধ লালুর উক্তি– 'একটা না দুইটা না তিনটা পোলাও আমার এইখানে শুইয়া আছে। খিদা লইয়া, আফছুছ লইয়া – লাখে লাখে! '

'হঠাৎ' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে গ্রামের সহজ-সরল অভাবগ্রস্ত মানুষগুলোর জীবনের শোচনীয় বিপর্যয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে। সুন্দরবন-সন্নিহিত অঞ্চলের দরিদ্র গৃহস্থ এলালদ্দি। স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটে তার। এরই মধ্যে পরিচিত মফেজ আলীর মাধ্যমে কিশোর ছেলে রত্তনের জন্য বন থেকে কাঠ কেটে বিক্রি করার একটি কাজ জোগাড় করে সে। কিন্তু ছেলে রত্তন যখন এ ব্যাপারে আপত্তি জানায়, এলালদ্দি তখন রাগে ফেটে পড়ে। ছেলের উপার্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাওয়ার তীব্র আকুতিই যেন তার এই ক্ষোভের মধ্যে প্রকাশিত হয়। লেখকের ভাষায়–

> ভাবছেলাম এই ফির কষ্ট ঘোচবে, ডাঙ্গর পোলার দৌলতে বুড়াবয়সে মানষে বইয়া বইয়া দুমুঠ খায়, আমার কপালে হেয়া নাই। দেহো তো অবস্থা, খাওয়া জোডে না, কাপড় জোডে না, ওর মায় রইছে কাপড়ের পয়সার অভাবে আধা ন্যাংটা। ওর উচিত না এহোন আমাগো খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা?[১]

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'হঠাৎ', *অনেক দিনের আশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

গ্রামের দরিদ্র মানুষের অধিকাংশেরই 'দিনে আনি দিনে খাই' অবস্থা। এরই মধ্যে কখনো কখনো আরেক দরিদ্র প্রতিবেশী এসে হাজির হয় অতিথি আপ্যায়নের জন্য সামান্য একটু খাবারের অনুরোধ নিয়ে। তখন নিঃস্ব মানুষগুলোর দারিদ্র্যের নির্মমতা ভিন্ন এক মাত্রা লাভ করে। *মজা গাঙের গান* গল্পগ্রন্থের নাম গল্পে হতদরিদ্র বৃদ্ধা বরুজানের গৃহে অতিথি এলে তাকে আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে 'একমুঠ মুড়ি চিড়া'র সন্ধানে ছুটে যায় প্রতিবেশী শেখের বৌ-এর কাছে। কিন্তু বরুজানের কথা শুনে অসহায়-করুণ দৃষ্টি মেলে শেখের বৌ বলে: 'তুমি কী পাগল হইলা! ঐসব জিনিস ঘরে রাখার দিন এখনো থাকলে এই দশা হয়!' দারিদ্র্য-জর্জরিত করুণ জীবনের আরেক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে *পুঁই ডালিমের কাব্য* গল্পগ্রন্থের 'লালবাত্তি' গল্পের দিনমজুর মুজফ্ফরের পারিবারিক কাহিনিতে। স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক পুত্রকে নিয়ে তার পরিবার। কখনো খাল-বিল, নদী-নালা থেকে মাছ ধরে সে মাছ কিছু নিজেদের খাবার জন্য আবার কখনো একটু বেশি ধরতে পারলে সেগুলো বিক্রি করে নিত্যপ্রয়োজনীয় কোনোদ্রব্য ক্রয় করে কিংবা বসত বাড়ির আশপাশ থেকে শাকপাতা সংগ্রহ করে নিত্যদিনের খাবারের ব্যবস্থা হতো। যেদিন যোগাড় করতে ব্যর্থ হতো সেদিন আর চুলা জ্বলতো না। মুজফ্ফরের দারিদ্র্যজীর্ণ গৃহস্থালির চিত্র নিচের বর্ণনায় পরিস্ফুট হয় –

> বৌ প্রাঙ্গণের কোনায় কিছু খুঁদকুড়া সিদ্ধ করতে গিয়ে কিছু শাকপাতা বাছছিলো। তার মাথার উপরে ঝুলছিলো দড়িতে টাঙ্গানো কয়েকটা কাঁটাভরা মাঝের মুড়োর শুঁটকি। তার শুকনো মাইয়ে মুখ দিয়ে যে বাচ্চাটা লতিয়েছিলো সে-ও শুকিয়ে এমন যে গায়ের চামড়া যেন হাড়ের সঙ্গে লেপটে গেছে। [১]

এদিকে ঘরে বিবাহযোগ্য মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু যৌতুকের টাকার অভাবে তাও সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে মেয়েকে শহরে গৃহকর্মীর কাজ করতে পাঠায় মুজফ্ফর। এক পর্যায়ে পরিবারের বাকি সদস্যরাও শহরে চলে যায়। কিন্তু সেখানেও একের পর এক দুর্দশার শিকার হয় পরিবারটি।

সামন্তপ্রভু ও প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্য

আবহমানকাল ধরেই মুষ্টিমেয় প্রভাবশালীর শোষণ-নির্যাতনে নিষ্পেষিত বাংলার পল্লির সাধারণ মানুষ। ক্ষমতাকাঠামোর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ক্ষমতাবান কর্তৃক ক্ষমতাহীনদের শোষণ। শোষণের এই ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে ছলনা, বলপ্রয়োগ, কৌশল কোনোকিছুই বাদ দেয় না প্রভাবশালী মহল। সাধারণ মানুষের

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'লালবাত্তি', *পুঁই ডালিমের কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

অসহায়ত্ব আর নিয়তিনির্ভরতাকে পুঁজি করে শোষণের প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখে সমাজপতিরা। মূলত গ্রামের জোতদার ও মহাজন শ্রেণিই গ্রামীণ মানুষদের নিয়ন্ত্রণকারী। কখনো কখনো বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেও সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নিজেদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা চালিয়ে যায় এসব প্রভাবশালী।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'পৌষ', 'অনেক দিনের আশা', 'সরজমিন', 'পৌষস্বপ্ন', 'কলাবতী', 'কালীদহের তীরে', 'মৌসুম' প্রভৃতি গল্পে গ্রামবাংলার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষদের ওপর সামন্তপ্রভু বা মাতব্বরশ্রেণির দৌরাত্ম্যের নানাদিক উন্মোচিত হয়েছে। এ গল্পগুলোতে দেখা যায়, গ্রামের জোতদার-মহাজন শ্রেণি এবং তাদের দোসরদের অত্যাচারে জর্জরিত গ্রামের সাধারণ দরিদ্র মানুষদের স্বাভাবিক জীবন। সামন্তপ্রভুদের সৃষ্ট দুষ্টচক্রের বেড়াজালে বন্দি দরিদ্র কৃষকরা শত চেষ্টা করেও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হতে পারে না। অসহায় মানুষদের বিপদের সময় টাকা ধার দিয়ে সে টাকা সময়মত শোধ দিতে না পারায় সুদে-আসলে উসুল করা, অন্যায়ভাবে সম্পত্তি দখল, অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে নারী সম্ভোগ, প্রভৃতি অন্যায় আচরণের মাধ্যমে তারা গ্রামের মানুষদের শোষণ করে।

গ্রামের দরিদ্র কৃষকেরা দিনান্ত পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অন্যের জমিতে কিংবা নিজের অল্প জমিতে চাষাবাদ করে 'খন্দে'র সময় যা পায় তা দিয়েই দিনাতিপাত করে। এর মধ্যে সারা বছরের খোরাকি ও খাজনার টাকা শোধ করে নিজেদের অন্যান্য প্রয়োজন মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই দেখা যায়, সারা বছরই তাদের অভাব অনটন লেগে থাকে। যদিও কৃষকেরা সারা বছর অপেক্ষা করে ক্ষেতের ফসল কখন ঘরে আসবে, কিন্তু দেখা যায় ক্ষেতের ফসল বিক্রির টাকায় ঋণ শোধ করতে গিয়ে নিজেদের একান্ত প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো আর মেটাতে পারে না।

'পৌষ' (*শাহেরবানু*) গল্পে দেখা যায়, দরিদ্র কৃষক তাজু অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে পৌষ মাসের। কারণ পৌষমাসে নতুন ধান ঘরে আসবে। কিন্তু সে আশায় ছন্দপতন ঘটে যখন মনে হয়, ফসল বিক্রির সামান্য টাকায় শোধ করতে হবে ধারকর্জ। ফসলের হাতছানির মধ্যেও তাজুর মনে অহোরাত্রি জেগে থাকে

সামন্তপ্রভু হলধর চক্রবর্তীকে অর্থ পরিশোধের তাগাদা। তার আশঙ্কা – 'যে-মানুষ হলধর চক্রবর্তী, কোন দিক দিয়া কোন প্যাঁচ করিয়া অধিকতর এক বিপদে ফেলিবে তাহা ভাল করিয়া খেয়ালও করিতে পারিবে না।'[১] হলধর চক্রবর্তীর মতো শোষকরা শোষণের যে নিগড় তৈরি করেছে তার মধ্যে দরিদ্র কৃষকরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে আবদ্ধ। এই চক্র থেকে কোনোভাবেই যেন তাদের মুক্তি নেই। তাজু মনে মনে আশা করে ধান বিক্রির টাকায় এবার মাকে একটি কাপড় কিনে দেবে। মাকে আর শতছিন্ন তালি দেয়া কাপড় পরতে হবে না। কিন্তু কাপড় কিনবে নাকি ধার শোধ করবে – এই টানাপড়েনে তাজু অস্থির। এজন্যই দেখা যায়, ধান বিক্রি করে তাজু হাট থেকে প্রায় পালিয়েই বাড়ি ফিরছিল, যাতে হলধর চক্রবর্তী বা তার পেয়াদাদের নজরে না পড়ে। কিন্তু ঠিকই হলধর চক্রবর্তী আর তার বশংবদ হাকিম খাঁর চোখে পড়ে যায় সে। 'তাজুর মনে হইল, ক্ষোভে দুঃখে বুঝি বা সে কাঁদিয়াই ফেলিবে।' বাধ্য হয়েই টাকাটা তুলে দিতে হয় তাদের কাছে, কিন্তু হাতের সম্বল টাকাগুলো বাঁচাতে না পারার আক্ষেপ দ্রুতই আক্রোশে রূপান্তরিত হয় এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে হাকিম খাঁকে আক্রমণ করে বসে তাজু। হাকিমও পাল্টা আক্রমণ করে তাজুকে। কারণ তাজুর ধারণা 'হাকিম শয়তানি করিয়া না জানাইলে হয়তো এমন ঘটিত না।' উত্তেজিত মুহূর্তে বেসামাল আচরণ করলেও পরক্ষণেই অনিশ্চিত পরিণতির আশঙ্কা গ্রাস করে তাজুকে। হলধর চক্রবর্তী হয়তো এবার তার ভিটেমাটি গ্রাসের সুযোগ পেয়ে যাবে – এই ভাবনায় দিশেহারা হয়ে পড়ে সে।

একইভাবে খাজনা আদায়ের নামেও চলে কৃষকদের ওপর অত্যাচার। সময়মতো খাজনা আদায় করতে না পারলে সামন্তপ্রভুরা অসহায় দরিদ্র মানুষদের ভিটেমাটিও গ্রাস করে নেয়। তাই খাজনা আদায়, ধারকর্জ শোধ ইত্যাদি নানা চিন্তায় দরিদ্র কৃষক দিশেহারা হয়ে ওঠে। 'শাহেরবানু' গল্পে দরিদ্র মৎস্যজীবী মাজেদের মাকে দেখা যায় সামন্তপ্রভুর পাওনা টাকা পরিশোধ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে; তাঁর ভাষ্যে নিঃসহায় মানুষের চিরন্তন আশঙ্কাই যেন মূর্ত হয়ে উঠে – 'অনেক টাকা বাকী পড়িয়াছে, এখন হইতেই ধীরে ধীরে শোধ করিয়া না দিতে থাকিলে কোন দিন কি বিপদ হইয়া যাইবে, তখন আর উদ্ধারের উপায়ও পাওয়া যাইবে না।'[২]

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'পৌষ', *শাহেরবানু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'শাহেরবানু', *শাহেরবানু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

কৃষিজমি বন্ধক, নগদ টাকা ধার বা নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে সামন্ত শ্রেণি আবহমানকাল ধরে সাধারণ মানুষদের ওপর তাদের অত্যাচারের জোয়াল চাপিয়ে দেয়। 'অনেক দিনের আশা' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পের দরিদ্র, সহায়সম্বলহীন নারী ফুলজানও গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ও ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধি বড়োমিয়ার ইন্দ্রিয়জ লোলুপতার শিকার। ফুলজান বড়োমিয়াকে নানাভাবে প্রত্যাখ্যান করে। তবু নির্লজ্জ বড়োমিয়া 'হাতিনায় বসে পান চায়, তামাক চায়, চোখ নাচিয়ে মশ্‌করার চেষ্টা করে।' অবশেষে নিজের স্বার্থে নয়, বরং নিজের ভালোবাসার মানুষ আয়নদ্দিকে আইনের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই বড়োমিয়ার কাছে নিজের সম্ভ্রম বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয় ফুলজান। কেবল চারিত্রিক স্খলনই নয়, বিবেকহীন এসব মাতব্বর গ্রামের অসহায়, দরিদ্র মানুষকে ঠকিয়ে তাদের জায়গাজমি গ্রাস করে নেয়। 'লোকের জায়গা-জমি গ্রাস করে করেইতো বড়োমিয়া' হয়েছে তারা। নিঃস্বার্থে সাধারণ মানুষদের সাহায্য সহযোগিতা করার মতো উদারতা তাদের চরিত্রের মধ্যে নেই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে ভূমি মালিকানার মধ্যে যে নীতিগত পরিবর্তন ঘটে, তা এদেশের সাধারণ চাষির ঘাড়ে চাপে ভূতের মতো। চাষিদের সম্পত্তির ওপর জমিদারদের খবরদারি, নায়েবের খাজনা আদায়ে জোর জবরদস্তি, আর ফসল ছিনিয়ে নেবার ঘটনায় জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। জনতা ক্ষোভে-কষ্টে দিশেহারা হয়ে ওঠে; কিন্তু বলতে পারে না কিছুই। প্রতিবাদ করলেই জোটে শাস্তি। 'সরজমিন' (*পথ জানা নাই*) গল্পে জমিদারদের অন্যায় অত্যাচারের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে দরিদ্র কৃষক লালু খাঁ-র উক্তিতে–

> খাইটা খুইটা যা ফলাই তার অর্ধেকতো নেয় জমিদার।[১]

> জমিদারের জমি, অর্ধেক ধান তার ঘরে যায়। তার ওপরে খাজনা আছে – ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স আছে। ... জমিদার যে কেডা জানি না। সাতমাইল দূরে নায়েব-এর কাছারী আছে – দেহি কেবল হেরে। নইলে জমিদাররে পাইলে পাও দুহান ধরইয়া জিগাইতাম আমার মতো মানষেরে ঐ জমিডু ছাড়ইয়া দিলে তার দৌলত কমে কিনা।[২]

'পৌষস্বপ্ন' (*অনেক দিনের আশা)* গল্পে তালুকদারের নানামুখী শোষণ ও নির্যাতনের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। দরিদ্র কৃষক মালেক তার স্ত্রী মকুকে সঙ্গে নিয়ে ভাগ্যান্বেষণে শহরে যাওয়ার আগে তালুকদারের

[১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম 'সরজমিন', *পথ জানা নাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

কাছে নিজের জমি বিক্রি করে এবং বসতবাড়ি বন্ধক রাখে। মালেকের মৃত্যুর পর নিঃস্ব অসহায় মকু গ্রামে ফিরে এসে নিজের বাড়িতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে তালুকদারের আবির্ভাব ঘটে। মকুকে স্তম্ভিত করে দিয়ে তালুকদার দাবি করে, মকুর স্বামী মালেক কেবল বাড়ি বন্ধকই নয়, বিক্রিও করে দিয়েছে। তালুকদারের এই দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কোনো উপায় না থাকায় তার সব কথাই নতমস্তকে মেনে নিতে হয় মকুকে। কেবল বাড়ি গ্রাস করেই ক্ষান্ত হয় না তালুকদার। মকুর দিকে সে তার লালসার হাতও বাড়িয়ে দেয়। নিষ্করুণ এই পৃথিবীর অন্যায়, অবিচার আর নির্মম বাস্তবতা মকুকে বিমূঢ় করে দেয়। এরই মধ্যে বন্য শিয়াল গ্রাস করে মকুর কোলের সন্তানকে। তীব্র এই আঘাত মকুকে শোকে স্তব্ধ করে দেয়। এরপর তালুকদার যখন পুনরায় থাবা বিস্তার করে, তখন আর তাকে ঠেকানোর কোনো উপায় থাকে না জীবনযুদ্ধে পরাজিত হতোদ্যম মকুর। বন্য শেয়াল আর মানুষরূপী শেয়ালের থাবায় সর্বস্বান্ত হয়ে যায় মকু।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের অনেক গল্পেই তালুকদারের মতো এরকম বিবেকহীন সামন্তপ্রভুদের দেখা যায়। এরকমই আরেক চরিত্র বৃন্দাবন চক্রবর্তী। 'কলাবতী' (*অনেক দিনের আশা)* গল্পে হিন্দু কলাবতী ও মুসলিম মজিদের মধ্যে প্রেমসম্পর্ক গড়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে কলাবতী ও মজিদের জীবনে যে দুর্দশা ঘনিয়ে আসে তাতে ইন্ধন জোগানোর মাধ্যমে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার পরিকল্পনা করে বৃন্দাবন চক্রবর্তী। হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাঁধানো, মামলা-মোকদ্দমায় প্ররোচিত করার মাধ্যমে কলাবতীর পিতা সুরেন দাসের সম্পত্তি দখল ও কলাবতীর পরিবারকে সমাজে একঘরে করাসহ নানা কাজের মাধ্যমে বৃন্দাবন চক্রবর্তীর হীন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এক পর্যায়ে কলাবতীর পরিবারের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে সে কলাবতীকে ভোগ করতে চায়। কলাবতীর প্রত্যাখ্যানের পরও সে হাল ছাড়ে না, বরং নানাভাবে প্রলুব্ধ করে লালসা চরিতার্থ করতে চায়।

সামন্ত-জমিদার শ্রেণি তাদের কায়েমি স্বার্থকে রক্ষার প্রয়োজনে কিছু সহযোগীর সৃষ্টি করেছিল। এদের মধ্যে জোতদার-তালুকদার যেমন ছিল, তেমনি ছিল ঠ্যাঙ্গাড়ে লাঠিয়াল বাহিনী, যারা জমিদারের পক্ষে মারপিট থেকে শুরু করে শোষণ-নির্যাতন সবই করতো। জমিদাররা এদের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে যেমন পুরস্কৃত করতো, তেমনি আদেশ পালনে অন্যথা হলে তাদের ওপর শাস্তির খড়্গ নেমে আসতো।

'কালীদহের তীরে' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে এমনই এক কুচক্রী জমিদারের কারণে পাশাপাশি দুটি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং যার পরিণতিতে প্রাণহানিও ঘটে।

জমিদার-জোতদারদের কূটকৌশলে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবদ্ধ হয়ে থাকে দরিদ্র মানুষগুলো, বংশপরম্পরায়ও এ চক্র-শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্তি মেলে না। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় এসব জমিদার গ্রামের মানুষকে বঞ্চিত করে শহরে অধিক মূল্যে চাল বিক্রি করে সম্পদের পাহাড় গড়েছে। অন্যদিকে গ্রামের কৃষক, শ্রমিক – যাদের হাত দিয়ে এসব ফসল উৎপন্ন হয়, তারা না খেয়ে মরেছে। এ ধরনের বিবেকবর্জিত নির্মম সামন্তপ্রভুর প্রতিভূ 'মৌসুম' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পের দ্বারিকানাথ দত্ত চৌধুরী। জমিদারদের প্রভাব ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হলেও দ্বারিকানাথ বরাবরই চালিয়ে গেছে তার নির্মম শোষণ-নির্যাতন। মূলত শহরে অবস্থান করলেও প্রায়ই গ্রামে আসে দ্বারিকানাথ। সময়ের পরিবর্তনে গ্রামবাসীর কাছ থেকে আগের মতো সমীহ না পাওয়ার কারণে দ্বারিকানাথ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে গ্রামের প্রতিবাদী যুবক রমানাথ ও তার পিতা সখানাথের ওপরই তাঁর ক্ষোভ বেশি। গ্রামের মানুষ এখন দ্বারিকানাথের পরিবর্তে সখানাথের কথাই শোনে, এটিই তাঁকে সবচেয়ে বেশি পীড়িত করে। তাই শহরের ক্ষমতাশালী মহলের সঙ্গে নিজের সুসম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে চালের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সখানাথদের দুর্দশাকে প্রলম্বিত করার পরিকল্পনা করেন তিনি। সখানাথের উদ্দেশে দ্বারিকানাথের স্বগতোক্তি তাঁর সামন্তসুলভ মানসিকতারই পরিচায়ক–

> মৌসুম না হয় পেয়েছোই, কিন্তু বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গেই আসবে যে আকাল কোন পুঁজি দিয়ে তাকে ঠেকাবে! আমার স্টক করা চালের দাম তখন চড়চড় ক'রে আরো বেড়ে যাবে। তখন কার দুয়ারে মাথা কোটো দেখবো না![১]

যুগ যুগ ধরে সামন্তপ্রভুদের হাতে নিষ্পেষিত হলেও সময়ের পরিক্রমায় নির্যাতিত সাধারণের মধ্যেও একসময় গড়ে ওঠে সচেতনতা। শিক্ষার বিস্তার, যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রভাব ইত্যাদি নানা কারণ এর পেছনে বিদ্যমান। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব প্রতিবাদ ছিল বিচ্ছিন্ন,

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'মৌসুম', *অনেক দিনের আশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

অপরিকল্পিত ও সাময়িক। কোনো সমন্বিত আন্দোলনের মাধ্যমে এসব প্রতিবাদ না করার কারণে এর কোনও সুদূরপ্রসারী ফল অর্জিত হয়নি। গবেষকের ভাষায় –

> দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী যারা গ্রামাঞ্চলে বাস করতো এবং অধিকাংশই ছিল কৃষক শ্রেণীর, তারা ছিল দারিদ্র্য ও অশিক্ষায় নিমগ্ন। যুগ যুগান্তকালের নিপীড়ন ও দুঃসহ জীবন তাদেরকে করে তুলেছিল কিছুটা অদৃষ্টবাদী; কিন্তু কোনো কোনো সময় অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে তারা বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্রোহ করেছে...।[১]

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের গল্পে গ্রামের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের এই প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। 'মৌসুম' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে জমিদার দ্বারিকানাথ দত্ত চৌধুরীর শোষণের শিকার গ্রামের সাধারণ মানুষ। অতীতে খুব সহজেই সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যেতে পারলেও এখন সময় পাল্টেছে। উঠতি মাতব্বর সখানাথ আর পুত্র রমানাথের প্রতিবাদী অবস্থানের কারণে দ্বারিকানাথ আর অবলীলায় শোষণ-নির্যাতন করতে পারছেন না। পিতা-পুত্রের নেতৃত্বে গ্রামের মানুষদের এই পরিবর্তনের কারণ খুঁজতে গিয়ে দ্বারিকানাথ আবিষ্কার করেন – 'গেল মাঘে কম্যুনিষ্টরা না কারা যেন এসেছিলো, তারা সখানাথের কানে যে মন্ত্রণা ঢেলে গেছে, এসব তারই ফল'। এজন্য সখানাথ ও রমানাথের প্রতি ক্ষুব্ধ হন তিনি। এই ক্ষোভ আরো বেড়ে যায়, যখন সখানাথকে খবর পাঠালেও সে জমিদারকে দর্শন দেয় না; উপরন্তু রমানাথের ভর্ৎসনার শিকার হতে হয় জমিদারের পাইক পেয়াদাকে। এই ঘটনায় ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেও নায়েবের পরামর্শে নিজেকে সামলে নেন দ্বারিকানাথ। শেষে কন্যা অনুসূয়াকে নিয়ে নিজেই চলে যান সখানাথের বাড়ি। কিন্তু জমিদারির সূর্য ততদিনে অস্তগামী। কথাচ্ছলে তিনি যখন সখানাথের উদ্দেশে বলেন যে, জমিদারদের হাতে এখন আর খুব বেশি ক্ষমতা নেই, রমানাথ তখন যুৎসই এক উত্তর দিয়ে দেয় তাঁর মুখের ওপর– 'অনেক ক্ষ্যামতা কর্তা। বাঁচাইতে না পারলেও মারতে তো পারেন।' পরিবর্তনশীল সমাজের এসব সমাচার অসাধারণ ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হয়েছে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের গল্পে।

যুদ্ধ ও মন্বন্তর

[১] সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ, *উনিশ শতকে বাংলার সমাজ-চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন: ১৮১৮-১৮৩৫, (সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ, বেলাল চৌধুরী ও সুব্রত বড়ুয়া অনূদিত)*, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ঢাকা ২০০০, পৃ. ১৬৮

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বাংলার গ্রামগুলো 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়'। বাংলার গ্রামগুলোর দীর্ঘ তমালতরু, আদিগন্ত উদার শস্যক্ষেত আর পদ্মদীঘির কাকচক্ষু জলের মধ্যে নিহিত আছে শান্তির অপার বারতা। কিন্তু শান্তির এই চিরন্তন ঠিকানাতেও কখনো কখনো হানা দেয় দুঃসময়। যুদ্ধ ও মন্বন্তর হচ্ছে এরকমই এক দুঃসময়, গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনকে যা ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও এর প্রভাবে এদেশের মানুষের জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। আর সমকালের বিপর্যস্ত মানবজীবনের করুণ ও হৃদয়স্পর্শী চিত্র সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন সমকালীন শিল্পী-সাহিত্যিক। বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধজনিত ঘটনাবলি নিয়ে রচিত হয়েছে কালোত্তীর্ণ সব গল্প-উপন্যাস।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তর বিষয়ক গল্পগুলোও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। জীবনবাদী লেখক শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর বেশকিছু গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রদর্শনের প্রয়াস পেয়েছেন। বিশেষত বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে সংঘটিত মন্বন্তর, অভাব ও দারিদ্র্য, মূল্যবোধের অবক্ষয় এসবই তাঁর গল্পগুলোতে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট সর্বগ্রাসী অভাবের অন্যতম শিকার ছিল বাংলার দরিদ্র কৃষক। 'শেষ প্রহর' (*শাহেরবানু*) গল্পে মন্বন্তরের প্রভাবে দরিদ্র গ্রামবাসী সর্বগ্রাসী অভাবের তাড়নায় দিশেহারা হয়ে ওঠে। ঘরে সঞ্চিত খাদ্য নিঃশেষিত হবার পর সবাই ধার-কর্জ করে ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করে। চালের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে দ্রুতই নাগালের বাইরে চলে যায়। এ পরিস্থিতিতে হোসেনের মত দরিদ্র মানুষেরা শেষ চেষ্টা হিসেবে চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে অস্তিত্বরক্ষার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়।

'পথ জানা নাই' গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংকটময় পরিস্থিতির জীবনঘনিষ্ঠ চিত্র ফুটে উঠেছে। 'মাউলতলা' নামে বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন প্রান্তবর্তী একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে এ গল্পের আখ্যান। নানা রাজশক্তির উত্থান-পতন, বণিকসভ্যতার স্পর্শ, ইংরেজ শাসনের দৌরাত্ম্য কোনো কিছুই মাউলতলার অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারেনি। কিন্তু শহরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী একটি সড়ক মাউলতলার মানুষদের জীবনে নিয়ে এসেছিল আকস্মিক, সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন। মাউলতলার মানুষ

ভেবেছিল, এ সড়ক তাদের যুক্ত করবে সম্ভাবনার সোনালি আলোয় ভরা শহরের সঙ্গে, তাদের জীবনের অপূর্ণতাগুলোকে ভরে দেবে পূর্ণতার সম্ভারে। তবে দরিদ্র কৃষক গহুরালীর মতোই মাউলতলার মানুষগুলো অনেক মূল্য দিয়ে বুঝলো – পথ সবসময় সৌভাগ্য আর সমৃদ্ধিকেই নিমন্ত্রণ করে আনে না। কোনো কোনো পথ একই সঙ্গে হাতছানি দিয়ে ডেকে আনে দুর্ভাগ্য আর দুঃসময়কেও। সড়কটি নির্মাণের ফলে গ্রামের অভাবগ্রস্ত মানুষগুলো শহরে কর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ পায় ঠিকই, তবে একই সঙ্গে শহরের কুটিলতা আর কূটকৌশলও গ্রামে প্রবেশ করে; স্পর্শ করে মাউলতলাবাসীর সহজ-সরল জীবনকে –'এই পথে শহরের ফৌজদারী দেওয়ানিতেও ছুটোছুটি শুরু হইল ধীরে ধীরে। শাদামাটা সরল জীবনে আসিতে লাগিলো কূটবুদ্ধি আর কৌশলের দড়িজাল।'[১] ক্রমেই মাউলতলার জীবন হয়ে ওঠে জটিল, শঙ্কাগ্রস্ত। শুরু হয় দলাদলি, হানাহানি; ঘটে যায় খুনের মতো ঘটনা। তাই রাস্তার প্রধান উদ্যোক্তা জোনাবালী গ্রামের মানুষদের ভর্ৎসনা করে –'সড়ক কি এয়ার লাইগা বানাইছিলাম আমরা? আকাট মুর্খ জানোয়ারের দল!'। এরই মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা এসে লাগে নির্জন গ্রাম মাউলতলাতেও। দুশো বছরের ইংরেজ শাসনেও যা ঘটেনি এবার তাই ঘটলো এ অঞ্চলে–

> চাল-ডালের দাম বাড়িল। দাম চড়িল সব জিনিসের। কমিল কেবল জীবনের। ধীরে ধীরে এ সড়ক বহিয়াই আসিল মন্বন্তর, আসিল রোগব্যাধি, চোরাবাজার আর দুর্নীতির উত্তাল জোয়ার।[২]

এই জোয়ারে শহর থেকে আসতে থাকে দুর্নীতিবাজ নানা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি, মিলিটারির দালাল। শহর থেকে আসতে থাকা এসব মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় গ্রামের মানুষদের। যার পরিণামে দেখা যায় শহরের সাহেবের বাবুর্চিখানায় কাজ করে যে লুৎফর, তার সঙ্গে আজগরউল্লাহর কন্যা কুলসুম উধাও হয়ে যায়; লড়াই-ফেরত ইউসুফের স্ত্রী কঠিন স্ত্রীরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। ঘটনাচক্রে গহুরালীর স্ত্রী হাজেরাও একদিন উধাও হয়ে যায় মিলিটারির দালালের সঙ্গে। রাগে দুঃখে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে গহুরালী। নতুন রাস্তাটিকেই তার এবং গ্রামবাসীর জীবনের সমস্ত দুর্ভাগ্যের কারণ হিসেবে ধরে নিয়ে কোদাল দিয়ে রাস্তাটিকে কোপাতে থাকে সে। সেই সঙ্গে স্বগতোক্তি করতে থাকে –'ভুল অইছিলো এই

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'পথ জানা নাই', *পথ জানা নাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

রাস্তা বানাইয়া। আমরা যে রাস্তা চাইছেলাম হেয়া এ না; ঠিক অয় নাই।'[১] আর গহুরালীর সঙ্গে পাঠকও উপলব্ধি করে, 'নয়া সড়ক' সবসময় নয়া স্বপ্ন নিয়ে আসে না। জীবনে কোন পথ দিয়ে মোক্ষ লাভ হবে, আর কোন পথ সম্ভাবনার ছদ্মবেশে বুনে দিয়ে যাবে ধ্বংসের বীজ তা আগে থেকে মানুষ জানে না। মানুষের জীবনের এ অনিশ্চয়তা আর সংকটকে নতুন রাস্তার রূপকে মাউলতলা গ্রামকে অবলম্বন করে 'পথ জানা নাই' গল্পে তুলে ধরেছেন কথাসাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম।

যুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও খাদ্য সংকটের কারণে গ্রামের মানুষ অনন্যোপায় হয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে পাড়ি জমায়। আবার অনেককে দেখা যায় সৈন্যদলে নাম লেখাতে। *শাহেরবানু* গল্পগ্রন্থের 'ইতিকথা' গল্পেও গ্রামের অনেক সক্ষম মানুষকে দেখা গেছে সৈন্যদলে নাম লেখাতে শহরমুখী হতে। *অনেক দিনের আশা* গল্পগ্রন্থের নামগল্পে দেখা যায়, আয়নদ্দির মতো সাধারণ গ্রামবাসীর জীবনে কী ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল তেতাল্লিশের মন্বন্তর। একসময় তার আত্মীয়-পরিজন, সহায়-সম্বল সবই ছিলো। কিন্তু 'আকালের বছর অভাব আর মহামারীর ঝাপটে' সবই হারালো। অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার প্রবল বাসনায় নিরুপায় আয়নদ্দি এক পর্যায়ে চৌর্যবৃত্তিকে বেছে নেয় পেশা হিসেবে। এ থেকেই মন্বন্তরের বহুমাত্রিক প্রতিক্রিয়া আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। আমরা বুঝতে পারি, মন্বন্তর এবং তৎপরবর্তী অভাব-দারিদ্র্য কেবল মানুষের মুখের আহারই কেড়ে নেয় না, কেড়ে নেয় মূল্যবোধ আর নীতি নৈতিকতাকেও – যা ধনী-দরিদ্র সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ধনীরা যেমন মন্বন্তরের সুযোগে নিজের আখের আরো ভালোভাবে গুছিয়ে নেয়ার পাঁয়তারা করে, দরিদ্ররাও তেমনি সর্বস্ব হারিয়ে যেনতেনভাবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার এক মরণপণ সংগ্রামে মেতে ওঠে।

'পৌষস্বপ্ন' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে মন্বন্তরের প্রভাব নতুন ব্যঞ্জনা পেয়েছে। এই গল্পের মকু ও মালেক দম্পতি মন্বন্তরের সময় নিজেদের ভিটেমাটি বন্ধক ও বিক্রি করে খাদ্যের অন্বেষণে শহরে পাড়ি জমায়। কিন্তু সেখানেও দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে মুক্তি মেলে না তাদের। যে স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজে শহরে পাড়ি জমিয়েছিল তারা, তা বরাবরের মতোই অধরা থেকে যায়। এক পর্যায়ে করুণ মৃত্যু ঘটে মালেকের।

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

শিশুসন্তানকে নিয়ে পুনরায় ভাগ্যের অন্বেষণে গ্রামে ফিরে আসে মকু। সেখানে ফেলে যাওয়া ঘরের জঙ্গলাকীর্ণ ক্ষতবিক্ষত অবস্থা দেখে আরো অসহায় বোধ করে সে। যে বাড়িতে স্বামীসহ কাজ করত সেই সর্দার বাড়িতেই পুনরায় কাজের সন্ধানে যায় মকু। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সবই বদলে গেছে। একসময় যেখানে ছিল অবাধ বিচরণ, সেখানে এখন তার দুটো কথা শোনারও সময় নেই কারও। গৃহকর্ত্রীর বক্রোক্তি ও প্রত্যাখ্যান মকুর মনকে বিষাদে ভরে তোলে। মন্বন্তরের প্রভাবে গ্রামের অধিকাংশ মানুষেরই অবস্থা সংকটাপন্ন। কেবল যে দরিদ্র শ্রেণিই এর ভুক্তভোগী তা নয় – মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ছাড়া সকলেই মন্বন্তরের যাঁতাকলে পিষ্ট। প্রাসঙ্গিক বর্ণনাংশ লক্ষণীয়–

> সর্বত্রই ঐ একই কথা – উপায় নাই, সাহায্য করিবার কোনো উপায়। নিজেদের সামলাতেই আমরা ব্যতিব্যস্ত। কোথাও যেন তাহার জন্য একটু দয়া নাই।[১]

মন্বন্তরের প্রভাবে তরুণ মনের স্বপ্নসাধ কীভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় তারই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'হঠাৎ' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে। সুন্দরবন সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাসকারী কিশোর রত্তনের হৃদয়ে ঝড় তোলে কুলসুম নামের এক অপরিচিত কিশোরী। দুজনের মধ্যে দ্রুতই গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠতা। কুলসুমকে নিয়ে নানারকম স্বপ্ন-কল্পনার জাল বোনে দরিদ্র কৃষকের সন্তান রত্তন। এরই মধ্যে তার পিতা এলালদ্দি সুন্দরবন থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করার একটি কাজ ঠিক করে রত্তনের জন্য। চল্লিশ টাকা মাস মাইনের আকর্ষণীয় এই কাজের খবর রত্তনের দরিদ্র পিতামাতার মনে আনন্দের ঢেউ তুললেও কুলসুমকে হারানোর আশঙ্কায় রত্তনের মন বিষাদে ছেয়ে যায়। তার মনে হয় – 'চারিদিকে তার স্বপ্নসাধ চুরমার করে দেবার জন্য কী এক ষড়যন্ত্র তৈরী হয়েছে, মনের কোনো সুকুমার কামনা বাসনার প্রতি সহানুভূতি দেখাবে না তারা।' খালের পাড়ে সৌন্দর্যের পসরা সাজানো পলাশ আর মাদারের রঙ তার মনকে কুলসুমের জন্য আকুল করে তুললেও পরিবারের কথা চিন্তা করে নিজের মনকে শক্ত করার চেষ্টা করে রত্তন–

> কিন্তু না। তার কথা ভাববে না আর। এই আকাল ছিন্নভিন্ন করেছে সংসার, কেড়ে নিয়ে গেছে আত্মীয়স্বজন, দুঃখ-কষ্টে ভরে তুলে দুর্বিসহ করেছে জীবন, এমন কী হৃদয়ো তার চাপে চুরমার! এদিনে না মূল্য আছে জীবনের, না ভালোবাসার। [২]

---

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'পৌষস্বপ্ন', *অনেক দিনের আশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'হঠাৎ', *অনেক দিনের আশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

'জীবনের শুভ অর্থ' (*পথ জানা নাই*) গল্পে সাধারণ মানুষের জীবনে মন্বন্তরের ভয়ংকর প্রভাবের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মন্বন্তরের কারণে গ্রাম থেকে দারিদ্র্যপীড়িত অসংখ্য মানুষ ভিড় করেছে শহরের রাস্তায়, অলিতে-গলিতে। ক্ষুধা, অনাহারে পর্যুদস্ত এসব মানুষের কাছে মনে হয়, শহরেই আছে তাদের ক্ষুধা-নিবৃত্তির নিশ্চয়তা। কিন্তু অনাহারে ক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষপীড়িত এসব মানুষ নাগরিক জীবনে কোন্ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে – এমন আশঙ্কায় ভুগতে থাকে শহরের মানুষ। এরকমই একজন ব্যক্তি লোকনাথ দত্ত। গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান লোকনাথ দত্ত এখন বিপুল বৈভবের মালিক। গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা বুভুক্ষু মানুষের স্রোত তাকে বিচলিত করে তোলে। লেখকের বর্ণনায়–

> অম্বিকা চৌধুরীর বাড়ির সামনে ঐ ভয়ানক ভিখিরিদের কী বিতরণ করা হচ্ছে? ফুটপাতের ওপর অমন লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে কোন অমৃতের প্রতীক্ষা করছে ওরা? যেদিকে তাকান – ফুটপাথে, আইল্যান্ডে, দরজাবন্ধ বাড়ীর রোয়াকে রোয়াকে ঐ অদ্ভুত বুভুক্ষু জনতা কোন ফাঁকে পঙ্গপালের মতো এই শহরকে ছেয়ে ফেললো, ভেবে কী এক ভয় তাঁকে বিষণ্ন করে আনলো।[১]

তেতাল্লিশের মন্বন্তরের বিপুল বিস্তৃত থাবা গ্রামের সাধারণ মানুষের সহজ-সরল জীবনযাত্রাকে কীভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে তার চিত্র প্রতিভাত হয়েছে 'বজ্র' (*পথ জানা নাই*) গল্পে। পল্লিবাংলার কৃষিনির্ভর সহজসরল, নিস্তরঙ্গ জীবনব্যবস্থায় চরম আঘাত হানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এর পথ ধরে আসে মন্বন্তর, গ্রামজীবনে দেখা দেয় দারিদ্র্য, অনাহার। কর্মসংস্থানের খোঁজে গ্রামের বাস্তুহারা নিরন্ন মানুষ আশ্রয় নেয় শহরের ফুটপাতে। জীবনধারণের অনিবার্য তাগিদে গ্রামের কৃষক হয় শ্রমিক, অর্থের প্রয়োজনে চাকুরিসূত্রে গ্রাম থেকে ছুটে আসা অসহায় মানুষ নীতিভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়, বেছে নেয় পতিতাবৃত্তির মতো গ্লানিকর জীবন। 'বজ্র' গল্পের সহজসরল পল্লি বালিকা ফুলিও পতিতাবৃত্তির মতো ঘৃণ্য পেশাকে বেছে নিতে বাধ্য হয় জীবনের তাগিদে। মন্বন্তরের থাবা গ্রামের সহজ সরল মানুষের অন্তর্জগতে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের সূচনা করে, তাদের অন্তর্সত্তায় ভাঙন আনে। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আনোয়ারকেও তাই দেখা যায় দেহপসারিণীর গৃহে রাত্রিযাপন করতে। ক্ষণিকের শরীরী আনন্দে নিজের নিঃস্ব হৃদয়ের জ্বালা জুড়ানোর জন্য যে মেয়েকে সে বেছে নেয়, পরদিন ভোরের আলো প্রস্ফুটিত হবার পূর্বে আনোয়ার আবিষ্কার করে সে

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'জীবনের শুভ অর্থ', *পথ জানা নাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

নারী আর কেউ নয়, তারই আদরের ছোটবোন ফুলি। গ্রামের সহজসরল বালিকা ফুলিকে মন্বন্তরে সহায় সম্বল সব হারিয়ে অস্তিত্বের খোঁজে বেছে নিতে হয়েছে পতিতাবৃত্তির মতো পেশা। নিয়তির এই নিষ্ঠুর পরিহাসে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে আনোয়ার। ফুলির মতো হাজারও ফুলির নির্মম ও মর্মন্তুদ কথকতায় 'বজ্র' গল্পটি সমৃদ্ধ।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

বাংলার পল্লি অঞ্চলে প্রধানত হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্মের মানুষ বসবাস করে। এদেশের মানুষ স্বভাবগতভাবে ধর্মপরায়ণ হলেও ঐতিহাসিকভাবেই পরধর্মবিদ্বেষ তাদের মধ্যে ছিল না। বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের দিকে তাকালেও দেখা যায়, যুগে যুগে নানা উত্থান-পতনের মধ্যেও এদেশের গ্রামাঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল। ফলে দেশের ক্ষমতায় যারাই আসীন থাকুক না কেন গ্রামগুলোতে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব তেমন একটা পরিদৃষ্ট হয়নি। হিন্দুদের উৎসব, পালা-পার্বণে মুসলমান কিংবা মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবগুলোতে হিন্দুদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে ধীরে ধীরে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে বিভেদের বীজ উপ্ত হয় এবং এতে ধুরন্ধর ইংরেজদের 'ভাগ কর এবং শাসন কর' নীতি বড় ধরনের প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী সময় থেকে হিন্দু-মুসলিম বিভেদ তীব্র হতে থাকে, যা কখনো কখনো দাঙ্গার মত ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে। 'বিশ শতকের প্রথম ভাগেই দেখি, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে শুধু স্বাজাত্যবোধ নয়, স্পষ্ট চিহ্নিত সাম্প্রদায়িক চেতনায়। এমন সব বিষয় দাবি বা অধিকার হিসাবে নিয়ে আসা হচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের চেতনাকেও স্পর্শ করতে পারে। সম্প্রদায়ের জায়গায় আসছে 'জাতি'র ধারণা।'[১]

দীর্ঘদিনের শোষণ-বঞ্চনার শিকার বাঙালি মুসলিমের মনে স্বাজাত্যবোধ ও সাম্প্রদায়িক চেতনা পুঞ্জীভূত হতে থাকে। তাদের ক্ষোভকে পুঁজি করে মুসলিম জাতীয়তাবাদের চিন্তাকে উস্কে দেন মুসলিম নেতৃবৃন্দ। ফলস্বরূপ ১৯৪৫-এর কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ নির্বাচন ও ১৯৪৬-এর প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে মুসলিম লীগ। এসময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ-এর পরস্পর-বিরোধী অবস্থান দু'টি দলের পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশের মধ্যেও

[১] 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ: বাঙালির জীবন, মনন ও সাহিত্য' *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

বিভক্তির সৃষ্টি করে। সমাজে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটে, জাতিবিদ্বেষী আচরণ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। এরই চরম পরিণতি ঘটে ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ দাঙ্গার মধ্য দিয়ে। এই দাঙ্গা বাঙালি জীবনের এক বিভীষিকাময় অধ্যায়, যা হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনের বিপর্যয় ডেকে আনে। শহরের এসব ঘটনায় ক্রমে গ্রামের মানুষের মানসিক শান্তিও বিঘ্নিত হতে শুরু করল; ফলে ১৯৪২ সালের শেষের দিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ল।[১]

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের গল্পে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিদৃষ্ট না হলেও বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোনো গল্পে দাঙ্গা প্রসঙ্গ এসেছে। 'বাণ' (*পথ জানা নাই*) গল্পে দেখা যায় গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুন্দরলাল নিজের মনের মানুষ ভানুমতীকে পাওয়ার আশায় নিজের অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে সচেষ্ট হয়। এক পর্যায়ে সে অনৈতিক উপায়ে ভাগ্যনির্মাণে উদ্যোগী হয়। এদিকে ১৯৪৭-এর ভারতবিভক্তির পর হিন্দু-মুসলমানের পৃথক আবাসভূমিকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে মারামারি, লুটতরাজ ইত্যাদি সমাজকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। এ দাঙ্গা গ্রামবাংলার সহজসরল মানুষদেরও প্রভাবিত করে। এ গল্পের সুন্দরলালও নিজের ভাগ্য পরিবর্তনে দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে এবং লুটের পয়সায় দারিদ্র্যজীর্ণ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে ভাগ্যান্বেষণে। এক মাস যেতে না যেতেই সে ফিরে আসে বিপুল বিত্ত নিয়ে। লুটপাট থেকে প্রাপ্ত সম্পদ সুন্দরলালের মন-মানসিকতায়ও আনে পরিবর্তন। দারিদ্র্যের আড়ষ্টতা ভেঙে এখন সে দুর্বিনীত ও সাহসী – 'এবারে আর লুকোচুরি নয়, সোজা উঠান পেরিয়ে দাওয়ায় উঠল সে। তাকে আর চেনা যায় না। পায়ে মচমচে নাগরাই। দেহে ধোপদুরস্ত ধুতি পান্‌জাবী।' সে যে দাঙ্গাবাজি করে অর্থসম্পদ আয় করে এসেছে সে কথাটি ভানুমতীর কাছে স্পষ্ট করে না সুন্দরলাল। তারপরও এক পর্যায়ে, পরোক্ষে হলেও ভানুমতীর কাছে সত্যটি প্রকাশ করে ফেলে সে। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কথা ভানুমতী শুনেছে কিনা, সুন্দরলালের এমন প্রশ্নের জবাবে ভানুমতীর বুক টিপ টিপ করে ওঠে–

> দাঙ্গা! হিন্দু-মুসলমানের মারামারি? হ্যাঁ, শুনেছে বই কী ! কোন দেশে মুসলমানরা নিদারুণ অত্যাচার করেছে হিন্দুদের ওপর, হিন্দুরা আবার এই দেশে মুসলমানদের ওপর তার প্রতিশোধ নিয়েছে। ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে

[১] কামরুদ্দীন আহ্‌মদ, *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, প্রথম প্রকাশ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৭০, পৃ. ৫৩-৫৪

তাদের, লুটে নেছে তাদের ঘর ধন-সম্পত্তি। শিউরপ্রসাদ ষণ্ডা প্রভুপাদ তেওয়ারীর সঙ্গে মিলে পাশের গায়ের মুসলমানদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে, তাদের মেরে কেটে সব লুটে এনেছিলো। [১]

তার ভালোবাসার মানুষ সুন্দরলাল বিবেক, ন্যায়নীতি, ধর্মবোধ সব ভুলে গিয়ে প্রতিবেশী মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত করেছে নিজের হাত, তুচ্ছ কিছু ধনসম্পদের লোভে, এটি মেনে নিতে পারে না ভানুমতী। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সে বলে –'মুসলমান যে তোমার পাশের বাড়ির মানুষ, তোমার ভাই, তাকে হত্যা করেছো তুমি?' ভানুমতীর এই প্রতিক্রিয়া থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, হিন্দু ও মুসলিমদের বৃহত্তর অংশই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে মুক্ত ছিল; সাম্প্রদায়িকতার কালিমায় আচ্ছন্ন ছিল বস্তুত সুন্দরলালের মতো স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ।

পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও বিবাদ-বিসম্বাদ

নানারকম টানাপড়েন সত্ত্বেও পল্লির মানুষের মধ্যে বিরাজ করে পারস্পরিক সৌহার্দ্যময় সম্পর্ক। শহরের যান্ত্রিক জীবনে এক মুহূর্তও অন্যের কথা ভাবার সময় নেই কারও, কিন্তু এদিক দিয়ে বাংলার গ্রামগুলো এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এখানেও আছে শত্রুতা, রেষারেষি, পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ। আবার এর পাশাপাশি নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে বিরাজ করে মধুর ও আন্তরিক সম্পর্ক। বিপদে পড়লে একে অন্যের পাশে এসে দাঁড়াতে দ্বিধা করে না গ্রামের মানুষ। 'শেষপ্রহর' (*শাহেরবানু*) গল্পের হাজী সাহেব এমনই একজন মানুষ যাঁর সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায় গল্পের দরিদ্র-অসহায় কৃষক হোসেনের প্রতি তার সহানুভূতিশীল আচরণের মধ্যে। হোসেনের জীবনের নানা দুর্যোগে হাজী সাহেব ছিল তার পরম আশ্রয়। কলেরার প্রাদুর্ভাবে হোসেন পরিবারের সদস্যদের হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়লে হাজী সাহেবই তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, সবসময় পাশে থেকে ভবিষ্যৎ জীবনের চলার পথ দেখিয়েছে। শুধু তাই নয় 'বিবাহের পূর্বে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, টাকা পয়সা সবই তাঁহারই পরামর্শে বাড়িয়া উঠিয়াছিল।' আর তাই হোসেনের কাছে হাজী সাহেব 'খোদারই মূর্তিমান স্নেহাশীষের মতো'। পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতিও তার সৌহার্দ্যসুলভ আচরণের পরিচয় পাওয়া যায়, যে কারণে তার প্রতিও গ্রামবাসীর ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম। তার দয়ার্দ্র হৃদয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন–

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'বাণ', *পথ জানা নাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

পথে বাহির হইলে, যাহার সাথেই দেখা হউক না কেন, থামিয়া দুইদণ্ড কুশল প্রশ্ন করিয়া, দোওয়া করিয়া দ্রুত পদে সম্মুখে আগাইয়া যাইতেন। যাইতেন গাঁয়ের প্রতি ঘরে ঘরে; কাহারো রোগ ব্যাধি হইলে নিজের লেখা তাবিজ টোটকা ঔষধ দিতেন। খবর দিতে হইত না, দেখা যাইত যেন আপন পুত্র কন্যার বিপদ জানিয়া তিনি পথ বাহিয়া ছুটিয়া আসিতেছেন।[১]

'আসা যাওয়ার কথা' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ কাসেম খাঁ আর তার 'মুনিষ' সাদেকের মধ্যে গড়ে ওঠে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, যা মালিক ও শ্রমিকের প্রথাগত সম্পর্কের পরিধি ছাড়িয়ে এক মহত্তর পরিমণ্ডলে উত্তীর্ণ হয়। গল্পে দেখা যায়, সাদেকের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাঠে-বাগানে কাজ করে গৃহস্থ কাসেম খাঁ। আবার কাসেম খাঁর প্রতিনিধি হয়ে একাই ভাটি অঞ্চলে চলে যায় সাদেক, সেখানকার জমি মুনিষদের হাতে বন্দোবস্ত দেয়ার ভারও বর্তায় সাদেকের ওপর। এক পর্যায়ে সাদেক গুটিবসন্তে আক্রান্ত হলে কাসেম খাঁ তাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসে এবং পরিবারের একজন সদস্যের মতোই সেবাশুশ্রূষা করতে থাকে। গ্রামের লোকজন ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত সাদেকের সঙ্গে কাসেম খাঁর এই ঘনিষ্ঠতায় আপত্তি জানিয়ে তাকে 'গুটিঘরে' রেখে আসতে বলে। কিন্তু সাদেকের এই অবস্থায় তাকে দূরে সরিয়ে দেয়নি কাসেম খাঁ। এ প্রসঙ্গে মায়ের উদ্দেশে তার উক্তি–

– বেশী ভয়ের কী আছে মা? ভয় গেরামের মানষে বড়ো ত্যক্ত লাগাইছে – রাখলে ক্যাননা গুটিঘরে লইয়া যায়। জানো মা, আমার কিছুতে ওরে দিয়াইতে ইচ্ছা করে না! কী যে করমু! [২]

দারিদ্র্যের কশাঘাতে জীবন অতিষ্ঠ হলেও বিপদে-আপদে পাড়া প্রতিবেশী-আত্মীয়-স্বজনের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা গ্রামবাংলার মানুষের সহজাত। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত আহার্য যেমন প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের মধ্যে বণ্টন করে দেয়, আবার অনেক সময় নিজেদের দুমুঠো অন্নের সংস্থান না হলেও প্রতিবেশীদের প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শনে পিছিয়ে থাকে না এসব মানুষ। *মজা গাঙের গান* গল্পগ্রন্থের নামগল্পে দরিদ্র বৃদ্ধা বরুজান ও তার প্রতিবেশী ছদু শেখের পরিবারের মধ্যে এমনই সৌহার্দ্যময় সম্পর্কের বর্ণনা পাওয়া যায়। মজা গাঙের গান থেকে সামান্য কিছু মাছ ধরে সেখান থেকে প্রতিবেশিনী

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'শেষপ্রহর', *শাহেরবানু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'আসা যাওয়ার কথা', *অনেক দিনের আশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

বরুজানকেও কয়েকটি মাছ উপহার দেয় ছদু শেখ। আবার বরুজানও ছদু শেখ ও তার স্ত্রীকে সাধ্যমত আপ্যায়নের চেষ্টা করে। লেখকের বর্ণনায়–

> বরুজান তার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখোভাবটা সামলে নিয়ে বলে উঠলো: আয়, আয় ময়না। যা কপালে জুটছে তার দুই-একটা দানা তোরাও মুখে দিয়ে যা।
>
> ছদু শেখও তার স্তব্ধ ভাব ভেঙে হাসিমুখে এগিয়ে এলো; কচুপাতায় মোড়া একটা পুটুলি বাড়িয়ে বললো – ঐ মজা গাঙের কাদার মধ্যে সামান্য কিছু মাছ পাইছিলাম।[১]

গ্রামীণ জীবনে পাড়াপ্রতিবেশী একে অপরের যেমন ঘনিষ্ঠ, তেমনি পরস্পরের সঙ্গে প্রায়ই অহেতুক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে তারা। জমির ভাগবাঁটোয়ারা কিংবা পারিবারিক মর্যাদা নিয়ে একে অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-কলহ গ্রামীণ সমাজের এক চিরপরিচিত চিত্র। এই বিবাদ-বিসংবাদ কখনো ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, আবার কখনোবা এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের; কখনো বা বংশানুক্রমিকভাবে চলতে থাকে। সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও জেদের কারণে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক সময় বংশপরম্পরায় এসব চলতে থাকে। 'কালীদহের তীরে' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে কালীদহের খালের দুই পাশে দুই গ্রাম – পূবকান্দা ও পাঁচআনি। এ দুই গ্রামের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরেই চলে আসছে তীব্র বিবাদ, যার সূচনা সেই জমিদারি আমলে। দুই গ্রামের দুই মাতব্বর আসগর ও করিমের পিতামহ ছিল জমিদারের লাঠিয়াল। জমিদার এদের দুইজনকে সর্দার উপাধি দিয়েছে। এই দুই গ্রামের মধ্যে কোনো শত্রুতা ছিল না। তবে একবার নতুন এক জমিদার প্রজা উৎপীড়নে এই লাঠিয়াল সর্দারদের কাজে লাগাতে চাইলে দুই জনের পিতামহই জমিদারের চাকুরি ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে আসগরের পিতামহ অর্থের লোভে পিছিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জমিদার করিমের পিতামহের জমি কেড়ে নেয় এবং করিমদের গ্রাম থেকে একটি হিন্দু মেয়েকে অপহরণ করে। এ ঘটনা থেকেই দুই গ্রামের মানুষের দীর্ঘস্থায়ী মতবিরোধের শুরু, যা করিম আর আসগরের সময়েও বিদ্যমান। সেই বিবাদ এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে–

> ... এ গাঁয়ের লোক ও-গাঁয়ের পথে হাঁটে না। হাটে বা গঞ্জে পারতপক্ষে সামনাসামনি পড়ে না। যায় না একই নদীতে ইলিশ মাছের দিনে। হাটে বা গঞ্জে এ-গাঁয়ের লোক কোনো জিনিসের দর আট আনা করলে ও-গাঁয়ের লোক তা ডবল দামে কিনে নাকের সামনে দিয়ে উঁচিয়ে নিয়ে যায়।[১]

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'মজা গাঙের গান', *মজা গাঙের গান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কৈলাস সাহার চেষ্টায় দুই গ্রামের বিবাদ ক্রমশ থিতিয়ে গেলেও মাঝে মাঝে তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে সেটি গুরুতর রূপ ধারণ করে। এরই মধ্যে আসগর সর্দারের গরু করিম সর্দারের ক্ষেতের ধান খেয়ে ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার ঝামেলার সূত্রপাত হয়। দ্রুতই সেটি দুই গ্রামের মধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দেয়। লেখকের বর্ণনায়–

> ...দুই চোখে আগুন জ্বেলে অজগরের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে আহত গোরুসহ বাড়ীর দিকে ছুটে চলে গেলো আসগর। ঘরের বারান্দার আড়া থেকে লেজা-ঢাল নামিয়ে উঠোনে লাফিয়ে পড়লো। তারপর নুয়ে মাটির দিকে চেয়ে ডান হাত মুখের কাছে দ্রুত কাঁপিয়ে আ-আ করে একদমে এক প্রচণ্ড ডাক তুলে, ধনুকের ছিলার মতো ছিটকে খাড়া হয়ে জেলাবোর্ডের পথের দিকে ছুটে গেল। সে ডাক শুনে থরথর করে কেঁপে উঠলো মধ্যাহ্নের পাঁচআনি। জোয়ান পুরুষেরা উদ্যত কানে দিক-নিশানা করে হাতের কাছে লেজা-সড়কী যে যা পেলো তাই নিয়ে ছুটে বেরুলো। অনেকদিন পরে ষাট সত্তর জোড়া পায়ের তলায় জেলাবোর্ডের পথের ধুলো উড়লো। পাঁচআনির বাল-বনিতা ঝি-বউদের রক্তস্রোত হিম হয়ে এলো তাদের আকাশ-ফাটানো গাজী-গাজী ধ্বনিতে নিষ্কম্প ভয়ে।[২]

দুর্ভাগ্যক্রমে কৈলাস সাহা বাড়িতে না থাকায় এবার আর এই বিবাদ থামানোর কেউ ছিল না। জেলা বোর্ডের সড়কের দুই পাশে অবস্থান নিয়ে প্রথমে চললো গালিগালাজের তুবড়ি, তারপরই শুরু হয়ে গেল পুরোদস্তুর 'যুদ্ধ'; যার পরিণতিতে করিম সর্দারের 'স্বাস্থ্যসবল সুদর্শন নওজোয়ান' ছেলে জামাল আহত হয় এবং তার করুণ মৃত্যু ঘটে।

ভূসম্পত্তির অধিকার নিয়েই গ্রামের অধিকাংশ বিবাদের সূচনা হয়, যার রেশ থেকে যায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। 'বাঁদর' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কেরামত আলী ও প্রতিবেশী সিকান্দরও বংশানুক্রমিক শত্রুতায় আক্রান্ত, যার উৎস জায়গা-জমি নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ। দু'জনের পূর্বপুরুষের মধ্যে বিরাজমান ছিল ঘোরতর বিরোধ। সবসময় লেগে থাকত ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, মামলা-মোকদ্দমা এসব। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তা ততটা তীব্র না হলেও উভয়পক্ষ থেকেই কথা বলা বন্ধ ও সামাজিক দূরত্ব বিদ্যমান ছিল। যদিও এক পর্যায়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে বিবাদে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা।

---

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'কালী দহের তীরে',*অনেক দিনের আশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

কেরামত আলীর নববিবাহিত বধূর প্রতি কুনজর পড়ে সিকান্দরের। এজন্য কৌশল হিসেবে কেরামতের মন জয়ের চেষ্টা করে সে, আর টোপ হিসেবে ব্যবহার করে জমিজমাকে। কূটকৌশলী সিকান্দার তাই কেরামতকে বলে– 'সত্যি, বাজানে ওখানা মিথ্যা মকদ্দমায় দখল করে নিয়েছিলো। আসুন না- নিন আপনার জমি আপনিই, ঝগড়ার মূল ঘুচে যাক'। পারিবারিক শত্রুতা অনেক সময়ই নর-নারীর সম্পর্কের পথে বাধার দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল তুলে দেয়। এমনই এক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছে 'বাণ' (*পথ জানা নাই*) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মধু। দীর্ঘদিনের পারিবারিক শত্রুতার কারণে প্রতিবেশিনী হেম এর সঙ্গে তার ভালোবাসার সম্পর্ক সার্থক হতে পারেনি। দুই পরিবারের মধ্যে বহুদিনের দ্বন্দ্বের কথা মধুর মায়ের উক্তিতে উপস্থাপিত হয়েছে এভাবে–

> ওরা একেবারে চশমখোর ছোটলোক। তোর বাপে ও মাইয়ার নামই হুনতে পারে না। আজীবন তোর বাপ দাদাগো লগে ওরা শত্রুতা করিয়া আইছে। [১]

সামাজিক দ্বন্দ্ব

সামাজিক ভেদাভেদ বাংলার গ্রামাঞ্চলের আবহমান বৈশিষ্ট্য। স্মরণাতীতকাল ধরেই এদেশের গ্রামাঞ্চলে বর্ণভেদ, আশরাফ ও আতরাফ, ভূ-স্বামী ও ভূমিহীন, ধনবান ও নির্ধনের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান। সময়ের পরিক্রমায় এই দ্বন্দ্বের প্রকোপ হয়তো সামান্য বেড়েছে বা কমেছে, কখনো বা পরিবর্তিত হয়েছে এর চরিত্র ও মাত্রা; কিন্তু মোটের ওপর সামাজিক এই ভেদাভেদ সবসময়ই ছিল। সাধারণভাবে বংশমর্যাদা ও ভূ-সম্পদের বিচারেই সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস নির্ণায়িত হলেও পেশা, শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক যোগাযোগ ইত্যাদিও প্রভাব ফেলে। কৃষিনির্ভর বাংলার পল্লি অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী। গ্রামের বেশির ভাগ জমির মালিক কোনো না কোনো ভূস্বামী, যারা বর্গাচাষিদের মাধ্যমে জমিগুলো চাষ করায়। ঐতিহাসিকভাবেই ভূস্বামী ও সাধারণ কৃষকশ্রেণির মধ্যে আছে দ্বন্দ্ব। নিজেদের কায়েমি স্বার্থকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে এই দ্বন্দ্বকে লালন-পালন করে ভূস্বামীরা। তাদের চোখে ক্ষুদ্রচাষিরা হলো নিম্নশ্রেণির মানুষ, যাদের সঙ্গে প্রভু ও সেবকের বাইরে আর কোনো সম্পর্কের কথা চিন্তাও করতে পারে না। পল্লিবাংলার চিরন্তন শ্রেণিবিভাজনের চিত্র পাওয়া যায় গোপাল হালদারের মন্তব্যে – 'সাধারণ ক্ষুদ্র ভূ-স্বামী ও কৃষক অবশ্যই দেশে সংখ্যায় বেশি ছিল। কিন্তু শূদ্র পর্যায়ের ভূমিহীন সেবকজাতীয় কৃষিজীবী ও

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'বাণ', *পথ জানা নাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

কারুজীবীরা (হালিক, জালিক, ডোম, বাগদী, শবর প্রভৃতি: তারা কেউ কেউ ভূমিজ অন্ত্যজ, প্রাচীনতম, উপজাতীয় বংশধর) ছিল অনাচরণীয়, গ্রামান্তেবাসী (এখনকার মতোই), এবং নিতান্ত হীনাবস্থা; অবশ্য তারাই ছিল উৎপাদনের প্রধান বাহন।'[১]

বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে স্মরণাতীতকাল ধরে বিরাজমান এই শ্রেণিভেদ জীবনশিল্পী শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ছোটগল্পগুলোতে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ধরা পড়েছে। 'ক্ষুধা' (*অনেক দিনের আশা)* গল্পে অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান হাশেমের ছোটবেলার খেলার সাথী অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারের মেয়ে আমেনা। সময়ের পরিক্রমায় তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ককে ছাড়িয়ে অধিকতর অন্তরঙ্গ এক সম্পর্ক গড়ে ওঠার উপক্রম হয়। কিন্তু নিজেদের সামাজিক ব্যবধান সম্পর্কে হাশেম ও আমেনা উভয়েই ছিল সচেতন, এ কারণে এই সম্পর্ককে গভীরতর কোনো রূপ দেয়ার ব্যাপারে উভয়ের মধ্যেই ছিল জড়তা। লেখকের ভাষ্য –

> হাশেমের সঙ্গে তাহার (আমেনা) বিবাহ হয় নাই, হইবার কথাও নয়। হাশেমের বাবা একে বড়ো মানুষ, তার উপর অত্যন্ত রাশভারী মেজাজের – তাহার কল্পনা ছিল ভিনগাঁ হইতে বড়ো ঘরের মেয়ে আনিবার। ছেলের উদাসীনতা দেখিয়া যদিও হাশেমের মা আমেনার কথা তাহাকে বলিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হয় নাই, উল্‌টা ধমক খাইয়াছিল – ঐ চেহারার মাইয়াডা ঘরে আনমু? জানো ওরা কতো ছোটো জাত? [২]

'মৌসুম' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তসমাজের প্রতিনিধি জমিদার দ্বারিকানাথ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে গ্রামের উঠতি মাতব্বর সখানাথ ও তার পুত্র রমানাথের দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে বিরাজমান শ্রেণিদ্বন্দ্বের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। সামন্তসমাজের ক্রমবিলুপ্তির মুখে জমিদারদের দৌরাত্ম্য তখন অনেকটাই ম্রিয়মান হয়ে এসেছে, যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতি ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রভাবে বিশেষত যুবকশ্রেণির মধ্যে সচেতনতার উন্মেষ ঘটেছে। এই চেতনা থেকেই রমানাথ ও তার পিতা জমিদারির জোয়াল ভেঙে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করে সাধারণ মানুষকে, আর এ থেকেই জমিদার

[১] গোপাল হালদার, '*বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা*', দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অরুণা সংস্করণ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ১৪০১, পৃ. ২০
[২] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম 'ক্ষুধা', *অনেক দিনের আশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

দ্বারিকানাথ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে তাদের। জমিদারদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার বিপুল পার্থক্য ধরা পড়ে সখানাথের নিম্নোক্ত খেদোক্তিতে–

> তারা যে চাষা এটা তো নোতুন কথা নয়। ওরা জমিদার, ওদের সুখদুঃখ হাসি-কান্নার সাথে তাদের আসমান-জমিন ফারাক। ওরা এক জাত তারা অন্য। তাদের সর্বনাশেই তো ওদের পৌষমাস। এই তো রীতি। [১]

সাধারণ মানুষের শ্রমে-ঘামেই রচিত হয় শাসকদের ক্ষমতার ভিত্তি। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে এই সাধারণ মানুষকে শোষণ করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে না তারা; তাদের চোখে এসব মানুষ কেবল ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়িমাত্র। আর এ কারণেই, ক্ষমতাবানদের দাসত্ববৃত্তিই হয়ে দাঁড়ায় তথাকথিত নিম্নশ্রেণির মানুষগুলোর একমাত্র কাজ। 'সরজমিন' (*পথ জানা নাই*) গল্পে এ সত্যেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই লেখকের কণ্ঠে–

> দাস ছিলো পুরাকালে; কর্মঃ প্রভুর স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান। রকমফেরে এবার জমির আসল মালিকেরা হোলো প্রজা। তাদেরো কর্ম-ধর্ম মালিকের তুষ্টি। তারপর যুগ-যুগ ধরে এ অন্যায় দাসত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়ে এরা চাষীর দুই গরুর পেছনে আরেক গরুর মতোই চলতে থাকলো। দিল্লীর মসনদে কতো উত্থান-পতন ঘটলো কিন্তু এদের ভাগ্য বদলালো না।[২]

নগরসভ্যতার প্রভাব

ভাগ্যান্বেষণ, কর্মসংস্থান, অধিকতর সুবিধার প্রত্যাশা বা অন্য কোনো কারণে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরাঞ্চলে ভিড় জমায়। গ্রামনির্ভর বাংলার সমাজজীবনে নগরসভ্যতার প্রভাব ব্যাপক ও বহুমাত্রিক। যান্ত্রিক সভ্যতার প্রসারের ফলে নাগরিক জীবনের নানা বৈশিষ্ট্য যেমন গ্রামজীবনে প্রবেশ করেছে, তেমনি নগরের আকর্ষণে গ্রামত্যাগের প্রবণতাও দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। কাজের খোঁজে কিংবা মন্বন্তর ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও গ্রামের মানুষ বিপুল সংখ্যায় শহরমুখী হয়েছে। তবে শহর যে সবসময়ই তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত স্বস্তি এনে দিতে পেরেছে, তা বলা যাবে না। শামসুদ্দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে গ্রাম ও শহরের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নানাভাবে ধরা পড়েছে। ক্রমবিকাশমান নগরসভ্যতার প্রভাবে গ্রামের নিস্তরঙ্গ, শান্তিময় জীবন নানা নেতিবাচক প্রভাবের শিকার হওয়ার বিষয়টিকেই মূলত গুরুত্ব দিয়েছেন লেখক। মন্বন্তরের প্রভাবে গ্রামে

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'মৌসুম', *অনেক দিনের আশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১
[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'সরজমিন', *পথ জানা নাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

অন্নাভাব দেখা দিলে পরিবার-পরিজন নিয়ে নিরুপায় হয়ে শহরে ছুটে যায় গ্রামের মানুষ। সেখানকার লঙ্গরখানাগুলোই তখন হয়ে দাঁড়ায় তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন। এভাবে সাময়িক ক্ষুধানিবৃত্তি ঘটলেও শহরে স্থায়ীভাবে মাথা গোঁজার সুযোগ অনেকেরই হয় না। বাধ্য হয়ে ফের গ্রামের দিকেই যাত্রা করতে হয় তাদের। সেখানে এসে পুনরায় আগের জীবনে ফিরে যাওয়া অনেকের জন্যই হয়ে পড়ে কষ্টসাধ্য, যা কারো কারো জীবনে নিয়ে আসে মর্মান্তিক পরিণতি। 'ক্ষুধা' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পের আমেনা দুর্ভিক্ষের সময় সপরিবারে শহরে চলে যায়। সেখানে তার স্বামী ও পুত্র দুজনেরই মৃত্যু ঘটে বসন্তরোগে। সর্বস্ব হারিয়ে হতাশ, বিষণ্ন আমেনা ফিরে আসে গ্রামে। ভেবেছিল আগের মতোই ধান ভেনে, ঝরা-ধান কুড়িয়ে কোনোরকমে দিনাতিপাত করবে। কিন্তু দেখা গেল, নগরসভ্যতার প্রভাবে এখানেও তার জন্য হতাশাজনক এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কৃষিকাজে যান্ত্রিক উপকরণের ব্যবহারের কারণে এখন আর আমেনার মতো কৃষিশ্রমিকদের কোনো চাহিদা নেই। গল্পের প্রাসঙ্গিক বর্ণনাংশ–

> কিন্তু যে বাড়িতে বরাবর ধান ভানিত, সেখানে গিয়া শুনিল যে তাহারা যতোটা সম্ভব নিজেরা এবং বাকিটা ঝালকাটির কলে ভানাইতেছে, সুতরাং এবারে তাহাদের কোনো লোকের প্রয়োজন নাই।[১]

একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল 'পৌষস্বপ্ন' গল্পের মকুও। সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের আশায় স্বামী-সন্তান নিয়ে শহরে গিয়েছিল সে। সেখানে গিয়ে অকালে স্বামীকে হারিয়ে গ্রামে এসে সে দেখে, যন্ত্রের দাপটে তার চেনা জীবিকাই এখন হুমকির সম্মুখীন। যেখানে সে ধান ভানত সেই সর্দারবাড়ির বড়োবউয়ের ভাষ্যে পরিবর্তিত সময়েরই চিত্র ফুটে উঠেছে –'আমাদের সব ধান এবার কলে ভানাচ্ছে। ... তাতে খরচা অনেক কম পড়ে। ধান ভানার জন্য এবার আর কাউকে রাখবোনা।'[২]

নগরসভ্যতার প্রভাবে নাগরিক জীবনের নানা উপায়-উপকরণ প্রবেশ করেছে গ্রামে। এতে গ্রামের মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি গ্রামের মানুষের জীবনে এনেছে দ্রুতগতি আর ভাব-বিনিময়ের নতুন সুযোগ। 'নবমেঘভার' (*দুই হৃদয়ের তীর)* গল্পে দেউলদুয়ার গ্রামে স্থাপিত টেলিগ্রাফ লাইনের নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়–

---

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'ক্ষুধা', *অনেক দিনের আশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'পৌষস্বপ্ন', *অনেক দিনের আশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

এখন চোখে পড়ে তার-গাছের আকাশ-ছোঁওয়া লোহার খুঁটিটা। সরু দুই গাছি তার মাথায় করিয়া সে অপর পাড়ে আরেক খুঁটিতে পৌঁছাইয়া দিয়াছে; সেখান হইতে বরিশাল-ঢাকা-হিল্লী-দিল্লী কোথায় না তাহার গতি। দিনে-রাত্রে শনশন করিয়া তাহাতে কতো কথাই না বাজে! [১]

'পুঁই ডালিমের কাব্য' গল্পগ্রন্থের 'লালবাত্তি' ও 'কায়কারবার' শীর্ষক দুটি গল্পে পল্লিজীবনে নগরায়ণের প্রভাবের একটি নেতিবাচক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'কায়কারবার' গল্পে দেখা যায় আজাহার মল্লিক নামে এক চড়নদার গ্রামে আসে হোগলা ও ছন কিনে শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তার এই প্রস্তাবে গ্রামের অধিকাংশ মানুষেরই মনঃক্ষুণ্ন হয়। তাদের কেউ কেউ এটি নিয়ে ব্যঙ্গ করতেও ছাড়ে না। আইনদ্দি নামে এক গ্রামবাসীর তির্যক মন্তব্য – 'মাছ গেছে, সাপ গেছে, গেছে ব্যাঙ বান্দর, এইবার ঘাস ধরিয়াও টান পড়ছে। কেন, ঐ শহর-বন্দরের মানুষে এখন বুঝি ঘাসও খাইতে শুরু করছে?'[২] শহরবাসীর বাণিজ্যিক লালসার কারণে গ্রামের চিরায়ত ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তাড়া করে কাউকে কাউকে। ধনু নামে এক বয়োবৃদ্ধের উক্তিতে এই আশঙ্কা প্রতিফলিত হয়–

দেশ হইতে একে একে কলাটা-মুলাটা গেছে, এইটা গেছে সেইটা গেছে, এখন যেটুকু আছে এই দুই মুঠ ঘাস তার বদলায় কী পাওন যাইবে সেইটাও আগে বুঝিয়া লওন দরকার ... হাটে বাজারে বান্দর সাপ গলুই ব্যাঙ কী মাছের খরিদ্দারদের ভিড় তো লাগিয়াই আছে। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখেন একটা গাছও চোখে পড়া ভার। কাঠের ব্যাপারিদের যাওয়া-আসা তবু কমে নাই। সেই যুদ্ধের কালে কী সাপ্লাইর নাম করিয়া সব উঠাইয়া লইয়া যাইতে শুরু করছিলো। কিন্তুক কায়-কারবারের বিষয় আমরা তো তেমন বুঝি সুঝিনা, তাই ভালো দামও ভাগ্যে জোটে না। [৩]

দারিদ্র্যের ছোবল থেকে মুক্তির সংগ্রামে লিপ্ত গ্রামবাসীর কাছে শহর হচ্ছে ইচ্ছেপূরণের এক স্বর্ণালি বন্দর। এ কারণে শহরের জীবন সম্বন্ধে তাদের মনে অনেক অনিশ্চয়তা আর সংশয় থাকলেও শহর তাদেরকে চুম্বকের মতোই আকৃষ্ট করে। দরিদ্র কৃষক মুজফ্ফর ও তার স্ত্রীর কথোপকথনে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়–

: মানুষ তো মানুষ। এখন মাটিও দেখি গাঁও গেরাম থেকিয়া উজার হইয়া যাইতে আছে।

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'নবমেঘভার', *দুই হৃদয়ের তীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
[২] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'কায়-কারবার', *পুঁই ডালিমের কাব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

: হুকায় মনের সুখে টান দিতে দিতে মুজফ্ফর বললো: হইবেই তো। শহর জিনিসটা কী কোনো ক্ষুদ্দুর ব্যাপার-স্যাপার। সেই খানেই তো রাজ-রাজত্ব, শরাফতি-উন্নতি।[১]

আবার একই সঙ্গে গ্রাম থেকে শহরমুখী এই অন্তহীন স্রোতের পরিণতি নিয়েও আশঙ্কায় ভোগে তারা, যা মুজফ্ফরের স্ত্রীর উক্তিতে পরিস্ফুট হয়–

ছোটকালে তো খাল ঝিলের মাছের উপর মালিকানার কথা শুনি নাই। এখন তার মাছ যায় শহরে, গাছপালা কাটিয়া কাঠ-লাকড়িও যায় শহরে, আনাজ-তরকারি, ফল, ফলারি তো যায়ই। এখন চতুর্দিক কাটিয়া কুটিয়া সবই ঐ শহরে নিয়া উঠাইলে একদিন মনে কয় ঐ শহর চারদিকে সাগর লইয়া একটি চরের মতোই ভাসিয়া থাকবে। [২]

গ্রামীণ লোকাচার ও সংস্কার

শহরের তুলনায় গ্রামের সমাজ-সংস্কৃতি এবং লোকাচার ভিন্ন রকম। বিশেষ করে শহরের মানুষের উৎসব-পার্বণ উদ্‌যাপনের সঙ্গে গ্রামের মানুষের উদ্‌যাপনের মাত্রা এবং প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। আবার গ্রামাঞ্চলেও লোকাচারের ভিন্নতা রয়েছে যা প্রকৃতি ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত। 'মানব-সংস্কৃতির যে-কোনো অংশের মত, লোকসংস্কারও ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক প্রভাবের আওতায় পড়ে। সমতলভূমিতে যে লোকসংস্কার গড়ে ওঠে, পাহাড়ী অঞ্চলে তা অচল। উপজাতিসমূহের মধ্যেও লোকসংস্কার ভিন্ন ভিন্ন হয়। ... কিন্তু অনেক সময় এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের, বা এক প্রদেশের মানুষ অন্য প্রদেশের, এমনকি এক মহাদেশের মানুষ অন্য মহাদেশের লোকসংস্কারকে গ্রহণ করে এবং তা নিজেদের মত করে পরিবর্তিত করে নেয়।'[৩] পল্লি জনগোষ্ঠীর লোকাচারের মধ্যে এক ধরনের সহজাত সৌন্দর্য আছে, এতে নেই আনুষ্ঠানিকতার বাড়াবাড়ি। পল্লিপ্রকৃতি যেমন উদার ও উন্মুক্ত, পল্লিবাসীর জীবানাচারও তেমনি উদার। সময়প্রবাহে তাতে কৃত্রিমতার ছোঁয়া লাগলেও গ্রামীণ লোকাচারের বৈশিষ্ট্যগুলো এখনও প্রায় অটুটই আছে। বাংলাদেশে স্থানভেদে লোকাচারের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে বাঙালি সংস্কৃতির প্রবল প্রভাবই লক্ষণীয়। 'এই ভূখণ্ডের প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের জাতিগোষ্ঠীর লৌকিক ও অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার, ধ্যান-ধারণাকে আশ্রয় করে নানা প্রথা-পার্বণ, আচার-

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
[৩] আবদুল হাফিজ, লৌকিক সংস্কার ও মানবসমাজ, প্রথম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৭৫, পৃ. ৭০

উৎসব গড়ে উঠেছে।'[১] ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, বাংলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রাচুর্য না থাকলেও ছিল স্বস্তি, আর ছিল অফুরন্ত অবসর। ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহের সময়টুকু ছাড়া বছরের বাকি সময় আমোদ-প্রমোদ আর গল্পগুজব ছিল তাদের সময় কাটানোর অবলম্বন। তাদের এই অবসর জীবনে বিনোদনের উপাদান হিসেবে নানা উৎসব, অনুষ্ঠান, মেলা যাত্রাপালা-পাঁচালি, কথকতা-গান আর নাচের উৎসবের আয়োজন হতো। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে যেসব লোকাচারের প্রচলন দেখা যায় সেগুলো সাধারণত গ্রামীণ মানুষদের প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকাকেন্দ্রিক। যেমন: জন্মোৎসব, মৃতের সৎকার, বিবাহ-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় রীতি-পদ্ধতি প্রভৃতি। শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের গল্পেও গ্রামীণ লোকাচারের নানা অনুষঙ্গ স্থান পেয়েছে।

ঈদ, পূজা ও নানা ধরনের পালাপার্বণ গ্রামের মানুষের জীবনে আনন্দের উপলক্ষ্য নিয়ে আসে। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ এসব উৎসব আয়োজনে মেতে ওঠে। মুসলমানদের জন্য ঈদ সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। ধনী-দরিদ্র সকলেই সামর্থ্য অনুযায়ী আনন্দস্ফূর্তির মধ্য দিয়ে ঈদ উদ্‌যাপন করার চেষ্টা করে থাকে। 'নবমেঘভার' গল্পে গ্রামের ঈদ অনুষ্ঠানের কথা বলতে গিয়ে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মাজু মাস্টারের ভাবনায় ধরা পড়ে এরকমই একটি চিত্র–

> গাঁয়ের ঈদের আনন্দের আয়ু বড় অল্প। সকালে নামাজ আর 'সিন্নি' খাওয়ার পরেই তারা শেষ হইয়া উবিয়া যায়। আবার নামিয়া আসে সেই চিরপুরাতন দৈনন্দিন গতানুগতিকতা।[২]

সচ্ছল মানুষদের জীবনে ঈদ বা পালা-পার্বণ আনন্দের উপলক্ষ্য হয়ে এলেও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে অনেক সময়ই তা দুঃখের বার্তাও নিয়ে আসে। সাধ্যের অভাবে ঈদ-উৎসব পালন সম্ভব হয়না বেশির ভাগ দরিদ্র মানুষের পক্ষেই; বরং সন্তানদের হতাশাক্লিষ্ট মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে হৃদয়ের গভীরে রক্তক্ষরণ হয় তাদের।

---

[১] ওয়াকিল আহমদ, *লোকসংস্কৃতি* (বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৭), প্রথম প্রকাশ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ.৩১৭

[২] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম 'নবমেঘভার', *দুই হৃদয়ের তীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

নবান্নের সময় গ্রামের প্রতিটি ঘরে ধানকাটা, ধান মাড়াইসহ নানারকম কাজের ব্যস্ততা দেখা যায়। অনেক সময় রাতভর কাজ করে মানুষ। সারাদিন মাঠ থেকে ধান কেটে এনে সন্ধ্যার পর গৃহস্থ, মুনিষ, ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ সবাই মিলে বাড়ির উঠোনে কাজ করে। তাদের টানা কাজের ক্লান্তি কিছুটা দূর হয় কারো মুখে পালা-পুঁথি গান বা গল্প শুনে। অনাবিল আনন্দ নিয়ে তারা সবাই মিলে কাজ করে। 'আসা যাওয়ার কথা' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে এরকমই এক আনন্দমুখর নবান্ন উৎসবের চিত্র ফুটে উঠেছে। যেখানে দেখা যায় 'মুনিষ'দের সঙ্গে নিয়ে বাড়ির মানুষদের রাতভর ধান মাড়ানো, আর তার সাথে আড্ডা ও খোশগল্পের চমৎকার বর্ণনা। একপাশে পানের বাটা নিয়ে বসেছে বাড়ির মেয়েরা, সেখান থেকে পান আসছে কর্মরত মানুষগুলোর কাছে। এভাবে নবান্নের উৎসবমুখর পরিবেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে লেখকের বর্ণনায়।

বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে পল্লি-প্রকৃতির রয়েছে অবিচ্ছেদ্য এক বন্ধন। প্রকৃতির নানা উপাদান এদেশের মানুষের জীবন ও সংস্কৃতিতে স্থান করে নিয়েছে। বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির অনেক উপাদানই তাই প্রকৃতিজাত ও প্রকৃতিনির্ভর। বছরভর প্রকৃতিতে ঘটে চলা নানা পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নানা প্রথা আর রীতিনীতি অনুসরণ করতে দেখা যায় গ্রামবাসীদের। 'বস্তুত লোকাচারগুলি হলো এ দেশবাসীর আজন্মলব্ধ প্রত্যয় ও বিশ্বাসের অঙ্গ। মানবজীবন নানা আশঙ্কা ও ভীতি, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, কল্যাণ ও মঙ্গলচিন্তা ইত্যাদি অভিব্যক্তির মধ্যে আবর্তিত হয়। এর সঙ্গে রয়েছে দৈবশক্তির সহাবস্থান।'[১] দরিদ্র, অসহায়, নিরক্ষর মানুষরা তাদের জীবনের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিজনিত ভয় ও শঙ্কা থেকে লৌকিক, অলৌকিক, নৈসর্গিক শক্তিসমূহকে সমীহ ও তুষ্ট করার চেষ্টা করে। কৃষিপ্রধান বাংলার মাটি উর্বর ও কৃষির উপযোগী হলেও কখনো কখনো প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার কারণে যেমন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির কারণে চাষাবাদ ও ফসলের ক্ষতি সাধিত হয়। এরকম পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের আশায় মানুষের দৈবিক বিশ্বাস ও বৈষয়িক কল্যাণ কামনা থেকেই নানা আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভব। 'অনেক দিনের আশা' গল্পগ্রন্থের 'মৌসুম' গল্পে টানা অনাবৃষ্টির কারণে ফসলহানির আশঙ্কা থেকে বৃষ্টির জন্য নানা রীতি-রেওয়াজ পালন করতে দেখা যায় গ্রামের কৃষকদের। লেখকের বর্ণনায়–

[১] ওয়াকিল আহমদ, *লোকসংস্কৃতি* (বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৭), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭

> শুরু হয় জলের জন্য কতো রকম কান্নাকাটি। ধূমধাম ক'রে এই সেদিন নীলপূজো করেছে, এবার মানে পীরের দরগায় সিন্নি, জনে জনে মানত করে, বাড়ি বাড়ি কীর্তন দেয়, এমনকি মৌলবী ডেকে দল বেঁধে শুকনো ক্ষেতে নেমে মিলাদও পড়ে।[১]

অনাবৃষ্টির সময় যেমন, তেমনি আবার আকস্মিক নানা বিপদের হাত থেকে রেহাই পেতেও গ্রামবাসীকে মিলাদ পড়ানো, দরগায় সিন্নি দেওয়া ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠান পালন করতে দেখা যায়। 'মূলধন' (*শাহেরবানু*) গল্পের দরিদ্র কৃষক মেনাজের জীবনের বেঁচে থাকার অবলম্বন 'মনু' নামের একটি গরু। হঠাৎ গ্রামে মহামারি আকারে দেখা দেয় গো-মড়ক। এ অবস্থায় সন্তালতুল্য মনুকে হারানোর শঙ্কায় মেনাজ পাগলপ্রায়। মনুর কল্যাণ কামনায় তাই মেনাজ মিলাদের আয়োজন করে। 'কয়েকজন বন্ধু মুরব্বি নিয়ে মৌলবীর সঙ্গে কণ্ঠে পরিপূর্ণ জোর আর অসীম ভরসা নিয়ে প্রত্যেকটি পদ আবৃত্তি করে মিলাদ পড়লো মেনাজ। ... মোনাজাতের সময় আকুল অন্তরে সে খোদার কাছে তার মঙ্গলের প্রার্থনা জানালো – মনুকে তুমি আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করো খোদা।[২]

'নবমেঘভার' (*দুই হৃদয়ের তীর*) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মাজু মাস্টারের স্মৃতিচারণায় গ্রামীণ সংস্কৃতির এক চিরন্তন চিত্র – পুঁথিপাঠের আসরের নিম্নরূপ চিত্র পাওয়া যায়–

> তাহার গাঁয়ের মানুষগুলি এক ধরনের কাজ-অকাজের আহ্লাদে পানি-কাদা ভাঙিয়া ভাঙিয়া শ্রান্ত হইয়া আজ দ্বিপ্রহরে কাঁথা মুড়ি দিয়া গল্পের আসর বসাইবে – ধীরে ধীরে অলক্ষ্য পদপাতে সন্ধ্যা নামিয়া আসিলে একটি কুপি জ্বালিয়া চারিধারে ঘিরিয়া বসিয়া জমাইবে পুঁথিপড়ার আসর। সখীসোনা কিংবা শাহ-জামালের কাহিনী। তরুণ-তরুণী অবোধ হইতে চাহিবে, চপল হইবে, বিজনসজ্জায় অজানা আকুতিতে অজ্ঞাত ব্যথাভারে গোঙাইবে।[৩]

পল্লিবাংলার চিকিৎসা কাঠামোতেও অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের প্রতিফলন ঘটেছে যা গ্রামের স্বাস্থ্য পরিস্থিতিকে সঙ্গীন করে তুলেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গ্রামের মানুষ ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ ইত্যাদি লৌকিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় আস্থাশীল। 'লোক-চিকিৎসার মূলে আছে অজ্ঞানতা-প্রসূত নানা প্রকার লৌকিক-

[১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, 'মৌসুম', *অনেক দিনের আশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-৩৯
[২] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, 'মূলধন', *শাহেরবানু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
[৩] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, 'নবমেঘভার', *দুই হৃদয়ের তীর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

অলৌকিক বিশ্বাস ও অন্ধ সংস্কার। জাগতিক নিয়ম ও বস্তুর কার্য-কারণ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে মানুষ আত্মবিশ্বাস হারিয়ে দৈবের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং বাহুবল অপেক্ষা দৈববলের সাহায্যে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে।'[১] এদেশের লোক-চিকিৎসার পাঁচটি ধারা গবেষকদের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে, যেগুলো হচ্ছে: পূজার্চনা ও মানত উৎসর্গ, মন্ত্রতন্ত্র ও লোকাচার পালন, ভেষজ ঔষধ প্রয়োগ, খনিজ দ্রব্য ও পাথর ধারণ এবং প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নির্মিত ঔষধ প্রয়োগ।[২] আধুনিক চিকিৎসার অভাবে মহামারি, শিশুমৃত্যু ইত্যাদি পল্লিবাংলার নিয়মিত ঘটনা। এছাড়া চিকিৎসা তথ্যের অপ্রতুলতা ও ভুল ধারণার কারণে সাধারণ রোগব্যাধিও প্রায়ই ভয়ংকর রূপে দেখা দেয়।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'আসা যাওয়ার কথা' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে গুটিবসন্তের কারণে গ্রামীণ জীবনে সৃষ্ট আশঙ্কা ও অস্থিরতার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষিশ্রমিক সাদেকের গায়ে 'বসন্তের স্ফোটক' দেখা দিলে তার নিয়োগকর্তা কাসেম খাঁ সহানুভূতিপরায়ণ হয়ে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। কিন্তু বসন্তের রোগীর প্রতি কাসেম খাঁর এই আন্তরিক আচরণ গ্রামের মানুষের ক্ষোভ ও আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিণতিতে –

> কাসেমের বাড়ীতে লোকজনের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেলো। হিতৈষীরা দূর থেকে উপদেশ ছুঁড়তে লাগলেন – ও রোগ বড়ো সাংঘাতিক, কাসেম খাঁ! ওরে সরাও, নইলে গ্রাম উজাড় অইয়া যাইবে। কেউ কেউ বললেন – তুমি যা হয় একটা কিছু করো, নইলে পুলিশে খবর দিমু – গুটিঘরে লইয়া যাও।[৩]

অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও অসচেতনতার কারণে অসুস্থ একজন মানুষের সেবা-শুশ্রূষা তো দূরের কথা, বরং সমাজের কাছে সে অস্পৃশ্য বলে পরিগণিত হয় – যা রোগীকে মানসিকভাবে আরো দুর্বল করে দেয়। তাছাড়া গুটিঘরে নেয়ার যে প্রক্রিয়া সেটিও অত্যন্ত অমানবিক, যা রোগীর রোগ নিরাময়ের পরিবর্তে তাকে আরো শোচনীয় অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়। রোগীকে গুটিঘরে নেয়ার বিবরণ থেকেই সেটি স্পষ্ট–

[১] ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭
[৩] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, 'আসা যাওয়ার কথা', *অনেক দিনের আশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫

গুটিঘর! সাজির মধ্যে ভরে চারদিক মশারী ঘিরে বাঁশে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যায় যেখানে। বরিশাল শহরে একবার দেখেছিল কাসেম খাঁ। আগে আগে ঠনঠন করে ঘণ্টা বাজিয়ে একটা লোক যাচ্ছে – আর দুটো লোক বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই মশারী ঘেরা ঝুড়িটা। যেতে যেতেই তো রোগী মরণের মুখে অর্ধেক এগিয়ে যায়![১]

নারীর সামাজিক অবস্থান ও নারী নির্যাতন

পুরুষতান্ত্রিকতার যূপকাষ্ঠে নারীর আত্ম-বলিদানের ইতিহাস মানবসভ্যতার সমান্তরাল। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই দৈহিক শক্তিতে এগিয়ে থাকার সুবাদে নারীর ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে পুরুষ। 'বাহুবল এবং উপার্জনের ক্ষমতা দিয়ে পুরুষরা চিরকালই নারীদের শাসন করে এসেছেন। তাছাড়া, ধর্মীয় অনুশাসন দিয়েও পুরুষরা নারীদের হীনাবস্থাকে স্থায়ী করে রাখতে চেষ্টা করেছেন।'[২] সংসারের সবার ভালোমন্দের প্রতি দৃষ্টি রেখে, নিজের সমস্ত চাওয়া-পাওয়াকে বিসর্জন দিয়ে দিনরাত মুখ বুঁজে পরিশ্রম করে যান নারী; তবু উঠতে বসতে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ছাড়া আর কিছুই তাদের ভাগ্যে জোটে না। ঘরে বাইরে নানারকম মনোদৈহিক নির্যাতনের শিকার হন তারা। শহরের নারীদের তুলনায় গ্রামের নারীদের অবস্থা বেশি শোচনীয়। ঘরে বাইরে কোথাও তাদের নির্যাতনের প্রতিবাদ করারও সুযোগ নেই। গ্রামে নারী নির্যাতনের স্বরূপও বিচিত্র। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, পাচার ইত্যাদির পাশাপাশি আছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি সর্ববিষয়ে বৈষম্য ও বঞ্চনা। গবেষকের ভাষায়–

> উনিশ শতকের পূর্বে বাংলার ঐতিহ্যবাহী পিতৃতান্ত্রিক যৌথ পরিবারে নারীদের ভূমিকা ছিল গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ। এই প্রথা দীর্ঘকাল কঠোর লিঙ্গবৈষম্য ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। ঘনিষ্ঠজনের সঙ্গে নারীর সামাজিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকরণ দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম-বিভাজন এর বৈশিষ্ট্য। পরিবারে পুত্র ও কন্যার ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা, অবস্থান, ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করার শিক্ষা প্রদান করা হতো। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে পুত্রসন্তানকে সেই পরিবারের স্থায়ী সদস্য হিসেবে প্রশিক্ষিত করে তোলা হতো। অন্যদিকে, কন্যাসন্তানকে পরিবারের স্বল্পকালীন সদস্য হিসেবে দেখা হতো, কারণ কন্যাসন্তানকে বিবাহের পর স্বামীর বাড়ি চলে যেতে হতো।[৩]

এদেশের সুদীর্ঘকালের অপরিবর্তনীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোতে কিছুটা পরিবর্তন আসে উনিশ শতকে, যখন ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবে সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ব্যক্তিজীবনে নানাবিধ

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
[২] গোলাম মুরশিদ, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ, অবসর প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৬, পৃ. ২৩২
[৩] বিলকিস রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

পরিবর্তনের সূচনা হয়। এ সময় রক্ষণশীলতার দুর্গ ভেঙে নারীকে 'মানুষ' হিসেবে দেখার একটি চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, যাতে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের সংস্কারমূলক কর্মোদ্যোগ বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। তবে এই ধারাটিও ছিল কলকাতা-কেন্দ্রিক; বাংলার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে তার সরাসরি প্রভাব সেভাবে পরিলক্ষিত হয়নি, যদিও বিশ শতকে সর্বত্রই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কিন্তু এই পরিবর্তনের গতি যে বেশ দ্রুত ও সর্বব্যাপী তা বলা যায় না।

মানবদরদী সাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম তাঁর 'ইতিকথা', 'মুক্তি', 'কলাবতী', 'দুর্যোগ' প্রভৃতি গল্পে নারীর মানবেতর সামাজিক অবস্থান এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি বহুমাত্রিক নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেছেন। পুরুষ কর্তৃক নারীর অবমূল্যায়ন, নারীব্যবসা, অসহায় দরিদ্র নারীদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ক্ষমতাবান পুরুষদের নারীলোলুপতা প্রভৃতি বিষয় তাঁর গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। গ্রামের পুরুষসমাজের একটি বড় অংশই স্ত্রীকে জড়বস্তু হিসেবেই গণ্য করে। এ কারণে যখন-তখন স্ত্রীর সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করতেও তাদের বাধে না। অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও তারা স্ত্রীসহ পরিবারের নারী সদস্যদের প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। 'ইতিকথা' (*শাহেরবানু*) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হোসেন, যে কিনা নিরীহ-ভালোমানুষ বলেই সমাজে পরিচিত, তাকেও দেখা যায় তুচ্ছ কারণেই স্ত্রীর ওপর চড়াও হতে। লেখকের ভাষায়– 'হোসেন তার কথায় বাধা দিয়ে পাগলের মতোই তার চুলের মুঠ ধরে গালে একচড় কশিয়ে দিলোঃ এই হারামজাদী, কারে পাগল কইলি তুই?' (পৃ. ২৭-২৮)

'মুক্তি' (*শাহেরবানু*) গল্পেও দেখা যায় স্বামী চেরাগ আলী পান থেকে চুন খসলেই স্ত্রী জয়তুনের গায়ে হাত উঠায়। অভাব-অনটনে দিশেহারা চেরাগ আলী দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে মাত্র পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে স্ত্রীকে তুলে দেয় মিলিটারির দালাল চৈতন দাসের হাতে। একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে উন্মাদদশাগ্রস্ত জয়তুনকে সন্তানের কাছে নিয়ে যাওয়ার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাতের অন্ধকারে চৈতন দাসের নৌকায় তুলে দেয় চেরাগ আলী। প্রাসঙ্গিক দৃশ্যের বর্ণনায় নারী জীবনের অসহায়ত্বের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে–

: ছেলের কাছে যাবা? গ্যাদারে পাইছি।

: কোথায় ?– ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে জয়তুন। চোখে তার সংশয় না আনন্দ বোঝা যায় না।

চেরাগ আলী বলে: শহরে। দেখতে চাও যদি, তোমাকে এখুনি নৌকা করিয়া রওনা হইতে হবে!

জয়তুন কেঁদে ফেলে: পাওয়া গেছে গ্যাদারে, আমার গ্যাদারে?

: আঃ, কেঁদো না। যাবা তো চল।

কান্না থামিয়ে তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে ওঠে জয়তুন। অসংবৃত বেশ বিন্যস্ত করতে যেয়ে আরো অগোছালো করে ফেলে। বাইরে পা দিয়েই বলে ওঠে: কিন্তু ওগো, কেমন করিয়া যাব? ঘরদুয়ার এই মতো থাকবে?..

চেরাগ আলী শশব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে: আঃ থামো, চুপ করো, চুপ করো, কাঁদলে আর তোমারে নিয়া যাব না।

জয়তুন চুপ করে তখন।[১]

তখনো জয়তুন জানে না তার জন্য কী দুঃসময় অপেক্ষা করছে। পক্ষান্তরে চেরাগ আলী ভাবে 'জীবনে যা অভিশাপ নির্দয়চিত্তে তাকে বর্জন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ... থাক, এবারে মিলেছে মুক্তি। মিলেছে নিঃস্বতা থেকে প্রাচুর্যে যাবার পথ। দুর্ভাগ্যকে দমনের পথ।' নারী জীবনের চরম অবমাননার চিত্রটিই ধরা পড়েছে উপরোক্ত বর্ণনায়। কারণ চেরাগ আলী তার স্ত্রীকে মনে করে অভিশাপ, দুর্ভাগ্যের কারণ। তাই তাকে পুঁজি করেই সে এ দুর্ভাগ্যের হাত থেকে মুক্তি পেতে চায়।

এমনই নির্মম কাজের আরেকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'কলাবতী' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে। মন্বন্তর ও তৎপরবর্তী সময়ের নানা অরাজকতা ও নীতিহীনতার এক নির্মম উদাহরণ নারীব্যবসা। সর্বগ্রাসী দুর্নীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে এক শ্রেণির লোভী, বিবেকহীন মানুষ এ ধরনের ঘৃণ্য কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে। মানবতার চরম বিপর্যয়ের এমন উদাহরণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি হীন দৃষ্টিভঙ্গি ও অসম্মানজনক অবস্থানকেও তুলে ধরে। 'কলাবতী' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পের নামচরিত্র কলাবতীর জীবনের করুণ পরিণতি সমাজে নারীর অসম্মানজনক অবস্থানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মুসলিম যুবক মজিদের সঙ্গে কলাবতীর প্রেমকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, এর পরিণতিতে প্রেমিক মজিদের মৃত্যু এবং সেই অপরাধে কলাবতীর পিতা সুরেন দাসের জেলদণ্ড, সামন্তপ্রভু বৃন্দাবন চক্রবর্তীর ষড়যন্ত্রে কলাবতীর পরিবারের একঘরে হওয়াসহ নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলাবতীর জীবনে একের পর এক দুর্দশা দেখা দিতে থাকে। অভাব-অনটনে জর্জরিত, সমাজের চোখে নিগৃহীত এবং দুর্ভাগ্যের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, 'মুক্তি', *শাহেরবানু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

কলাবতীর জীবনে শেষ আঘাতটি আসে তাদের পরিবারের ছদ্ম-শুভাকাঙ্ক্ষী মহিমের মাধ্যমে। মিলিটারির কনট্রাক্টর এক পাঞ্জাবি শিখের রাঁধুনি হিসেবে চাকুরি জুটিয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়ে কলাবতীকে নিয়ে যায় মহিম। পরিশেষে অর্থের বিনিময়ে কলাবতীকে তুলে দেয় নারী পাচারকারী চক্রের হাতে।

নারী নির্যাতনের আছে নানা মাত্রা ও ধরন; যার মধ্যে শারীরিক ও যৌন-নির্যাতন অন্যতম। গ্রামে একশ্রেণির পুরুষ আছে যারা নারীর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে নিজের কু-উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার চেষ্টা করে। এ ধরনেরই এক দুশ্চরিত্র পুরুষ 'দুর্যোগ' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পের সুন্দর মিঞা তালুকদার। মিলিটারির ঠিকাদারি আর মন্বন্তরের সময় চালের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হয়েছে সুন্দর মিঞা। বিত্তের জোরে রহমানের মতো একজন সহচরও জুটে গেছে তার। সে সুন্দর মিঞার যাবতীয় কুকর্মের সঙ্গী। এ গল্পের অসহায় নারী চরিত্র কাঞ্চনমালা। অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করে কাঞ্চনমালা। নানা প্রলোভন দেখিয়ে কাঞ্চনমালাকে দুর্বল করতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় সুন্দর মিঞা। এক দুর্যোগের রাতে কাঞ্চনমালাকে অপহরণ করে সুন্দর মিঞার ঘরে নিয়ে আসে রহমান, লম্পট সুন্দর মিঞাও তখন সুযোগ পায় তার বহুদিনের কামনা চরিতার্থ করার। এ গল্পে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চরিত্রহীন সমাজপ্রভুর কাছে নারীর অসহায়ত্ব।

নারী যেমন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহুমুখী নির্যাতনের শিকার হয়ে এসেছে, তেমনি নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দৃষ্টান্তও প্রচুর। এই প্রতিবাদ থেকে সবসময়ই যে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জিত হয়েছে তা নয়, কিন্তু অব্যাহত শোষণ নির্যাতনের মুখে কিছু নারীর সোচ্চার প্রতিবাদ একদিকে যেমন নির্যাতকদের কিছুটা হলেও থমকে দেয়, অন্যদিকে নির্যাতনের শিকার অন্যান্য নারীর জন্যও সেটি প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। নির্যাতকশ্রেণি দুর্বিনীত, সংঘবদ্ধ এবং নির্মম। কথায় আছে – দুর্জনের কখনও ছলের অভাব হয় না। তেমনি বাংলার গ্রামীণ সমাজেও নারী নির্যাতকদের আছে নানারকম অস্ত্র। কখনো অর্থের প্রলোভন, কখনো কৌশল, আর এসবে ব্যর্থ হলে বলপ্রয়োগ – যে কোনোভাবেই নিজেদের বাসনা পরিপূরণে তারা সচেষ্ট থাকে। পুরুষের প্রবল প্রতাপের বিরুদ্ধে নারী বরাবরই অসহায়। তবু তারা নির্যাতন প্রতিরোধে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যায়। 'দুর্যোগ' (*অনেক দিনের আশা*) গল্পে দুশ্চরিত্র সুন্দর মিঞার একের পর এক কুপ্রস্তাবে

সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে এক পর্যায়ে কাঞ্চনমালা কীভাবে প্রতিবাদী সত্তায় জাগ্রত হয় তা লক্ষ করা যায় নিচের উক্তির মধ্যে–

> মানে মানে সরে পড়ো তুমি – নইলে সারা গাঁয়ে একথা রটিয়ে দেবো। গাঁয়ের অনেক মেয়ে তোমার হাতে গেছে জানি – আমাকেও সে দলের ভেবো না।[১]

গল্পের শেষে দেখা যায়, সুন্দর মিঞা যখন এক ঝড়বাদলের রাতে রহমান মিঞার মাধ্যমে কাঞ্চনমালাকে অপহরণ করে নিয়ে এসে তার নারীত্বের অবমাননা ঘটায় – বিধ্বস্ত, পর্যুদস্ত কাঞ্চনমালা তখন প্রতিশোধের স্বপ্ন দেখে। লেখকের ভাষায়–

> ঝড়বাদল চিরদিন থাকবে না। সাধ্যমত সুন্দর মিঞা খুঁজুক আজ তার দেহে দুনিয়ার তৃপ্তি; নর্মশ্রান্ত হয়ে ঘুমাক। তারপর জাগবে কাঞ্চন। দেশলাই-এর একটি কাঠিতে এই অন্যায়ের পুরীতে আগুন জ্বেলে বাইরে যেয়ে দুনিয়ার লোককে ডেকে বলবে – দেখো আমাকে। বলো আমি কী করতে পারতাম।[২]

গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা

পল্লিবাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবেই পশ্চাদপদ। এদেশের গ্রামীণ জনবসতিগুলো মূলত গড়ে উঠেছে নদীর ধারে। এ কারণে আবহমানকাল ধরে বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে নদীপথ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'গঙ্গা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র তাদের অসংখ্য শাখা প্রশাখা নিয়ে সারা বাংলাদেশে, বিশেষ করে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে, নদী পরিবহন ও যোগাযোগের প্রশস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিল। ... বর্ধমান, বীরভূম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলি ছাড়া সারা বাংলাদেশে সর্বত্র নদী পরিবহনের বেশ ভালো ব্যবস্থা ছিল। রেনেল লিখেছেন, এমনকি গরমের দিনেও বাংলাদেশের যেকোন স্থান থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরত্বের মধ্যে নদীপরিবহনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হত।'[৩] নদীপথের প্রধান বাহন হচ্ছে নৌকা। গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবেও তাই গান, যাত্রাপালা, শ্লোক, বচন এসবে নৌকার উল্লেখ পাওয়া যায়। নৌকার মাঝিদের ভাটিয়ালি আর গরুগাড়ির চালকদের ভাওয়াইয়া গান এদেশের লোকসংস্কৃতির চিরায়ত ঐতিহ্যের অংশ। নানা রঙের পাল তোলা নৌকায় যাত্রী ও মালামাল

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম, 'দুর্যোগ', *অনেক দিনের আশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
[৩] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, প্রথম প্রকাশ, কে পি বাগচী, কলিকাতা ১৯৮৫, পৃ. ১৯০

বহন করে দূর দূরান্তে চলে যান মাঝিরা। এছাড়া নৌকায় মাল বহন ও ওঠানামার কাজে জড়িত থাকেন একটি জনগোষ্ঠী। গয়না নৌকা, ছিপ নৌকা, কোষা নৌকা, সাম্পান, পানসি, ডিঙি নৌকা ইত্যাদির পাশাপাশি এলাকাভেদে ঘাসি, বাচারি, পাতাম ইত্যাদি নৌকাও চালু আছে। বর্তমানে নদী শুকিয়ে যাওয়া এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে নৌকার প্রচলন আগের তুলনায় কমে গেলেও বাংলার গ্রামীণ জনজীবনে নৌকা এখনও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তবে বর্তমানকালে বৈঠাবাহিত নৌকার তুলনায় ইঞ্জিনচালিত নৌকারই আধিক্য বেশি। বাংলার গ্রামাঞ্চলে স্থলপথে যাতায়াতের জন্য আবহমানকাল ধরে গরুরগাড়িই ছিল প্রধান বাহন। গ্রামাঞ্চলের অতি প্রচলিত এই বাহনটির অস্তিত্ব আধুনিকতার আগমনে প্রায় বিলুপ্তই হয়ে গেছে।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের ছোটগল্পে বাংলাদেশের সমুদ্রবিধৌত দক্ষিণাঞ্চলের পল্লি অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার আন্তরিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। লেখক এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার নানামাত্রিক বর্ণনা তুলে ধরলেও তাঁর গল্পগুলোতে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায় তা আংশিক বা খণ্ডখণ্ড। তাঁর গল্পের পটভূমিকা যেহেতু প্রধানত দক্ষিণবঙ্গের উপকূলীয় এলাকা, সেহেতু তাঁর গল্পগুলোতে যাতায়াতের বাহন হিসেবে নৌকার উল্লেখ পাওয়া যায় প্রচুর। বিশেষ করে নৌকা বা ডিঙি নৌকার উল্লেখ রয়েছে একাধিক গল্পে। এ অঞ্চলের মানুষদের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে নদীপথ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অসংখ্য নদীনালা, খালবিল দ্বারা বেষ্টিত এ অঞ্চলে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি কিংবা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও তারা নৌকা বা ডিঙি নৌকা ব্যবহার করে। ব্যাবসা-বাণিজ্য, আয়-উপার্জন, সামাজিকতা রক্ষা থেকে শুরু করে প্রায় সকল কাজেই এমনকি নানা অনৈতিক কাজেও নৌ পথই তাদের যোগাযোগের প্রধান অবলম্বন।

'ইতিকথা' (*শাহেরবানু*) গল্পের করিম চোরের চৌর্যবৃত্তিতেও দেখা যায় ডিঙি নৌকার ব্যবহার। লেখকের ভাষায়– 'দুপুররাতে ডিঙির সাড়া পাওয়া গেল। নিশীথের অভিযানে হয়তো গ্রামান্তরে চলেছে।' (পৃ, ২২)। আবার স্ত্রীকর্তৃক প্ররোচিত হয়ে চৌর্যবৃত্তিতে নিয়োজিত করিম চোরের অনুসারী হোসেনকেও দেখা যায় রাতের আঁধারে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে নৌকা বোঝাই করে নারিকেল চুরি করে আনতে। এই নৌ পথে

আবার বিচরণ করে কিছু অসাধু মানুষ যাদের অশুভ ছায়া গ্রামের অভাবগ্রস্ত মানুষদের জীবনে ডেকে আনে করুণ পরিণাম। 'মুক্তি' (*শাহেরবানু*) গল্পের চেরাগ আলির স্ত্রী জয়তুন এমনই এক পরিস্থিতির শিকার হয়। চেরাগ আলি অভাব থেকে মুক্তি পেতে স্ত্রী জয়তুনকে সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে নারীব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দিলে এই 'বিশাল গাঙে মিলিটারির মেয়ে সরবরাহের দালাল চৈতন দাসের পানসী রাত্রির জোয়ারে পাল তুলে' জয়তুনকে নিয়ে পাড়ি জমায় শহরের উদ্দেশে।

এ অঞ্চলের অধিবাসীদের যোগাযোগের অন্যতম উপায় নৌ-পথ হলেও সড়ক পথেও তারা হাট-বাজারের উদ্দেশ্যে গঞ্জ কিংবা শহরে যাতায়াত করে। সেক্ষেত্রে সড়ক পথে চলাচলের তেমন কোনো বাহন নেই বললেই চলে তাই তারা বেশির ভাগ সময়ে পায়ে হেঁটেই শহরে যায়। 'শাহেরবানু' (*শাহেরবানু*) গল্পে দেখা যায় মাজেদ মাছ বিক্রির উদ্দেশ্যে দুই হাঁড়ি মাছ বাঁকে ঝুলিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে শহরের পথে। সেই পথ খুব প্রশস্ত নয় বলে অন্য কোনো ধরনের যানবাহন খুব একটা চলে না। শহরের সঙ্গে এ অঞ্চলের সংযোগ পথের বর্ণনা লেখকের ভাষায়–

> গাঙতীরের ধানক্ষেতের গা ঘেঁষিয়া পথ। দুইধারে ঘাস আর ঝোপঝাড়।... পথ কিছুদূর এইভাবে চলিয়া ক্রমান্বয়ে গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দুইপাশে পোঁতা ঝাউয়ের সারি লইয়া শহরে ঢুকিয়াছে।'[১]

এই মেঠো পথ ধরেই গ্রামের মানুষদের পায়ে হেঁটে শহরে যেতে হয় বলে তাদের কষ্ট যেমন হয় তেমনি সময়ও ব্যয় হয় অনেক। ফলে অনেক সময় মাছ বিক্রেতাসহ অন্য ব্যবসায়ীদেরও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। 'বেলা ইতিমধ্যে বেশ বাড়িয়াছে' বলে মাজেদকেও দেখা যায় উদ্বিগ্ন হতে কারণ শহরে পৌঁছাতে সময় বেশি লাগলে রৌদ্রে মাছ মরে যাবার আশঙ্কা আছে। তাছাড়া মৃত মাছের দামও আশানুরূপ পাওয়া যাবে না।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলে জেলা বোর্ডের নতুন সড়ক নির্মিত হলে তাদের সমস্যা কিছুটা লাঘব হয়। 'কেরায়া নায়ের মাঝি' গল্পে দেখা যায় নতুন সড়ক নির্মাণ হতে। এতে এ অঞ্চলের গ্রামবাসীরা অত্যন্ত উপকৃত হয়। সড়কের প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধার নানা বৃত্তান্তও শোনা যায় তাদের মুখে। এ প্রসঙ্গে লেখকের ভাষ্য– 'রাস্তায় চামটা হাটের দূরত্ব চার মাইল অথচ আগে এই নদীনালা খালবিলের দেশে

[১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, 'শাহেরবানু', *শাহেরবানু*, প্রাগুক্ত, প্র. ২

সেখানে যেতে সকাল-সন্ধ্যা লাগতো।' যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির কারণে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের জীবনযাত্রা যেমন সহজ হয়েছে, তারা এর নানা সুফল ভোগ করেছে; তেমনি এর নানা নেতিবাচক প্রভাবও পড়ে গ্রামের মানুষদের জীবনে। নতুন গড়া সড়ক পথ দিয়েই গ্রামে ঢুকে পড়ে নগরকেন্দ্রিক অনৈতিক জীবনাচার, চোরাকারবারী, কালোবাজারী, নারীপাচারসহ নানা অপরাধ যা গ্রামবাসীর নিস্তরঙ্গ জীবনে নিয়ে আসে চরম বিপর্যয়।

গ্রামীণ হাট-বাজার

হাট-বাজার বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের অনিবার্য অনুষঙ্গ। বাজারের অবস্থান স্থায়ী হলেও হাট সাধারণত নির্দিষ্ট দিনে বসে। বিভিন্ন এলাকা থেকে বিক্রেতারা তাদের পণ্যের পসরা নিয়ে হাটে আসে। দুপুর থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতার আনাগোনায় ভরপুর থাকে হাট। পল্লির মানুষের জীবনযাত্রায় হাট-বাজার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে – শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যা নিজ গুরুত্বকে ধরে রেখেছে। খুচরা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের জন্য হাটের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কেউ কেউ নিজের গাছের একটা-দুটো ফল বা বাগানের তরি-তরকারিও হাটে নিয়ে যায়। কেবল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র হিসেবেই নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও গ্রামীণ হাট-বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, গ্রামের হাটগুলোতে জারিগানের আসর বসে, দূর দূরান্ত থেকে গায়েনরা আসে। তাদের গান শোনার জন্য বিভিন্ন গ্রাম থেকে হাটে ভিড় জমায় নানা বয়সের নারী পুরুষ। এসব আসর চলে গভীর রাত পর্যন্ত। গ্রামীণ হাটের বাস্তবসম্মত বর্ণনা রয়েছে গবেষকের লেখনীতে –

> ...ধীরে ধীরে একটা গ্রামীণ হাট প্রতিষ্ঠা পায় এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অনেকেরই রুটি-রুজির সংস্থান হয়ে ওঠে সেই হাট। যেমন এক শ্রেণীর লোক বাঁশ থেকে মাছ ধরার নানা ফাঁদ তৈরি করে বিক্রয় করে, কেউবা নিখুঁত সুন্দর জাল তৈরি করে নিয়ে আসে। আবার মাঝিরা মাছের সারি নিয়ে বসে থাকে, কাছাকাছি কসাই বসে থাকে সামনে মাংস ঝুলিয়ে। আবার জিলিপির রসে পাউরুটি ভিজিয়ে খায় কিছু মানুষ। সামনের পিঁড়িতে বসিয়ে অভিজ্ঞ নাপিত একাগ্রতায় ক্ষুর চালায়।[১]

[১] শফিকুর রহমান, '*বাংলাদেশের গ্রামভিত্তিক ছোটগল্পে জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি*', প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০১৩, পৃ. ১৯

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের বিভিন্ন গল্পের বর্ণনায় হাট-বাজারের সঙ্গে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিবিড় সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে। দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানো এবং উৎপন্ন পণ্য বিক্রির নির্ভরযোগ্য স্থান হিসেবে গ্রাম্যহাটের উল্লেখ আছে অনেক গল্পে। গ্রামের কৃষিনির্ভর পরিবারগুলো তাদের উৎপাদিত পণ্য যেমন– ধান, চাল, ডাল প্রভৃতি হাটে বিক্রি করার অপেক্ষায় থাকে। কেউ কেউ নারিকেল, সুপারি বিক্রি করে, গৃহপালিত গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, হাঁস-মুরগির ডিম কিংবা খালবিল, পুকুর থেকে মাছ ধরে, শাপলা-শালুক তুলে সেগুলো হাটে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত শস্য হাটে বিক্রি করে সেই টাকায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে বাড়ি ফেরে। 'পৌষ' (*শাহেরবানু*) গল্পের তাজুকে দেখা যায় ধান বিক্রির টাকায় কি কি সওদা করবে তার হিসেব কষতে। লেখকের ভাষায়–

> মায়ের একটা কোর্তা হইবে দুই বা তিন টাকা, ধুতি শাড়ি দুই জোড়া অন্তত বারো, আলোয়ান একখানা পাঁচ; তাছাড়া তেল, লবণ ইত্যাদি সওদা আছে। রিজিয়ার জন্য সেইরকম একছড়া মালাও নিতে হইবে।[১]

হাটকে কেন্দ্র করে কেনাবেচার মাধ্যমে গ্রামের মানুষদের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদার পূরণ হয়। একেবারে নিম্নবিত্ত মানুষদের কাছে হাট অর্থ উপার্জনের সুযোগ হিসেবেও কাজ করে। কারণ তাদের উৎপাদিত পণ্য না থাকলেও আশপাশ থেকে সংগৃহীত জিনিস বিক্রি করে হলেও তারা তাদের অতি প্রয়োজনীয় জিনিসের চাহিদা মেটাতে কিছুটা হলেও সক্ষম হয়। 'কেরায়া নায়ের মাঝি' (*শাহেরবানু)* গল্পের হতদরিদ্র কেরায়া মাঝি আজহারের দুই পুত্র হাসেম ও কাসেমকে দেখা যায় পাশের ডোবা থেকে সংগৃহীত শাপলা হাটে বিক্রি করে 'একসের চাল' ও অসুস্থ বাবার জন্য ওষুধ কিনে আনতে। গ্রামীণ সমাজে হাট পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলনের একটি কেন্দ্রস্থলও বটে। তাছাড়া হাটকে কেন্দ্র করে নানারকম বিনোদনমূলক আয়োজনও দেখা যায়। হাটের সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ তথা জারিগানের আসরের কথা উল্লেখিত হয়েছে 'অনেক দিনের আশা' (*পথ জানা নাই*) গল্পে। আয়নদ্দি ও ফুলজান নামে গ্রামের দুই কিশোর-কিশোরীর হাটে জারিগানের আসরে গান শুনতে যাওয়ার বর্ণনার মধ্যে এ-তথ্যের বাস্তবধর্মী স্বীকৃতি রয়েছে–

> সে এক কাণ্ড। বছর চোদ্দ বছর তখন আয়নদ্দির। ফুলজানের দশ।
>
> কোথায় সে শুনে এল হাটখোলায় জারীর আসর বসবে। ফুলজানকে বলল, যাবি শুনতে?

[১] শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম 'পৌষ', *শাহেরবানু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

ফুলজানতো তখনই যায়! অপরিসীম তারো আগ্রহ।

আসর সন্ধ্যায়! বিকেলবেলা দুজনে চুপি-চুপি গায়েনদের দেখতে গেল। কি সুন্দর তাদের চেহারা, কথাবার্তা আর মাথায় বাবরি। দেখা আর ফুরোয় না। গান যখন শুরু হয়, তখন তো আর ওঠার নাম করে না। ফুলজান তো বাড়ির ভয়ে অস্থির। কিন্তু আয়নদ্দি গানে তন্ময়।[১]

গ্রামের মানুষের বৈচিত্র্যহীন জীবনে হাটের গুরুত্ব অপরিসীম। হাট কেবল তাদের কাছে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান নয়, বিনোদনেরও অন্যতম উৎসস্থল। ফলে অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে হাটের কার্যক্রম সংঘটিত হতে দেখা যায়।

[১] শামসুদ্দীন আবুল কালাম 'অনেক দিনের আশা', *পথ জানা নাই*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

উপসংহার

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যের পটভূমি বাংলার গ্রামীণ জনজীবন। শহর কিংবা নগরকেন্দ্রিক বিষয় নিয়ে কিছু গল্প-উপন্যাস রচনা করলেও দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্রসন্নিহিত জনপদের মানুষের সুখ-দুঃখের গাথা রচনাতেই তাঁর শিল্পসিদ্ধি নিহিত। প্রতিকূল বাস্তবতার বিরুদ্ধে লড়াইরত মৃত্তিকাসংলগ্ন মানুষের স্বপ্ন ও সংগ্রাম মূর্ত হয়েছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে। একনিষ্ঠ আন্তরিকতায় দশকের পর দশক ধরে সেই সংগ্রামের গল্পই বলে গেছেন তিনি।

গ্রামীণ জীবন ও প্রকৃতির বহুমাত্রিক বর্ণনা ও বিশ্লেষণে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্য ঋদ্ধ। যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্যভুবনে তাঁর আত্মপ্রকাশ, তা পূরণের জন্য তিনি বরাবরই তাঁর আন্তরিক প্রয়াস নিবেদন করেছেন। স্বদেশ থেকে দূরে রোমের জীবনপরিবেশে তাঁর স্বেচ্ছানির্বাসন দীর্ঘ না হলে কিংবা স্বজনদের কাছ থেকে আরো একটু উৎসাহ পেলে তাঁর সাহিত্যসাধনা আরও সমৃদ্ধ ও ফলপ্রদ হতো। তবে অতৃপ্তি ও অপ্রাপ্তি যতই থাকুক, প্রথম গল্পগ্রন্থ *শাহেরবানু* থেকে শুরু করে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত যে সাহিত্যকীর্তি তিনি রেখে গেছেন সেটিই – যাবতীয় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও – বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামকে স্মরণীয় করে রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

উপন্যাস ও ছোটগল্পের বিশাল ক্যানভাসে তিনি বুনেছেন জীবনের গাথা; সৃষ্টি করেছেন স্মরণীয় নানা চরিত্র। গ্রামবাংলার আলো-হাওয়ায় বেড়ে-ওঠা এসব মানুষ আমাদের অতি পরিচিত। কখনও প্রকৃতি আর কখনও প্রতিকূল জীবন-বাস্তবতার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কায়ক্লেশে টিকে থাকে এসব মানুষ। ভালোবাসা ও ঘৃণা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও আত্মত্যাগ, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের এক অনিঃশেষ দুষ্টচক্রে পরিক্রমণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে এসব মানুষের জীবন। বাংলার মৃত্তিকাসন্নিহিত এসব মানুষের বহুমাত্রিক জীবনসত্য উন্মোচিত হয়েছে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে। বাস্তবতাকে কাছ থেকে নিরীক্ষণ করেছেন তিনি, অতঃপর তা অঙ্কন করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। জীবনসত্যের সঙ্গে

সাহিত্যিক সত্যের মেলবন্ধনে তিনি যা নির্মাণ করেছেন তা হয়ে উঠেছে অনন্যস্বাদী। যার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কথাসাহিত্যে গ্রামীণ জীবনের 'ভালো-মন্দ সকলি' চিত্রিত হয়েছে অতুলনীয় শিল্পকুশলতায়।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম শহরাঞ্চলকে পটভূমি করে কয়েকটি গল্প-উপন্যাস রচনা করলেও পল্লির মাটি ও মানুষকে আশ্রয় করে রচিত সাহিত্যকর্মই তাঁর শিল্পসিদ্ধির প্রধান নিয়ামক। বছরের পর বছর স্বদেশের জল-হাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন ছিলেন তিনি, অথচ কী আশ্চর্য পারঙ্গমতায় তিনি তুলে ধরেছেন বহুদূরে ফেলে আসা সেই গ্রামীণ জনপদের অন্তরঙ্গ জীবনচিত্র। এজন্যই অনুভূতির গভীরতায়, বর্ণনার কুশলতায় দক্ষিণবঙ্গের উপকূলীয় জনপদের মাটির ঘ্রাণ, পাখির কলকাকলি আর প্রান্তিক মানুষের সংগ্রাম তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুমাত্রিক সম্পর্ক, প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল মানুষের জীবন ও জীবিকার টানাপড়েন আর নিয়তিনির্ভর সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম কখনো সূক্ষ্ম আর কখনো বা মোটা দাগে উঠে এসেছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। এ কারণে তাঁর চরিত্রগুলোকে তাদের পরিবেশ ও প্রকৃতি থেকে আলাদা করা দুরূহ। প্রকৃতিরই সন্তান তারা – নিয়তিনির্দিষ্ট এক জীবনপরিধিতে স্বপ্ন আর সম্ভাবনার কঠিন হিসাব মেলাতে যারা প্রতিনিয়ত ব্যস্ত।

বাংলাদেশের ইতিহাসের এমন এক কালপর্বে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের আত্মপ্রকাশ, যখন ব্রিটিশ শাসনের জোয়াল ভেঙে পাকিস্তানি শাসন-শোষণের শৃঙ্খলে বাধা পড়তে যাচ্ছে এদেশের মানুষ। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়ে যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে, তখন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম যৌবনধর্মের জয়গানে মুখর। স্বল্পকাল ব্যবধানে, পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে অনেক বাঙালির মতো স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় তাঁর তরুণ মনও হয়ে উঠেছে বিপন্ন ও বিচলিত। তবে সমকালীন প্রতিকূল রাজনৈতিক বাস্তবতা আপাদমস্তক-অসাম্প্রদায়িক শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যকে ততোটা স্পর্শ করেনি। প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস *কাশবনের কন্যা* (১৯৫৫), কিংবা তারও আগে প্রকাশিত *আলমনগরের উপকথা* (১৯৫৫) থেকে পল্লিবাংলার চিরায়ত জীবনকে আশ্রয় করে কথাসাহিত্য রচনার যে ধারা তিনি সূচনা করেছিলেন, তার তিন দশক পর প্রকাশিত *যার সাথে যার* (১৯৮৬) উপন্যাসেও সেই চেনা পথেই হেঁটেছেন তিনি। দীর্ঘ এ সময়পর্বে দেশ ও জাতির জীবনে নানামাত্রিক যে উত্থান-পতন

ঘটেছে, বিশেষত রাজনৈতিক পালাবদল, তার কোনো পর্ব শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের উপন্যাস ও ছোটগল্পে দৃশ্যায়িত হয়নি। অধিকাংশ উপন্যাসে শোষক ও শোষিত – মোটাদাগে এই দুই ভাগে বিভক্ত গ্রামজীবনের অনাড়ম্বর জীবনচিত্র বর্ণনা করেছেন তিনি। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যপীড়িত জীবন, সাধ ও সাধ্যের টানাপড়েন, শোষকের রক্তচক্ষুর সামনে শোষিত মানুষের অসহায়ত্ব এবং সবশেষে শোষকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সঙ্ঘশক্তির জয় – এই চেনাবৃত্তই তাঁর কথাসাহিত্যের অতিপরিচিত বিষয়। তবে এর বাইরেও পল্লিজীবনের নানা অনুষঙ্গ স্থান পেয়েছে তাঁর লেখায়।

এরকমই একটি অনুষঙ্গ হচ্ছে মানুষ এবং প্রকৃতির দ্বৈরথ। বস্তুত শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যের এক বড়ো অংশ জুড়েই মানুষ ও প্রকৃতির এক অস্থির সম্পর্কের চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। মানুষ প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির নানা ঐশ্বর্যকে অবলম্বন করে সে জীবনসংগ্রামে অগ্রবর্তী হয়। অন্যদিকে এই প্রকৃতিই কখনও কখনও তার আকাঙ্ক্ষাপূরণের পথে অনপনেয় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। *সমুদ্রবাসর* ও *জায়জঙ্গল*–এর মতো উপন্যাসে প্রকৃতির এই দ্বিবিধ রূপেরই দেখা মেলে; যেখানে মানুষকে নিজের উদার বুকে আশ্রয় দিয়ে পরবর্তীকালে আবার নিজেই সে-আশ্রয় ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু তারপরও মানুষ ফিরে ফিরে আসে প্রকৃতিরই কাছে। অনিশ্চয়তা আর নির্ভরশীলতার এ এক অন্তহীন যুগলবন্দি – যার চক্রে নিরবধিকাল বাধা পড়ে আছে পল্লিজনগোষ্ঠী। শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম যে জনপদের জীবনচিত্র এঁকেছেন সেই উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রকৃতির প্রভাব আরও তীব্র এবং প্রত্যক্ষ।

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম এমন এক সময়ের পটভূমিতে তাঁর আখ্যানগুলো রচনা করেছেন যখন সামন্তসমাজের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে নগরনির্ভর বুর্জোয়া সমাজ। সাবেকি অনেক চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণার অবসান ঘটছে, কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হচ্ছে অধিকাংশ মানুষ। সদাচার ও ন্যায়বোধের সনাতন ধারণার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটছে আধুনিক বস্তুবাদী ধারণার। দারিদ্র্যের জোয়াল থেকে মুক্তির লক্ষ্যে শহরে ভিড় জমাচ্ছে গ্রামের ভূমিহীন আর প্রান্তিক মানুষ। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে তাদের; কারণ জমিদার, জোতদার ও গ্রামীণ সমাজপতির রক্তচক্ষু থেকে বাঁচতে গ্রামত্যাগ করে শহরে পাড়ি জমালেও সেখানে আবার ভিন্ন চেহারার

নতুন শোষকের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাদের। গ্রাম বা শহর যা-ই হোক, নিপীড়িত মানুষের সহজ-মুক্তি কোথাও নেই – এসব আখ্যানে এ-বক্তব্যই প্রতিপাদন করেছেন কথাশিল্পী শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। 'পৌষস্বপ্ন', 'লালবাত্তি' ইত্যাদি গল্পে প্রতিবিম্বিত হয়েছে জীবনের এসব চিত্র।

বাংলার উপকূলবর্তী গ্রামীণ জনপদের সাধারণ মানুষের জটিলতাহীন, সহজ-সরল আলেখ্য রচনা করেছেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। প্রকৃতি ও মানবসৃষ্ট শত দুর্যোগ আর দুর্বিপাকের মধ্যেও এসব মানুষের জীবনে চিরন্তন মানবীয় আবেগের ছায়াপাত ঘটেছে। স্বপ্ন দেখা দুরাশা – এটি জেনেও তারা নিরন্তর স্বপ্নের জাল বোনে। যুক্তির বিপরীতে হৃদয়াবেগকে প্রাধান্য দিয়ে আত্মীয়-পরিজনের সান্নিধ্যলাভের জন্য জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে তারা। সামাজিক প্রতিবন্ধকতায় নরনারীর হৃদয়াবেগ, চিরন্তন সমাজসম্পর্ক কীভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে তাও দৃশ্যায়িত হয়েছে শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের কথাসাহিত্যে।

বাংলার সমুদ্র-উপকূলবর্তী জীবন ও জনপদকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন একজন রোমান্টিক শিল্পীর আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে। তাঁর রচিত আলেখ্যগুলোতে প্রায়ই বিরুদ্ধ প্রকৃতির দ্বন্দ্বে জর্জরিত অসহায় মানুষের আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে। এসব মানুষকে নিয়েই সুন্দর আগামীর স্বপ্ন দেখেছেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। এই রোমান্টিক ভাবাবেগ তাঁর কোনো কোনো উপন্যাস বা ছোটগল্পের শিল্পগুণকে যেমন ক্ষুণ্ন করেছে, আবার এই বৈশিষ্ট্যই তাঁকে বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে দান করেছে লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য।

সামগ্রিক বিশ্লেষণে বাংলার উপকূলীয় গ্রামীণ জনাঞ্চলের হৃদয়সংবেদী কথাকার হিসেবেই বিবেচিত হবেন শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম। গ্রামীণ জনজীবনের বাস্তবানুগ বিশ্লেষণে সহজাত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। এ কারণেই যখনই গ্রামকে উপজীব্য করে তিনি গল্প বা উপন্যাস রচনা করেছেন, তখনই তাঁকে মনে হয়েছে সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ। গ্রামের মানুষের নানা অপ্রাপ্তি, বঞ্চনা আর সংক্ষোভ অনায়াস সহজতায় প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর রচনায়। গ্রামবাংলার স্বপ্ন ও সম্ভাবনার কথাকার হিসেবে তাই শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ইতিহাসে সবসময়ই প্রাসঙ্গিক ও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

গ্রন্থপঞ্জি

শামসুদ্‌দীন আবুল কালামের রচনাবলি
(প্রকাশকাল অনুসারে)

গল্পগ্রন্থ

শাহেরবানু	:	প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫, নবযুগ প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৭
অনেক দিনের আশা	:	প্রথম প্রকাশ, ওয়ার্সী বুক সেন্টার, ১০ মাহুৎটুলী, ঢাকা ১৯৪৫
পথ জানা নাই	:	প্রথম প্রকাশ, প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, ৩৯ বাংলা বাজার, ঢাকা ১৯৫৩
ঢেউ	:	প্রথম প্রকাশ, ওয়ার্সী বুক সেন্টার, ১০ মাহুৎটুলী, ঢাকা ১৯৫৩
দুই হৃদয়ের তীর	:	প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৫
মজা গাঙের গান	:	প্রথম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা, মার্চ ১৯৮৭
পুঁই ডালিমের কাব্য	:	প্রথম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা ১৩৯৪
জীবনকাব্য	:	প্রথম প্রকাশ, প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৫৬

উপন্যাস

রাতের অতিথি	:	প্রথম প্রকাশ, দেব সাহিত্য কুটীর, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা ১৯৪১
দুঃখমোচন	:	প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৫
কাকলি মুখর	:	প্রথম প্রকাশ, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা ১৯৪৮
কাশবনের কন্যা	:	পরিমার্জিত জয়ন্তী সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪
আলমনগরের উপকথা	:	প্রথম প্রকাশ, কোহিনূর লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৫৫
আশিয়ানা	:	প্রথম প্রকাশ, জাহাঙ্গীর পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ১৯৫৫
সবাই যাকে করলো হেলা	:	প্রথম প্রকাশ, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা ১৯৫৯
কাঞ্চনমালা	:	প্রথম প্রকাশ, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা ১৯৬১
জায়জঙ্গল	:	প্রথম প্রকাশ, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৭৮
মনের মতো ঠাঁই	:	প্রথম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮৫
সমুদ্র বাসর	:	প্রথম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮৬

যার সাথে যার : প্রথম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮৬

নবান্ন : প্রথম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮৭

কাঞ্চনগ্রাম : প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ১৯৯৮

ঈষদাভাস : প্রথম প্রকাশ, সংগ্রহ ও সম্পাদনা: সৌমিত্র দেব, জয়তী, ঢাকা ২০১৬

কূল-উপকূল : প্রথম প্রকাশ, ঈদসংখ্যা, অন্যদিন, ঢাকা ২০০৫

বয়ঃসন্ধিকাল : প্রথম প্রকাশ, ঈদসংখ্যা, প্রথম আলো, ঢাকা ২০০৬

সহায়ক গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : *কল্লোল যুগ (১৯৫০)*, চতুর্থ প্রকাশ, ডি. এম. লাইব্রেরি, কোলকাতা ১৩৬৬

অচ্যুত গোস্বামী : *বাংলা উপন্যাসের ধারা*, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পাঠভবন, কলকাতা ১৯৬৮

অজয় রায় : *বাঙলা ও বাঙালী*, প্রথম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৩৭৬

অতুল সুর : *বাংলার সামাজিক ইতিহাস*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা ১৯৭৬

অনীক মাহমুদ : *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, প্রথম প্রকাশ, ইউরেকা বুক এজেন্সী, রাজশাহী ১৯৯৫
: *আদি বাঙালি : নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৭

অমলেন্দু সেনগুপ্ত : *উত্তাল চল্লিশ – অসমাপ্ত বিপ্লব*, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৮৯
: *বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, প্রথম প্রকাশ, অক্ষর প্রকাশনী, ৩২ বিডন রো, কলকাতা ২০০০

অরবিন্দ পোদ্দার : *বঙ্কিম-মানস*, গ্রন্থবিতান, প্রথম সংস্করণ, ৭৩ বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা, জুলাই ১৯৫১

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *কালের প্রতিমা*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৯৮
: *কালের পুত্তলিকা*, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০৪

অরুণ সেন (সম্পা.) : *বিভূতিভূষণ : আধুনিক জিজ্ঞাসা*, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি ১৯৯৭

অরূপকুমার দাস (সম্পা.) : *তিতাস-স্রষ্টা অদ্বৈত মল্লবর্মণ : জীবন, সৃজন ও রূপায়ণ*, বামা পুস্তকালয়, কোলকাতা ২০০২

অলোক রায় (সম্পা.) : *সাহিত্য কোষ: কথাসাহিত্য*, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৩

অশোক কুমার দে : *বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

অশ্রুকুমার সিকদার : *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, জুলাই ১৯৮৮

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৯৯৪

আকিমুন রহমান : *আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ (১৯২০-৫০)*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৩

আজহার ইসলাম : *বাংলাদেশের ছোটগল্প: বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৬

আনিসুজ্জামান : *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)*, তৃতীয় সংস্করণ, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮৩

আনোয়ার পাশা : *রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা*, ইস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা, কার্তিক ১৩৭০

আনোয়ারুল ইসলাম : *বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৭

আবদুল মান্নান সৈয়দ : *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*, মুক্তধারা, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৬

আবদুল মতিন : *শামসুদ্দীন আবুল কালাম ও তাঁর পত্রাবলী*, প্রথম সংস্করণ, র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশান্স, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯৮

আবদুল হাফিজ : *লৌকিক সংস্কার ও মানবসমাজ*, প্রথম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৭৫

আবুল হাসনাত (সম্পা.) : *আবুল ফজল*, প্রথম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

আবুল কাশেম ফজলুল হক : *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাংলা সাহিত্য*, প্রথম জাগৃতি সংস্করণ, জাগৃতি প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১২

আশিসকুমার দে : উপন্যাসের শৈলী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা ১৯৮৩

আহমদ কবির : *সরদার জয়েনউদ্দীন*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পা.) : *উপন্যাসে জীবন ও শিল্প*, কলকাতা ১৯৭৭
: *তারাশঙ্কর: দেশকাল সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা ১৯৭৮

ওয়াকিল আহমদ : *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, গতিধারা, ঢাকা ২০০১
: *লোকসংস্কৃতি* (বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৭), প্রথম প্রকাশ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭

কামরুদ্দীন আহ্মদ : *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, স্টুডেন্টস পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

খালেদা হানুম : *বাংলাদেশের ছোটগল্প*, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

গিয়াস শামীম : *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস (১৯৪৭-১৯৮৬)*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০২
: *বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস* (২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা ২০১৫
: *উপন্যাসের শিল্পস্বর*, প্রথম প্রকাশ, ভাষাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৯

গোপাল হালদার : *বাঙালি সংস্কৃতির রূপ*, প্রথম প্রকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৪৭
: *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা*, প্রথম প্রকাশ, কোলকাতা ১৯৭৪

গোপীকানাথ রায়চৌধুরী : *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা ১৩৮০
: *বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প*, পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৭৮

চঞ্চল কুমার বোস : *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৯
: *বাংলা কথাসাহিত্য এবং অন্যান্য*, প্রথম প্রকাশ, শব্দকোষ প্রকাশনী, ১১/১, বাংলাবাজার, ইসলামী টাওয়ার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১২

জীনাত ইমতিয়াজ আলী : *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ: জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম*, প্রথম প্রকাশ, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা ২০১১

তপোধীর ভট্টাচার্য : *ছোটগল্পের অন্তর্ভুবন*, প্রথম প্রকাশ, কোলকাতা ২০০০

তপোব্রত ঘোষ : *রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৯৭

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.) : *বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২

দেবীপদ ভট্টাচার্য : *উপন্যাসের কথা (প্রথম পর্ব)*, প্রথম প্রকাশ, জি.এ.ই.পাবলিশার্স, কলকাতা, মে ১৯৬১

দেবেশ রায় : *উপন্যাস নিয়ে*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯১

নাজমা জেসমিন চৌধুরী : *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮০

নারায়ণ চৌধুরী : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য মূল্যায়ন*, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮৩
: *মানিক-সাহিত্য সমীক্ষা* (সম্পা.), পুস্তক বিপণি, কলকাতা ১৯৮১

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : *সাহিত্যে ছোটগল্প*, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৬৯

নারিয়াকি নাকাজাতো : *পূর্ব বাংলার ভূমিব্যবস্থা: ১৮৭০-১৯১০* (অনুবাদ: স্বরোচিষ সরকার, অনুবাদ সম্পাদনা: সিরাজুল ইসলাম ও রতনলাল চক্রবর্তী), প্রথম প্রকাশ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ২০০৪

নাসরিন জাহান (সম্পা.) : *বাংলাদেশের গল্প আশির দশক*, পূর্বকথা, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, চৈত্র ১৩৯৯

নিতাই বসু : *তারাশঙ্করের শিল্পিমানস*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১৯৭৩

নীহাররঞ্জন রায় : *বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব*, দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৯৩

নুরুল আমিন : *আবুল মনসুর আহমদ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় : *অন্তর্বয়ন : কথাসাহিত্য*, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯০

পূরবী বসু : *শামসুদ্দীন আবুল কালাম: তাঁর অপ্রকাশিত চিঠি ও স্মৃতি*, প্রথম সংস্করণ, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা ২০১৭

প্রদীপ রায় ড. (সম্পা.) : *বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে গ্রাম*, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মে ২০১৪

প্রমথনাথ বিশী : *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

বদরুদ্দীন উমর : *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, মে ১৯৭২

বিনয় ঘোষ : *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, বুক ক্লাব, ঢাকা ২০০০

বিলকিস রহমান : *উনিশ শতকে বাংলার নারী-পুরুষ সম্পর্ক*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০১৩

বিশ্বজিৎ ঘোষ : *বাংলা কথাসাহিত্য পাঠ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০২

: *বাংলাদেশের সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯১

: *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গচেতনার রূপায়ণ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৭

বীরেন্দ্র দত্ত : *বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ*, প্রথম প্রকাশ, রত্নাবলী, ৫৯/এ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা, আগস্ট ১৯৮৫

বেগম আকতার কামাল : *বিশ্বযুদ্ধ জীবন ও কথাশিল্প*, প্রথম প্রকাশ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ৬৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা, মে ২০০০

ভাস্বতী চক্রবর্তী (লাহিড়ী) : *সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোটগল্প (১৯৪০-৫০)*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০৩

ভীষ্মদেব চৌধুরী : *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

: *বাংলাদেশের সাহিত্য গবেষণা ও অন্যান্য*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯১

ভূঁইয়া ইকবাল : *বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯১

: *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০০০

ভূদেব চৌধুরী : *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*,চতুর্থ প্রকাশ (পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত) মডার্ন বুক এজেন্সী প্রা: লি:, কলকাতা ১৩৬৯

মনসুর মুসা : *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা ২০০৮

মহীবুল আজিজ : *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা ২০০২

মোস্তফা মোহাম্মদ : *কথাসাহিত্য ও অন্যান্য*, বলাকা প্রকাশন, চট্টগ্রাম ১৯৯৯

মিল্টন বিশ্বাস : *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯

মুহম্মদ ইদ্‌রিস আলী : *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫

: *আমাদের উপন্যাসের বিষয়চেতনা: বিভাগোত্তরকাল*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৮

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন : *বাংলাদেশের ছোটগল্প জীবন ও সমাজ*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৭

মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ (সম্পা.) : *ঊষালোকে*, শামসুদ্দীন আবুল কালাম-কে নিবেদিত, ঢাকা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৪

রথীন্দ্রনাথ রায় : *ছোটগল্পের কথা*, প্রথম প্রকাশ , পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জুন ১৯৮৮

রণেশ দাশগুপ্ত : *উপন্যাসের শিল্পরূপ*, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৭৩

রফিকউল্লাহ খান : *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ (১৯৪৭-১৯৮৭)*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৭

: *শতবর্ষের বাংলা উপন্যাস*, মাওলা ব্রাদার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, জুন ২০০১

রুশতী সেন : *বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস*, প্যাপিরাস, কলকাতা ১৯৯৩

রেবতী বর্মণ : *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*, প্রথম সংস্করণ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা ১৯৯৫

লিলি দত্ত : *জীবনশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, দে বুক স্টোর, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮৯

শফিকুর রহমান : *বাংলাদেশের গ্রামভিত্তিক ছোটগল্পে জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০১৩

শান্তনু কায়সার : *অদ্বৈত মল্লবর্মণ (জীবনী গ্রন্থমালা)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৭

: *শওকত ওসমান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০১৩

: *বাংলা কথাসাহিত্য ভিন্নমাত্রা*, প্রথম প্রকাশ, ঐতিহ্য প্রকাশনী, রুমী মার্কেট, ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড়, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১

শিরীণ আখতার : *বাংলাদেশের তিনজন ঔপন্যাসিক*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৩

শিশিরকুমার দাশ : *বাংলা ছোটগল্প (১৮৭৩-১৯২৩)*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৬৩

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, প্রথম প্রকাশ, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা ১৯৩৯

সত্যব্রত দে : *রবীন্দ্র-উপন্যাস সমীক্ষা*, জিজ্ঞাসা, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, আগস্ট ১৯৭১

সত্যেন্দ্রনাথ রায় : *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০

সফিকুন্নবী সামাদী : *তারাশঙ্করের ছোটগল্প : জীবনের শিল্পিত সত্য*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

সমরেশ মজুমদার : *বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর*, রত্নাবলী, কলকাতা ১৯৮৬

সরদার আবদুস সাত্তার : *কথাসাহিত্য সমীক্ষণ*, প্রথম প্রকাশ, বই প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুন ১৯৮০

: *বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প*, প্রথম সংস্করণ, তুলসী প্রকাশনী, আগস্ট ১৯৯৭

: *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, চতুর্থ পরিমার্জিত সংস্করণ, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৯৯৯

সরকার আবদুল মান্নান : *বাংলা কথাসাহিত্য: ভিন্ন স্বর ভিন্ন শৈলী*, প্রথম প্রকাশ, অনিন্দ্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১০

স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পা.) : *বিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ রজতজয়ন্তী বর্ষ, পুস্তক বিপণি,কলকাতা, ১১ মার্চ ২০০০

স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পা.) : *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ২০০৩

সাঈদ-উর রহমান (সম্পা.) : *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৩

সানজিদা আখতার : *বাংলা ছোটগল্পে দেশবিভাগ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০২

সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ : *উনিশ শতকে বাংলার সমাজ-চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন: ১৮১৮-১৮৩৫*, (সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, বেলাল চৌধুরী ও সুব্রত বড়ুয়া অনূদিত), ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ঢাকা ২০০০

সিরাজুল ইসলাম : *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, প্রথম প্রকাশ চয়নিকা, ঢাকা ২০০২

: *বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কথাবিচিত্রা, ঢাকা ১৯৮১

সুব্রত কুমার দাস : *বাংলা কথাসাহিত্য যাদুবাস্তবতা এবং অন্যান্য*, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০২

সুমিতা চক্রবর্তী : *উপন্যাসের বর্ণমালা*, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ২০০৩

: *ছোটগল্পের বিষয়-আশয়*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, জুন ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

সেলিনা বাহার জামান (সম্পা.) : *শামসুদ্দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ*, , বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৮

সৈয়দ আকরম হোসেন : বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫

: প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, মাওলা প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৭

: *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২৫ শে বৈশাখ ১৩৮৮

সৈয়দ আবুল মকসুদ : *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, মিনার্ভা বুক্‌স, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮১

সৈয়দ আকরম হোসেন/সিরাজ সালেকীন : *বাংলা উপন্যাসে নদী-চর ও দ্বীপজীবন*, জ্ঞানজ্যোতি প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

সৌমিত্র শেখর : *কথাশিল্প অন্বেষণ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬

হাসান আজিজুল হক : *কথাসাহিত্যের কথকতা*, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮১

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক প্রবন্ধ

অরবিন্দ পোদ্দার : 'শস্যের ভিতরে রৌদ্রঃ অন্বিষ্টের সন্ধানে সমাজ মানস', *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি*, স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পা.), পুস্তক বিপণি, কলকাতা ২০০৩

অসীম সাহা : 'একুশ শতকের দাবি ও সম্ভাবনা : বাংলাদেশের ছোটগল্প ও বিশ্বসাহিত্যের আন্তঃক্রিয়া', *একুশের প্রবন্ধ ২০০১*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১

অয়নান্ত রায় : *তিতাসের আঞ্চলিকতা: সর্বমানবিক জীবনভাষ্য*, 'তিতাস-স্রষ্টা অদ্বৈত মল্লবর্মণ জীবন, সৃজন ও রূপায়ণ', সম্পাদনা: ড. অরূপ কুমার দাস, বামা পুস্তকালয়, কোলকাতা।

আজহার ইসলাম : 'বাংলাদেশের অপাংক্তেয় জীবনের নীরব রূপকার কথাশিল্পী শামসুদ্দীন আবুল কালাম,' *উত্তরাধিকার*, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৮

আনোয়ার পাশা : সাহিত্য-শিল্পী আবুল ফজল, আনোয়ার পাশা রচনাবলী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত, ১৯৮১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আনোয়ারুল করীম : বাংলাদেশের লোকসংগীত', শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০০৮

আহমেদ রফিক : 'মানিক-উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনচিত্র', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ভুঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত।

ইদ্রিস আলী : 'শামসুদ্দীন আবুল কালামের উপন্যাস', *ভাষা-সাহিত্য পত্র*, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৯৭

ভাস্বতী চক্রবর্তী (লাহিড়ী) : *সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোটগল্প (১৯৪০-১৯৫০)*, 'বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক– ঐতিহাসিক পটভূমি', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা ১৯৯১

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : 'ট্রাইবাল সমাজের অসমাপ্ত বিলোপ: গণপতি', *লোকায়ত দর্শন (২য় খণ্ড)*, নিউ এজ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ২০০০

দেবেশ রায় : 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ: বাঙালির জীবন, মনন ও সাহিত্য', *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ রজতজয়ন্তী বর্ষ, কলকাতা, ১১ মার্চ ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

পিয়াস মজিদ : 'শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম : জীবনায়ন', *সাহিত্য পত্রিকা*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বর্ষ : ৫, সংখ্যা : ১, কার্তিক ১৪১৯, অক্টোবর ২০১২

বেগম আকতার কামাল : 'রণেশ দাশগুপ্তের চিন্তায় উপন্যাসের শিল্পরূপ: একটি সমীক্ষণ', *সাহিত্য পত্রিকা*, একচল্লিশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কার্তিক ১৪০১

মনিরুল ইসলাম খান : 'কৃষক সমাজে ভূমি ব্যবস্থা পুঁজি ও বাজার সম্পর্ক', *বাংলাদেশের গ্রাম* (সম্পাদনা: কাজী তোবারক হোসেন ও মুহাম্মদ হাসান ইমাম), প্রথম প্রকাশ, সামাজিক বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৯৪

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : 'পূর্ব পাকিস্তানী কথাসাহিত্য', *আধুনিক বাংলা সাহিত্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৫

মো: আব্দুর রশীদ : '*মজা গাঙের গান* : নব জীবনের উদ্বোধন', *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ : ৫, সংখ্যা:১, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, অক্টোবর ২০১২

মো: আনোয়ার হোসেন : 'জেলে', বাংলাপিডিয়া, ওয়েবসাইট: http://bn.banglapedia.org

যতীন সরকার : 'বাংলাদেশের কবিয়াল', শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য (প্রথম খণ্ড)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০০৬

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত : 'গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়', *মানিক সাহিত্য-সমীক্ষা*, সম্পাদনা: নারায়ণ চৌধুরী।

রফিকউল্লাহ খান : '*কাঞ্চনগ্রাম* উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত ও নির্মাণ', *উত্তরাধিকার*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, অগ্রহায়ণ ১৪২১

রওনক জাহান : পাকিস্তান: ফেলিওর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২, (মহীবুল আজিজ প্রণীত বাংলাদেশের উপন্যাসে)

সুশান্ত মজুমদার : 'একুশ শতকের দাবি ও সম্ভাবনা : বাংলাদেশের উপন্যাস ও বিশ্বসাহিত্যের আন্তঃক্রিয়া', *একুশের প্রবন্ধ ২০০১*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ২০০১

সৈয়দ আজিজুল হক : '*কাঞ্চনগ্রাম* : জাতীয় মুক্তিচেতনার গুরুত্বপূর্ণ আখ্যান', *বাংলা কথাসাহিত্যে মানবভাবনা*, প্রথম প্রকাশ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭